সাহিত্য অঙ্গন

ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XXII, September 2024
Website : www.sahityaangan.com

—উপদেষ্টা—
অমর মিত্র, নলিনী বেরা, সুশীল মণ্ডল,
তাপস রায়, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, মজিদ মাহমুদ

—মুখ্য সম্পাদক—
জয়গোপাল মণ্ডল

—কার্যকরী সম্পাদক—
সমরেশ ভৌমিক
সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌসুমী সাহা

—সহ-সম্পাদক—
দেবশ্রী ঘোষ, নবনীতা বসু, শম্পা বসু, মনোরঞ্জন সরদার, প্রণব কুমার মাহাতো,
উজ্জ্বল প্রামাণিক, তাপস কোলে, পঞ্চানন নস্কর, স্বরাজ দাস

প্রচ্ছদ—প্রদীপ সরকার

বর্ণ সংস্থাপক—*মানিক কুমার সাহু, গড়িয়া, যোগাযোগ : ৯৮৩০৯৫০৩৮০*

মুদ্রণ—*গ্রাঙ্কো প্রসেস*
৪৪, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রিট, কোলকাতা-৯, যোগাযোগ : ৯৩৩১৮০১৯৫৭

মূল্য—১৫০.০০

: প্রাপ্তিস্থান :
পাতিরাম, দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর এবং ধ্যানবিন্দু

প্রকাশক : জয়গোপাল মণ্ডল
অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২
কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

সবার কণ্ঠে একই স্বর, জাস্টিস ফর আর. জি. কর.
ছবি : মলয় মণ্ডল, বারুইপুর

সূচি

সম্পাদকীয় : জয়গোপাল মন্ডল—৫

গল্প এক : অমর মিত্র—৯, নলিনী বেরা—১৬, গৌতম দে—২০, সৌমিত্র চৌধুরী—২৩,
চন্দন চক্রবর্তী—২৭, সুকুমার রুজ—৩১, জয়দীপ চক্রবর্তী—৩৬, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য—৪০

প্রবন্ধ এক : সোমালি চৌধুরী—৪৩

কবিতা এক : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়, তপন কোলে, বীথি চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিবেশ চৌধুরী,
শকুন্তলা সান্যাল, মজিদ মাহমুদ, নির্মল সামন্ত, সঙ্গীতা মুখার্জী মণ্ডল, প্রত্যুষ প্রসূন ঘোষ,
সপ্তর্ষি রায়, উদয়ন ভট্টাচার্য, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান কর, প্রগতি মাইতি, কালিদাস ভদ্র,
সজল বন্দোপাধ্যায়, শঙ্খ অধিকারী, শংকর ঘোষ, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, নৃপেন চক্রবর্তী,
সোমা মুখার্জি, অমরেশ বিশ্বাস, খগেশ্বর দাস, তাপস মিত্র, ভবানীশঙ্কর চক্রবর্তী —৪৬-৫৩

গল্প দুই : অনিন্দিতা গোস্বামী—৫৪, নিখিল মন্ডল—৫৯, সন্ধ্যা দাস—৬২,
নিরঞ্জন মন্ডল—৬৩, রবীন বসু—৬৬, হাসি বসু—৬৯

পঞ্চ কবির পঞ্চ স্বর : সুশীল মন্ডল, সৌমিত বসু, স্নেহাংশু বিকাশ দাস, বেবী সাউ, সুদীপ্ত মাজি—৭১-৭৮

গল্প তিন : বিশ্বজিৎ সর্দার—৭৯, নিত্যানন্দ মন্ডল—৮১

কবিতা দুই : মণিদীপা সান্যাল, অর্পিতা ঘোষ পালিত, দিলীপ দে, তীর্থঙ্কর সুমিত,
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, দেবাশিস মল্লিক, সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, রাজীব কর,
রবীন চক্রবর্তী, অরুণিমা চট্টোপাধ্যায় —৮৩-৮৫

ছোট উপন্যাস : তাপস রায়—৮৬-১০৮

কবিতা তিন : স্বরূপ মুখার্জি, শর্বরী চৌধুরী, পিংকি ঘোষ, মঞ্জুশ্রী সরকার, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী,
গৌতম তালুকদার, সুচরিতা চক্রবর্তী, পাপড়ি দাস সরকার, মোহিত ব্যাপারী,
পুলিন রায়, খেয়া সরকার, দিশা চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়, তড়িৎ চক্রবর্তী,
পার্বতী ভট্টাচার্য, হাননান আহসান, সুস্মেলী দত্ত, নির্মল করণ, দুর্গাদাস মিদ্যা,
অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, জয়গোপাল মণ্ডল—১০৯-১১৪

প্রবন্ধ দুই : জহিরুল রহমান মন্ডল—১১৫, তন্ময় দেবনাথ—১২০

গল্প চার : অরূপ কুমার মন্ডল—১২৭, সোমনাথ বসু—১৩০,
উৎপলেন্দু মন্ডল—১৩৩, তাপস কোলে—১৩৮

পুস্তক পর্যালোচনা : শালের বনে সন্ধ্যা নেমে আসে-হাসি বসু/আলোচক : রবীন বসু—১৪১
দরজা খুলে দাড়াও-দুর্গাদাস মিদ্যা/আলোচক : রামতনু দত্ত —১৪৩
নির্বাচিত প্রেমের কবিতা-সুশীল মন্ডল/আলোচক : কুনাল রায়—১৪৫
গান বাঁধো বাউলানি-সুচরিতা চক্রবর্তী/আলোচক : সৃজিতা ব্যানার্জী—১৪৮
অথ হনু কথা-মোস্তাক আহমেদ/আলোচক : দীপশেখর চক্রবর্তী—১৫১

মুখোমুখি : তাপস রায় ও সঞ্জয় ঋষি—১৫৩

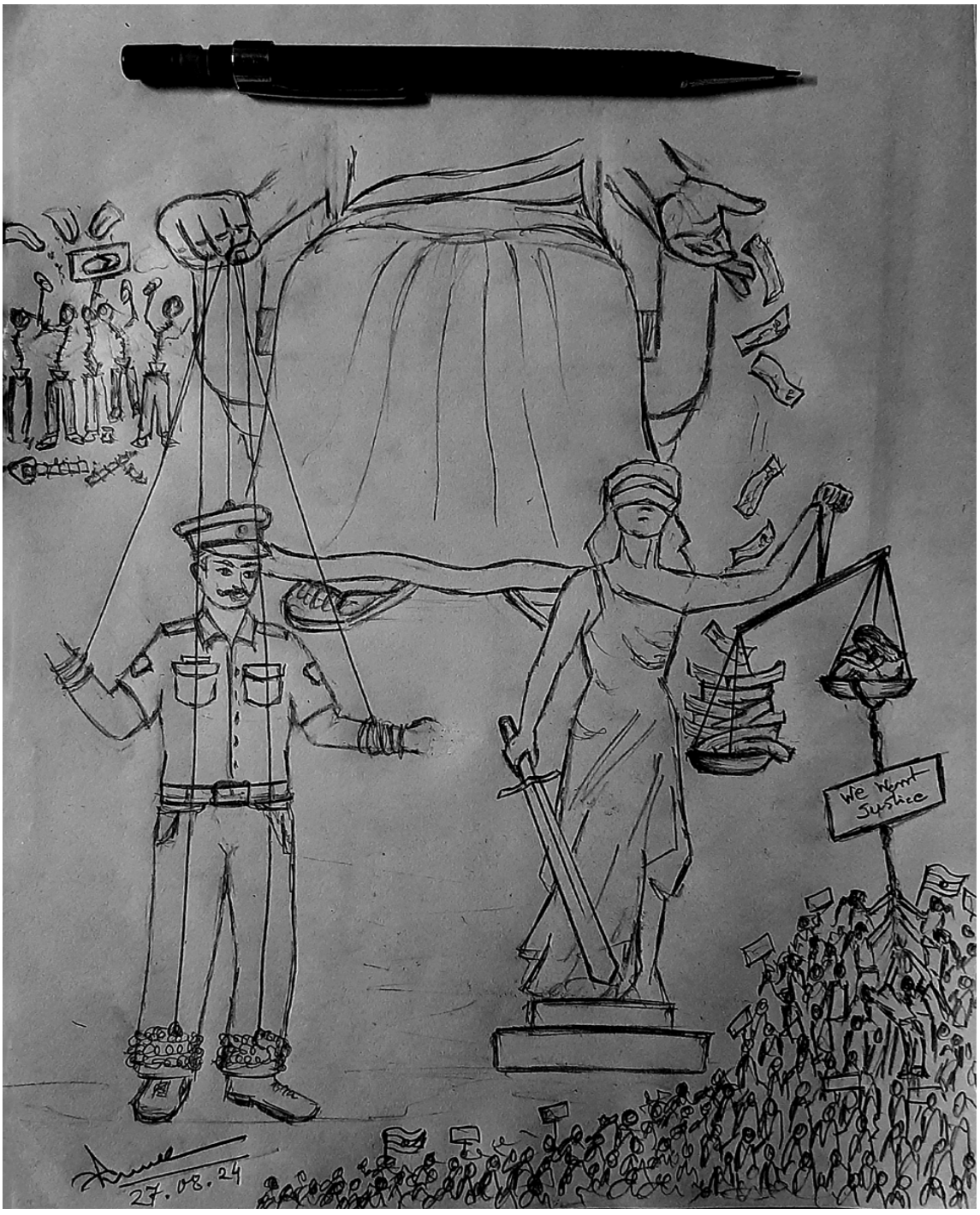

তোমার স্বর আমার স্বর জাস্টিস ফর আর. জি. কর

ছবি : স্বরূপ মান্না

স ম্পা দ কী য়—

হিটলার রাণীর আখ্যান

ঘুমটা আর ভাঙলো না, আগের রাতে ডিউটি করে রেস্ট রুমে বিশ্রামে বসেছে, পরদিন ঝুঁঝরো বেলায় মাল ট্রেনের চাবি দিয়ে বস্ বললো, পরে জিরোবে যান, ড্রাইভার কমে গেছে। যিনি অফিসার তারও নাকি বাধ্যবাধকতা। তবুও মন্ত্রী যখন আসেন রেলে নয়, বিমানে অথবা হেলিকপ্টারে। পাখির মতো উড়ে যায়, আবার আসে। কেউ বোঝে না। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দুমড়ে মুচড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। হাহাকার—গোঙানির আওয়াজ, বাতাসে লাশের গন্ধ। কার দায় কে নেয়! নিয়মিত এভাবেই চলে রাস্তা, প্রতিশোধ নেয় নাকি প্রকৃতি।

একটা মেল গাড়ি ভায়া নাগপুর হয়ে ঝাড়খন্ডে ঢুকে বেসামাল। আরে বাবা এও তো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে এলো চিরা মুন্ডা, কান্নার আওয়াজ শুনে চিৎকার করে—গ্রামের বুড়ো জওয়ান; হাতাহাতি মানবতার রক্ষায় শামিল। ততক্ষণে অনেকেরই সব শেষ। বহু জিনিসের দাবিদার খোয়া গেছে। রাত হতেই লুটপাট চলে— কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। দায় ঠেলাঠেলির পালা। আচ্ছা, রায়নাডে সরকারের কোন দায়? প্রকৃতির রোষে সাত-আটটা গ্রাম এক মুহূর্তেই উবে গেল। মন্ত্রীর জামা ভিজে গেল ঘামে।

রতন হালদারের পরিবার ছুটে এলো জামশেদপুর থেকে। তার নাকি ভাই আসছিল মুম্বাই থেকে। ফোনে আর পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিউতি ঘোরাঘুরি করে চোখ ভরা জলের বন্যা। সব কিছু ঝাপসা।

দেশ জুড়ে বডির পর বডি। আরে বাবা, এখানেও তো বডি পাওয়া গেছে; ওখানে তো কত প্রাণ ভেসে গেছে কে জানে।

—দেখো রাণীর বা কি দোষ!

—রাজারই বা দোষ কি?

সবই কপালের। সময় যার ফুরিয়েছে চলে তাকে যেতে হবে। এত হাউ মাউ করার কি আছে? সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে। এতে কার হাত বলো? যতসব উল্টোপাল্টা। দেখো ভোটের সময় কত কথা বলতে হয়। অমন করেই বলতে হয়। বোকা জনগণকে মরতে হয়। ওরাই তো ওদের রাজা বানিয়ে আকাশে পাঠাল। কি করবো বলো! এখন তো মাটি ছোঁবে সেই পাঁচ বছর পর। ততদিন কেঁদে নাও সবাই। এত কিছু থাকতে কিনা এই সব দুর্ঘটনা চোখে পড়ে? মৃত্যু সতত দুঃখের। আমার ভেতরটাও ফেটে যায়, কাউকে তো বুক চিরে দেখাতে পারি না।

তোমাদের চোখে পড়ে না—ক্ষুধাতুর মানুষ চায় না স্বরাজ। তাই তো ভিকিরি রাজা হলে ভিখারিকে দেখে না। যমরাজ এমন বিধান দিয়েছেন। শাহজাহান-ঔরংজেব মনে আছে? মনে করো, মনে করো। ওরা চিরকাল ঘুরে ফিরে আসে। পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও কুকুরের লেজ বাঁকা। আর বাঘ হরিণের মাংস খায়।

মানুষকে বাঘ বানালে বাঁচার আশা করো কি করে? এ নতুন পৃথিবীতে শুধু দু'পে পশুর রাজত্ব থাকবে। চার পেয়ে জানোয়ারকে বন থেকে তুলে মন থেকে বিসর্জন দিতে হবে। ওদেরও তো তবুও মায়া মমতা আছে।

২.

'মে আই কামিং স্যার?'— এ কথাটা বলল মেধাবী তরুণী। এমবিবিএস পাস করে এখন পিজিটি দ্বিতীয় বর্ষে। ভঙ্গ প্রদেশের বিখ্যাত মেডিকেল কলেজে পাঠরত। জুনিয়র ডাক্তার। চেস্ট মেডিসিনের অধীনে বিশেষভাবে কর্মরত। শুনেছি পিজিটিদের ওপর রোলার চলে। অন্য এক নামী প্রতিষ্ঠানে নাকি সুনেত্র কর নামে এক তরুণ কয়েক মাস আগে ২৪ ঘন্টার পর ৩৬ ঘন্টা ডিউটির অত্যাচারে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। বিভাগীয় প্রধান ভালো মানুষ। তাঁর হস্তক্ষেপে যুবকটি আবার ভাগ্যের জোরে ফিরে আসে। মেয়েটির ডাকে প্রিন্সিপাল একবার মুখ তুলে—'এসো'।

গুরুগম্ভীর মেঘের মতো কালো অন্ধকার ঘর, যত সব প্রশাসনিক অপারেশন চলে এখান থেকে, রাজনৈতিক শিক্ষা দীক্ষাও

নাকি এখান থেকেও হয়, ভদ্র মহোদয় সুদর্শন, সুঠাম, নায়ক নায়ক ভাব। চারিদিকে ঘিরে থাকে মাসলম্যান, সিপাহী- সিভিক, শহরের পুলিশ কর্তারা। এবং গুটিকতক ইন্টার্ন ছাত্র-ছাত্রী। ওর হাত নাকি মন্ত্রীমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ওর কথায় প্রায় ওঠবস করে।

—'বলো'। প্রিন্সিপাল কথাটা এমন করে বললেন যেন তার কণ্ঠস্বরে পিতৃত্বের স্নেহ ঝর্ণার মত প্রবাহিত হলো।

—স্যার আজ এক পেশেন্টকে নার্স যে ওষুধ দিচ্ছিল, দেখলাম মেয়াদ উত্তীর্ণ, ডুপ্লিকেট মনে হচ্ছে।

—বাহ বেশ ভালো তো তোমার নজর। শোনো মা, এসব কম্ম তোমার নয়, ঠিক আছে আমি খোঁজ নেব। যাও।

হিটলার রাণীর যে আউটসোর্সিং ইনকাম হচ্ছিল শিক্ষক পদ বেচে—সে স্রোত বন্ধ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। রইল বাকি স্বাস্থ্য, নিজের হাতে। দলের পোষা কুকুরগুলোকে বেছে বেছে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বানিয়ে দিল। রোগী ভর্তি, ছাত্র ভর্তি, তাদের পাস করানো, ফেল করানো, নানা পদ্ধতিতে তোলা আদায়ের মোক্ষম দায়িত্ব পেয়েছেন তারা।

নামি এক চ্যানেলে ঘন্টাখানে দমনে এসে বিখ্যাত এক ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, পাশ করানোর জন্য নাকি টাকা নেয়া হচ্ছে, টুকে টুকে পরীক্ষা দিয়ে অনার্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেনদেনের ব্যবস্থা করছেন প্রিন্সিপাল। অবশ্য তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। অথচ তাদের গুন্ডামি আকাশছোঁয়া। অতিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী। যার নামে যত অভিযোগ তিনি তত বড় প্রিন্সিপাল, পার্টি ফান্ডে যে যত বেশি অনুদান দেয় তিনি ততটাই মূর্খমন্ত্রীর কাছাকাছি।

তো মেয়েটির ন্যাকামি নজরুলগিরি দেখে নেয় অধ্যক্ষ। ডিউটির নতুন চার্ট বদলে গেল, ২৪ ঘন্টার পর আবার ৩৬ ঘন্টা, ডিউটিতে ইন্টার্ন সাথীও বেছে বেছে দেওয়া হয়, শাসক গোষ্ঠীর পেটোয়াদের সঙ্গে তাকে বেঁধে দেয়া হলো।

শুভদীপ নাকি কোন মন্ত্রীর ছেলে, সে প্রায়ই ডিউটি করে সিনিয়র এই দিদির সঙ্গে। খায়-দায়, ঝাড়েও। গরিব ঘরের মেধাবী মেয়ে সহজ সরল মনে ভাইয়ের মতো ভালোবাসে।

—দিদি তোমার রিসার্চ প্রজেক্ট হয়ে গেছে? এর জন্য এত চিন্তা করছ কেন? এত পরিশ্রম করার কী দরকার? তুমি যদি পঞ্চাশ হাজার দাও আমি স্যারকে বলে ব্যবস্থা করে দেব। —কথাটা খেতে খেতে বলল ছেলেটা।

—দেখ্, আমার মা-বাবা খেটে খুটে আমাকে মানুষ করেছেন, আমরা গরীব, কিন্তু অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দিই না। আমি একমাত্র কন্যা। আমার প্রজেক্ট প্রায় কমপ্লিট। তা ছাড়া তোকে তো ভালো ভাবতাম। তুইও দালালি করছিস!

—কি? কি? তুমি আমাকে দালাল বললে? আরে তোকে দালাল বলতে চাইনি। —কথাটা বলল পিজিটি মেয়েটি।

—দেখো দিদি, আমি তো স্পষ্ট শুনলাম তুমি বলেছ—সোনিয়া বলল। সোনিয়া শুভজিৎ-এর গার্লফ্রেন্ড। সারা কলেজ জানে দু'জনের মেলামেশা। দু'জনের এমবিবিএস-এ কেউ-ই পড়তো না, কেবলই ছাত্র ইউনিয়ন করে। অথচ বেশিরভাগ বিষয়ে অনার্স পেয়ে গেল।

দুর্গামণি খুব রেগে গেল। বলল, আমি সব জানাবো স্বাস্থ্য ভবনে।

ভেতরে ভেতরে ফুঁষছে শুভজিৎও। তার মধ্যে বাঘ বসে আছে, কেউ জানতো না পৈত্রিক সূত্রে সে বাঘ এখন বনের রাজা। তার ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া নিয়েও কত কানাঘুসো, কত খবর রটে আছে।

আজ ডিউটি পড়েছে একসাথে। প্রিন্সিপাল প্ল্যান করে ব্যবস্থা করেছেন। টানা ৩৬ ঘন্টা ডিউটি দূর্গামণির। ২৪ ঘন্টার পর যুক্ত হল শুভজিৎ, সোনিয়া আর ইউনুস। ইউনুসও নাকি শহরের নামজাদা এক নেতার চেলা। তারও ডানা বেশ বড়। এক ছাতার তলায় তিনজনে। রাত সাড়ে ১১ টার সময় খাবার অর্ডার দিয়ে আনায় শুভজিৎ।

দিদি, চলো অনেকক্ষণ ডিউটি ফিউটি করেছ। আমরা ভাবতে পারছি না তোমার উপরে কেন যে এত চাপ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। চলো তো খাবে চলো,— কথাটা বলল শুভজিৎ। একটু বিস্মিত হল দুর্গামণি। অবশ্য খিদেও তো পেয়েছে, সব সময় খারাপ ভাবাটা ঠিকও নয়। এই ভেবে হাতটাত ধুয়ে তিনজনের সঙ্গে বসে বেশ ভালো করে খেলো। খেয়েদেয়ে উঠে হাত ধুতে ধুতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে,—আমি বিভাগে যাচ্ছি, তোরা আয়।

সেদিন আকাশে চাঁদও ছিল। তারারাও মশগুল নিজেদের হিসাব নিয়ে। কোন কাব্যে কোন উপন্যাসে কোন পুরস্কার কাকে

দেয়া হবে। সব ঠিকঠাক করা থাকে মন্ত্রকের খাপে খোপে। কলেজের মধ্যে নার্সরাও ব্যস্ত, হাজার রোগী কাতরাচ্ছে, চেস্ট মেডিকেল বিভাগে দুর্গামণির ছোঁয়ায় অনেকে নাকি খুব খুশি।

আজ হঠাৎ যে ওর কি হলো সেমিনার হলে মরা ইঁদুরের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, বুড়ি পূর্ণিমার চাঁদ হঠাৎ কাস্তের মতো শুরু হয়ে গেল। কে বা কারা সূর্যের আলোর মুখে কালো পর্দা ঝুলিয়েছে তা বোঝার উপায় নেই। সারা শরীরে নাকি একশো কুড়িটা পশুর আঁচড়। বাঘের থাবায় নাকি পিলভিস বোন ভাঙা, যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে, দু' পা ফেড়ে ফেলার মত করে পড়ে আছে। নিথর। অগাধ নিমক পানিতে মিষ্টি জলের মাছ কি বাঁচে! রাক্ষসী হিটলার রাণীর কী নাটক—তার বাবা-মাকে কত ভালোবাসার কথা বলে। আর এক পুঁচকে ছেলে তো একগাঁট চড়া, বলে, এমন দোষীকে ধরে এনকাউন্টার করো। যাদের নিয়ে করে সে রাসলীলা, তাদের বিরুদ্ধে..... এ যে দেখি ভূতের মুখে রাম নাম।

সঞ্জীব নামে এক বদ্ধ মাতাল, সে নাকি সিভিক, সে নাকি তার বাঁশ দিয়ে এফোড় ওফোড় করেছে দূর্গামণিকে। তারপর চিকিৎসাপদ্ধতিতে হত্যা। ডাক্তারের খবর কি ডাক্তার জানে? আগে হত্যা, তারপর বলাৎকার—নাকি উল্টোটা? পোস্টমর্টেম হলো সময়ের বিপরীতে, অদ্ভুত নাটক —তড়িঘড়ি মড়া পোড়ানো হলো নাকি অপরাধ পুড়িয়ে দিল? তারপর ভাঙচুর, লাঠালাঠি—উপস্থিতির রেজিস্টারের খোয়া যাওয়া—মেয়েরা রাত দখল করল—লাখ লাখ লোক মোমবাতি নিয়ে কাঁদছে, আগুনে জ্বলছে। পর দিন স্বাধীনতা দিবস। অথচ চুল্হার স্বাধীনতা মিলল না। নিজেই জ্বলছে অবিরাম।

হিটলার রাণী ভঙ্গপ্রদেশের নাগরিকদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডারের সাথে নারায়ণ ভান্ডার ঘোষণা করল। আর দুর্গামণির মূল্য স্বরূপ ঘোষণা করলো ১০ লাখ টাকা। তার বাবা অবনী আর মা অন্নপূর্ণা থুথু ছিটিয়ে দিল মূর্খমন্ত্রীর মুখের ওপর।

আর অন্যদিকে রঙ্গ দেশের রাজা আনন্দে মশগুল, কোনো কথা শুনতে পায়নি সে।

৩.

পরদিন আবার আগুন জ্বলল রঙ্গ দেশে—উত্তরাখণ্ডে রাতের বেলায় পথে এক নার্সকে কে যে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে হত্যা করল, মহারাষ্ট্রের কোন্ এক বদলাপুরে কালিকপার দেহ-ছিন্নভিন্ন করল নরখাদকের দল। এ কোন সভ্যতা! সত্যি কি পুরুষ সমাজ নিয়ন্ত্রণহীন পশুত্বে বাস করছে! এ সামাজিক ব্যধির অবসান হোক। চারিদিকে রব উঠেছে—জাস্টিস ফর আর. জি. কর। একই সঙ্গে নানা প্রশ্ন—এ সভ্যতার অবনমন দেশে।

৪.

হিটলার যুগ যুগ জিও। খোপে খোপে হিটলারের রাণী ক্ষমতার রসে চুইবে খাচ্ছে মানুষ। মানুষের রক্ত সুস্বাদু, চায়ের কাপে ওদেরই রক্তরস। সকাল থেকে শুরু ভজন দিয়ে, রাত্রিবেলায় বিসর্জন। এমন সভ্যতা কোথাও পাবে না কো তুমি। এরই নাম ভারতবর্ষ। কোণে কোণে তাদের শিলা পোঁতা, সীমানা ভাঙলেই ভঙ্গ দোষে দুষ্ট হতে হবে। আচ্ছা কি তফাৎ সেই বৃটিশের বঙ্গভঙ্গ আর এখনকার বিচ্ছিন্নতাবাদীর প্রস্তাবে? নেত্যকালীর নেত্য চলছে—আবার বঙ্গভঙ্গ! বোঝো না বোঝো না? ভেঙ্গে ভেঙ্গে তো এত প্রদেশ ভাঙ্গল। কি ক্ষতি হয়েছে। বরং যারা ভিন্ন হয়েছে তারা দাঁড়াতে শিখেছে। জেলা ভাঙলে দোষ নেই, রাজ্য ভাঙলে মহাভারত অশুদ্ধ। আচ্ছা, ঐ যে ওপরের দিকটা ভেঙে আলাদা হলে কি দেশের বাইরে চলে যাবে? হীরক রাজারা বেশ মজায় আছে। ভেতরে ভেতরে দোস্তি আর বাইরে দেখায় কুস্তি। এ বড় মজার দেশ।

প্রথাগত চিত্রে - বাণিজ্যে এই যাত্রা নয়। সৃষ্টির সম্ভারে শারদীয় সংখ্যার প্রথম প্রয়াস। অনেকের মনে হতে পারে মেঘে ঢাকা এই অহম বেমানান। ১০ বছরে পা দিয়ে আকাশ ছুঁতে ইচ্ছে করে। তাই তো মেঘে মেঘে পাল তুলে অনন্তের ঢেউমাখা নৌকাবিলাস। দেখি কতদূর যাওয়া যায়। জীবন তো একটুখানি, স্বপ্ন পৃথিবীজোড়া। সাথে যখন একালের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের স্নেহ-ভালোবাসা আছে, তখন থোড়াই কেয়ার করি। চলো অমর কাব্য রচনা করি।

HOTEL PENGUIN

18, Jadunath Dey Road
Kolkata - 700012

(Road Opp. Indian Airlines Building on Chittaranjan Avenue)

- **Very centrally located (i.e.) only 1.5 km from sealdah Railway Station.**
- **4 Kms. away from Howrah Railway Stn.**
- **20 Kms away from Airport**

- Having all AC Rooms with attached bathrooms
- 24 Hrs. running hot & cold water
- Room Services available from morning to night upto 10:30 p.m.
- All types of food available from various nearby restaurants and can be served in the room
- Having all AC double bedded rooms with one triple bedded room where extra mattress can be provided
- Lift Service is available
- T.V. in each room
  Generator service is available
- Wi-fi Facility is available
- Check out time 12 noon

REVA'S

One AC Room available on the Grround Floor
with approx.
Sitting accomodation of 15 PAX
for any cultural or official meeting
on hourly basis.

ছোটগল্প

অ ম র মি ত্র
ফুলবনি যাত্রা

মনীশ বলল, কাকাকে নাকি দাদুর মতোই দেখতে !

মৃণাল বলল, ছবি দেখলে কিছু বোঝা যায় না দাদা।

—কাকা এত বড় আঘাত পেল, খুব চেষ্টা করলাম, হলো না। বিড়বিড় করল মনীশ।

মৃণাল থাকে জামসেদপুর। তার মেয়ে এবার মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। কলকাতায় একটা আস্তানা করবে সে, এইরকম নানা কথা ভাবছে। মেয়ে থাকবে হোস্টেলে। তাকেও তো যেতে হবে মাঝেমধ্যে। চাকরির আর তিন বছর আছে, আত্মীয়স্বজন সব কলকাতা আর মেদিনীপুর এবং এই ফুলবনি। অনেকদিন সে ফুলবনি ছাড়া। কিন্তু তার একটি আস্তানা আছে এখানে। মেজদার কাছে চাবি। মেজদা, বড়দা, আর ছোড়দা এখানে থাকে। আর থাকে মেজকার তিন ছেলে। ছোট কাকা। ছোট কাকি নেই। অন্য দুই কাকিমা বেঁচে। কত বড় পরিবার, ফুলবনিতে এই বৈশাখ মাসে লু বয়। বাতাসে আগুনের ঢেউ থাকে। কিন্তু গত কয়েকদিন এক টুকরো মেঘ এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে জঙ্গল পেরিয়ে লালগড়ের দিকে নাকি পরশু নামিয়েছে এক পশলা। লালগড়ে তাদের এক পিসি থাকেন। এবং বেশ সুস্থই আছেন। এসেছেন। এসে খুব কাঁদলেন। নিজের বাবার ছবির সমুখে গিয়ে বললেন, নিলুকে তুমি টেনে নিলে বাবা?

নিলু ছোট কাকার ছেলে। সদ্য প্রয়াত। কাকা একেবারে একা হয়ে গেলেন। তাঁর অন্য ছেলে বিলু থাকে বহরমপুর। কাকা বেশ লম্বা মানুষ। কৃষ্ণকায়। শাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরেন। মাথার চুল কাঁচা পাকা। স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন। এখন বিকেল। শ্রাদ্ধের কাজ শেষ। নিলুর মেয়ে অন্বেষা মেদিনীপুর হাই ইস্কুলের টিচার। গত বছর চাকরি পেয়েছে। বিয়ে হয়নি এখনো। নিলুর ছেলে সূর্য সেকেন্ড ইয়ার। বাংলা অনার্স। কবিতা লেখে নাকি গোপনে। এই নিয়ে খুব চিন্তা ছিল নিলুর। তাদের ফ্যামিলিতে কেউ কি কবিতা লিখেছে কখনো? ফিজিক্স অনার্স ছেড়ে বাংলা নিল। মনীশ দেখল মুন্ডিত মস্তক সূর্য তার দাদুর সামনে চেয়ার টেনে এনে বসল। চুপ করে আছে।

মৃণাল ঝুঁকে এল, কী হয়েছিল দাদা, হঠাৎ, ভাবতেই পারিনি।

—হাই প্রেসার ছিল, ফার্মেসি করেছিল, অথচ নিজেকে চেক আপ করাত না।

মৃণাল আর নিলু প্রায় এক বয়সী। নিলু খুব সাহসী। ডানপিটে। মৃণাল ছিল নিলুর অনুগত। নিলু মাঝখানে খুব ঝামেলা পুইয়েছে। শুনেছিল মৃণাল। একবার ফোন করেছিল তখন। নিলু বলেছিল তার কাছে মাসে দশ হাজার টাকা দাবী করেছিল উগ্রপন্থীরা। সম্ভব! সে লালগড় গিয়েছিল পিসির নাতির অন্নপ্রাশনে। তাকে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে টাকা দাবী করেছিল তারা। আসলে হয়তো পার্টিই নয়। পার্টির নামে টাকা আদায়। অনেক দরাদরির পর পাঁচ হাজার দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল। ফুলবনিতে ফিরে পাঁচ দিয়েছিল তাদের লোকের হাতে। তারা মনে হয় আরোও দূরের, ভোলাভেদা কিংবা পূর্ণাপানির লোক। সেই সময়টায় একা নিজেকে রক্ষা করেছিল নিলু। কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু যখন সুসময় এল, হুট করে চলে গেল। খুব চেষ্টা করা হয়েছিল বাঁচানোর। কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল মনীশ। ফুলবনির অনেকেই নিলুর জন্য কষ্ট পেয়েছে। মনীশরা বডি নিয়ে যেদিন ফেরে, রাত বারোটার উপর হয়ে গিয়েছিল। তখন কত লোক। সেদিন সন্ধ্যায় খুব ঝড় হয়েছিল। বাতাসের কী রোষ! কী রাগ! সমস্ত ক্ষোভ যেন উগরে দিচ্ছিল। তাদের গাড়ি তখন হাইওয়ের উপর। মনীশ বলতে বলতে চুপ করে যায়। উঠে পড়ে।

কাকার দিকে এগোয় মনীশ। খেয়েছেন কি? নিলু তাদের সকলের চেয়ে ছোট। পঞ্চাশ হয়েছে সবে। বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেনি। ব্যবসা করত। ব্যবসা এখন কে দেখবে? সূর্য নিতান্তই নাবালক। কাকা সাতাত্তর। কাকাকে দেখতে হবে ওষুধের দোকান। মনীশ বলল, কাকা একটু শুয়ে নিতে পারতেন ?

—কেন ? তিনি মুখ তুললেন।

মনীশ কিছু বলতে পারে না। এই বিঘেখানেক জমিতে সাতটি দালান। পুরোন লম্বা দালান বাড়িটিও রয়েছে। ওই বাড়িটি মনীশের ঠাকুরদা গুরুদাস চন্দ্র করেছিলেন বছর ষাটেক আগে। তার আগে ওখানে মাটির ঘর ছিল। হাওড়ার সালকিয়ার মানুষ গুরুদাস এখানে এসেছিলেন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। ১৯৪১। ওই বছর ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কী অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তাদের ঠাকুরদা। মনীশ যখন দেখেছে তাঁকে, তিনি শয্যাশায়ী। পক্ষাঘাতে একটা দিক পড়ে গিয়েছিল। জড়িয়ে কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করতেন, ও মনু, আজ কি পুন্নিমে হলো?

কতবার জিজ্ঞেস করতেন। উত্তর পেলে ভুলতে সময় লাগত না। আজ সেই পূর্ণিমা। আজ তাঁর পৌত্রের পারলৌকিক কাজ হলো। গুরুদাসের শেষ সন্তান অবিনাশ। সমস্তদিন চুপচাপ। এখন বললেন, আমার কী রে, আমার দিন তো শেষ হয়ে গেছে, কত দেখতে হবে জানিনে।

সূর্য বলল, দাদু তুমি রেস্ট নাও।

অবিনাশ বললেন, তুই তোর মা'র কাছে যা।

সূর্য বসেই থাকল। তার মা একা নেই। অনেকেই ঘিরে আছে তাঁকে। মনীশ চেয়ার টেনে বসল। বিষ্ণুপুরের বোন এসে বলল, কাকা যাই, ট্রেন ধরব।

ঘাড় কাত করলেন অবিনাশ। তারপর কী মনে হতে বললেন, কাল সকালের ট্রেন ধরিস, আজ থেকে যা, আজ তো বুদ্ধ পূর্ণিমা, পূর্ণিমা না ?

—তাই কী হয়েছে ?

—পূর্ণিমার দিনে সবাইকে সন্ধের পর বাড়ি থাকতে হতো, মনে আছে?

মল্লিকা বিমর্ষ মুখে হাসে, বলে, জানি, সে সব দিন আর ফিরে আসবে না।

— আজ পূর্ণিমা, আজ যেতে নেই।

মল্লিকা তার ছেলের দিকে তাকান। ছেলের সঙ্গে এসেছেন। ছেলে বলল, ফিরতে হবে দাদু।

—না, আজ পূর্ণিমা, বাড়িতে তোর বাবা আছে তো।

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ। মল্লিকার ছেলে অভিষেক ঘাড় কাত করল।

—তাহলে আজ না গেলে কী হবে ?

মল্লিকা চোখে আঁচল দিল, ঠিক আছে কাকা থাকলাম।

কাকা আবার চুপ। মৃণাল এসে বসে। মৃণাল ভোরে রওনা দেবে। ঝাড়গ্রাম যাবে। ঝাড়গ্রামে ওর শ্বশুরবাড়ি। ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতা যাবে দু'দিন বাদে। মনীশ এখানে থাকে। ভেবেছিল ক'দিন দার্জিলিং ঘুরে আসবে। টিকিট কাটা ছিল। ক্যান্সেল করেছে। কাকাকে রেখে যাবে না। ঠিক হবে না। কাকা তাঁর নাতি সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে?

সূর্য চুপ করে থাকে। কাকা ডাকলেন, আয়, কাছে আয়।

সূর্য চেয়ার নিয়ে সরে যেতে কাকা তার পিঠে হাত রাখলেন, বললেন, তুই কবিতা লিখিস, তা নিয়ে তোর বাবার খুব চিন্তা ছিল।

সূর্যর চোখ আর্দ হয়ে ওঠে। বছর কুড়ির সদ্য যুবক নিজেকে সামলায়। বলল, আমাদের প্রপিতামহ তো কবি ছিলেন দাদু ?

—কই না তো। বিস্মিত হলেন অবিনাশ, কে বলল?

—আমার মনে হয় দাদু।

অবিনাশ বললেন, তুই তাঁর কথা জানিস, স্বর্গীয় গুরুদাস চন্দ্রের কথা?

—জানি।

—কী জানিস?

—তুমি বল না দাদু।

মৃণালের মনে হয় কাকা আর তার ভাইপো দুজনে অদ্ভুত এক আলাপ করছে। নীলুর কথা বলছে না। যাঁর কথা বলছে তাঁকে দ্যাখেনি সূর্য। তিনি সেই ১৯৪১-এ চার ছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। মৃণাল জিজ্ঞেস করল, তোকে তোর বাবা বলেছিল আমাদের ঠাকুরদার কথা?

মাথা নাড়ে সূর্য। তবে কে? সূর্য হাত বাড়িয়ে নিজের দাদুকে ছোঁয়। অবিনাশ অবাক হয়ে মুন্ডিত মস্তক পৌত্রকে দেখছেন। তিনি বলেছিলেন? মনে পড়ে না। কিন্তু বলার দরকার ছিল। জানা দরকার ওর। ও তো অন্যরকম জীবনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে যা নীলুর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ছেলেটার মুখের ভিতরে চোখের চাহনিতে কি তাঁর বাবার মুখের ছায়া পড়েছে? গুরুদাস চন্দ্র আর ক'ছর বাদে যাত্রা করবেন প্রায় নিরুদ্দেশে। শালকিয়াতে পড়ে থাকল তাঁর স্বজন পরিজন, অন্য ভাইরা।

দুই

বাংলা সন ১৩৪৮, ইংরিজি ১৯৪১, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ক'দিন বাদেই রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ হবে। গুরুদাস চিঠি পেয়েছিলেন ফুলবনির। ফুলবনি মেদিনীপুর জেলায়। অনেক দূর। তাঁর জেঠতুতো বোনের বিয়ে হয়েছিল সেখানে। এই বোনটিকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন,

স্নেহের রমলা,

আশা করি সর্ব বিষয়ে কুশল। আমরা এক রকম আছি, ব্যবসায় মন্দা চলিতেছে। কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, শালকিয়ার দোকান তুলিয়া দিয়া আমি অন্য কিছু করিব ভাবিতেছি, কী করা যায় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ফুলবনি কেমন জায়গা?

ফুলবনি থেকে চিঠির উত্তর এসেছিল মাসখানেক বাদে। তখন ১৩৪৭-এর চৈত্র। রমলা বিবরণ দিয়েছিল ফুলবনির। জঙ্গলের দেশ। বিকেলে পশ্চিম দিকে পাহাড় দেখা যায়। চৈত্র থেকে গরম বাতাস বয়। যেমন গরম চৈত্র বৈশাখে, তেমন শীত কার্তিক অঘ্রানে। এখানকার জমি মাটির রঙ লাল। সাঁওতাল, মুন্ডা, আদিবাসিদের বাস এখানে। তুমি এসে ঘুরে যাও ক'দিন।

গুরুদাস আবার পত্র দিয়েছিলেন। জবাব এসেছিল। জমি খুব শস্তা। তুমি এসে দেখে যাও দাদা। তিনি একা দেখবেন কেন? শালকিয়া বাজারের দোকান বসে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। ব্রিটিশ সরকার চাল সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিল। ধীরে ধীরে সব জিনিশের দাম বাড়ছিল। একে বলে মন্দা। তখন যুদ্ধের বাজারের মন্দা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ লাখপতি হচ্ছে, কেউ নিঃস্ব। গুরুদাস চন্দ্র যুদ্ধের বাজারে সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। শরিকি সমস্যাও ছিল।

কিন্তু দেখা নয়, তিনি সপরিবারে ছয় ছেলে মেয়েকে নিয়ে গঙ্গার পশ্চিমকুল থেকে আরো পশ্চিমে ফুলবনির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। বুঝেছিলেন নতুন কোথাও না গেলে, জীবনে ঝুঁকি না নিলে না খেয়ে থাকতে হবে। শস্তার জমি আর বন-পাহাড় তাঁকে টেনেছিল। ঘিঞ্জি শহর থেকে বের হতে চাইছিলেন। শহর ক্রমশ ফিরিঙ্গি সৈন্যের বুটের শব্দে ভয়ের হয়ে যাচ্ছে। গুরুদাস যখন স্ত্রী লক্ষ্মীরানিকে বললেন, ফুলবনি যাবেন? জায়গা কেমন তা দেখে নিতে। তখন লক্ষ্মীরানির কোলে তখন ছ'মাসের ছেলে। অবিন, অবিনাশ। লক্ষ্মীরানি জিজ্ঞেস করেছিলেন সব। তারপর বলেছিলেন, চলো একেবারে সবাই যাই, দেখতে যাবে, আবার ফিরবে, তার চেয়ে যাই সকলে মিলে, এখেনে থাকার চেয়ে সেখেনে থাকা ভালো হবে মনে হয়।

সূর্য বলল, দাদু তুমি পথের পাঁচালী পড়েছ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ?

মনীশ জিজ্ঞেস করল, কেন ?

সূর্য বলল, ১৯২৯-এ পথের পাঁচালি প্রকাশিত হয়ে গেছে। দুর্গার মৃত্যুর পর বিপর্যস্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন ভাগ্য অন্বেষণে।

অবিনাশ বললেন, তখন এমনি হতো, সে আমলে মানুষের সাহস ছিল, গুরুদাস চন্দ্র, আমার বাবা চাষ জানতেন না।

শালকের মানুষ, কৃষি জানেন না। ব্যবসাপাতি করে বাঁচবেন সেই উদ্দেশে গঙ্গায় ভাসলেন। ফুলবনির ভগ্নিপতি চিঠি লিখে বলেছিল, ঘাটাল পৌঁছতে। ঘাটাল থেকে স্থলপথে ফুলবনি।

আকাশে যুদ্ধ বিমান। শহরে সেনাবাহিনীর বুটের শব্দ। তিনি নদী পথে গঙ্গা ধরে দক্ষিণ পশ্চিমে এগিয়ে রূপনারায়ণ নদে পড়ে একটি খাল ধরে শিলাবতী নদীতে ঢুকেছিলেন। মাঝি পথ চিনত। শিলাবতী বেয়ে ঘাটাল শহর। ঘাটাল থেকে ফুলবনি অনেক দূর। কিন্তু স্থলপথে যাওয়া যায়। গরুর গাড়িতে করে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। গরুর গাড়িতে চেপে দিন-তিনেক লেগেছিল শালবনি পৌঁছতে।

সূর্য বলল, দাদু বিভূতিভূষণের একটি গল্প এমন আছে, গুরুদাস চন্দ্র বই পড়তেন?

—জানি না, বাবার মুখে তো আমি শুনিনি কোনোদিন তাঁর নাম, আমি কলেজে ঢুকে পড়েছি 'পথের পাঁচালী', আর সিনেমাও দেখেছি সেই সময় বোধ হয়।

সূর্য বলল, দাদু আমার মনে পড়ে যাচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নদীর ধারে বাড়ি" গল্পের কথা। সেখানেও যুদ্ধের সময় সওদাগরী অফিসের কেরানিবাবু কলকাতার বসতি তুলে, চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বনগাঁ—রাণাঘাট লাইনে গাংনাপুর স্টেশনে নেমে দশমাইল দূরের এক নদীর ধারের গ্রামে।

বিমর্ষ অবিনাশ বললেন, গল্পে যা হয়, জীবনে কি তা হয়?

সূর্য বলল, বিভূতিভূষণ সেই গল্পে বলছেন, বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবনে ঝুঁকি নিয়েই মানুষ বড় কিছু করতে পারে। বাঁচতে পারে ভালভাবে।

কবিতা লেখার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে, ফিজিক্স অনার্স ছেড়ে তুই বাংলা অনার্স নিলি, তোকে নিয়ে তোর বাবার খুব আশা ছিল সূর্য, আশাভঙ্গের দুঃখ ছিল। অবিনাশ বললেন।

আমি যা করেছি মন চেয়েছে বলেই করেছি। বলল সূর্য। দপ করে জ্বলে উঠল যেন তার চোখ।

অবিনাশ আর সূর্যর কথা শুনছিল মৃণাল ও মনীশ। তাদের পিছনে অভিষেক। অভিষেকের বছর তিরিশ বয়স। সে বিডিও অফিসে চাকরি করে। চুপচাপ থাকে। অবাক হয়ে শুনছিল সব। কিছুই জানে না। মা তো বলেনি। বলেনি কারণ সে শুনতে চায়নি। মা তো বলেছে অনেকবার যে মায়েদের আদি বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার শালকিয়াতে। সে তো কোনোদিন শুনতে চায়নি মায়ের ঠাকুরদা ফুলবনি এসে পৌঁছলেন কী করে? তিনদিন লেগেছিল ফুলবনি আসতে। সন্ধে হলে কোনো গ্রামে আশ্রয়। খোলা মাঠে রান্না করে খাওয়া। সকালে আবার যাত্রা শুরু। ক্রমশ বদল হয়ে যেতে লাগল মাটি। লালচে রঙ। পাথরের চাঙড় হেথা হোথা। পথে চড়াই উৎরাই কম নয়। কখনো ধু ধু প্রান্তর। মাঠের শেষ-ই হয় না। মাঝে মধ্যে বড় বট অশ্বত্থ। তার ছায়ায় নেমে ফলার করা। বড়, মেজ, সেজ আর দুই মেয়ের ছুটোছুটি। আবার চলা শুরু। বাতাসে আগুনে ভাব যায়নি তখনো। মাসটা জৈষ্ঠের শেষ। একবার পথ ভুল করেছিল গাড়োয়ান। বাঁকুড়ার দিকে চলে গিয়েছিল গাড়ি। পথে জিজ্ঞেস করে আবার ফিরেছিল ঠিক রাস্তায়। সমস্ত পথ দুই মেয়ে চার ছেলে কলকল করতে করতে ঘেমে গিয়েছিল। আর কতদূর সেই ফুলের বন ফুলবনি? পিসির বাড়ি ? চাষের জমি কেমন সিঁড়ির মতো উঠে গেছে। তারা কেউ এমনি দ্যাখেনি। যেতে যেতে গাড়োয়ান বলল, সেদিকে একটা ডাঙা আছে, যেখেনে বক রাক্ষসের হাড় দেখা যায়। সেখেনে গণগণ করে আগুন। হুঁ, গণগণির ডাঙা। সেই ডাঙাকে ডান দিকে রেখে গরুর গাড়ি দুটি ফুলবনির পথ ধরল। এবার জঙ্গল দেখা গেল। সবুজ পাতায় ভরা গাছ। জঙ্গলের পাশ দিয়ে গাড়িদুটি চলল। অমন বন কোনোকালে দ্যাখেনি গুরুদাসও। মুগ্ধ হয়ে ছেলেমেয়েদের বলল, দ্যাখ, দেখে নে জঙ্গল কাকে বলে। কত বড় বড় শালবন। এরে বলে শালগাছ। শালকেতে থাকলে দেখতে পেতিস? হাঁ ভাই কী কী গাছ আছে এই বনে?

গাড়োয়ান বলেছিল, ঐটে মহুল গাছ, হরিতকী আছে, পিয়াল, অজ্জুন, চাকুন্দা গাছ, কতরকম যে গাছ আছে তার শেষ নেই, পাখির ডাক শুনছেন বাবু?

—কী পাখি?

—বনের পাখি, একটা ডাকে অন্যটা সাড়া দেয়।

তারা শুনতে পাচ্ছিল। বন পেরিয়ে আবার লাল মোরামের রাস্তা। বেলা পড়ে আসছে। গাড়োয়ান বলল, বাবু ঐ দ্যাখেন পাহাড়। পাহাড়! পাহাড় দেখা যাচ্ছে দূর পশ্চিমে। নীল। মেঘের মতো ঢেউ তাতে। লক্ষ্মীরানি মাথার কাপড় যে পড়ে গেছে সে খেয়াল নেই। অবাক হয়ে পাহাড় দেখতে লাগল। পাহাড় কোনোদিন দ্যাখেনি সে। শালকেতে থাকলে দেখতে পেত এমন বন এমন পাহাড়? গাড়োয়ান বলল, ওই দিকে পাহাড় যে আরম্ভ হলো আর শেষ নাই।

—কতদূর হবে ? জিজ্ঞেস করেছিল লক্ষ্মীরানি।

গাড়োয়ান বলেছিল, পাহাড় না মা হাঁটে, ছল করে মানষির সঙ্গে, যত যাবে, ততো পিছবে, ভুলোর মতো ছুটায়ে নিয়ে যাবে।

—পাহাড়ে কি পৌছনো যায় না?

—যায় মা, কিন্তু অনেক ঘুরের পর, এই দেখছ কাছে, কিন্তু পথ আর ফুরায়নি।

পেছনের গাড়ি থেকে গুরুদাস ডেকেছিল, পাহাড় দেখলে, শালকের চেয়ে ভালো হলো কি না বলো।

—হ্যাঁ। মাথায় কাপড় তুলতে তুলতে অস্পষ্ট জবাব দিয়েছিল লক্ষ্মীরানি।

—শালকে তুমি গেছ দাদু? সূর্য জিজ্ঞেস করে।

—গিয়েছিলাম, এক রাত্তির থেকে চলে এসেছিলাম।

—কেন, চলে এলে কেন, ওপারেই তো কলকাতা।

অবিনাশ বললেন, ইটচাপা ঘাসের মতো লেগেছিল শালকে, শুধু দালান-কোঠা, ভেঙে ভেঙে পড়ছে, আমাদের শরিক জেঠা কাকাদের অংশ মেরামত করার ক্ষমতা তাঁদের নাই।

সূর্য বলল, সেই পাহাড় যা দেখেছিল তোমার ঠাকুরদা ঠাকুমা, সব আছে এখনো।

—আছে, পৃথিবীতে সব থেকে যায়, মানুষের সামান্য আয়ু।

—গোরাবাড়ির জঙ্গল দেখেছিল মনে হয়? সূর্য বলল।

—হ্যাঁ, তাই-ই হবে।

—সেই গণগণির ডাঙাও আছে দাদু। সূর্য বলল।

—সবই আছে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা...সব, শুধু যে যায়, চলেই যায়। বৃদ্ধের গলা কেঁপে যায়।

—তোমরা চলে এসে ভালো করেছিলে। সূর্য বলল, এর পরের বছর তো দুর্ভিক্ষ এসে গেল।

—তুই জানিস? অবিনাশ জিজ্ঞেস করলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাস আছে 'অশনি সঙ্কেত'। বলে মাথা নামায় সূর্য। চুপ করে গেল। বাবার কাজ করল আজ। নিরাকার দেহে অন্ন আর জল নিতে এসেছিলেন তিনি। ১৩৫০-এর মন্বন্তরে কত মানুষের অন্ন আর জল ছিল না। বেঁচেও না, মরেও না। শুনেছে সে মায়ের কাছে। মা শুনেছিল নিজের ঠাকুমার কাছে। কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকত অন্নহীন মৃতদেহ। শালকে কি আলাদা ছিল কিছু? শালকের রাস্তাতেও নিশ্চয় 'ফ্যান দাও মা' করতে করতে মরে পড়েছিল অনেক অন্নহীন।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলেন, কবে পড়লি তুই, তোর বাবা তো পড়েনি এসব?

—কবে পড়েছি মনে নেই দাদু। সূর্য বলল, পুব আকাশে তাকিয়ে। বেলা শেষ হয়েগেল।

তিন

পাহাড় আর অরণ্য দেখতে দেখতে পৌঁছন গেল এই ফুলবনি। রমলার শ্বশুর বাড়ি। তারা সাহায্য করেছিল খুব। জমি শস্তা। বিঘে দুই কিনে মাটির বাড়ি খড়ের চাল দিয়ে বসতবাটি নির্মাণ করে গুরুদাস বাস করতে আরম্ভ করেন সেই অচেনা গঞ্জে। আর কিনেছিলেন বিঘে পঁচিশ জংলা জমি, পাথুরে। চাষবাস করবেন। সব বুঝিয়ে দিয়েছিল রমলার শ্বশুর। মানুষটির অন্তর ছিল শুদ্ধ। তিনি চেনা আদিবাসী চাষিদের ডেকে ভাগে চাষ করে দিতে বললেন। যে বছর বৃষ্টি হতো ভালো, ধান পেতেন, না হলে জমির ধান পাকার আগেই জমিতে মরত। ফুলবনিতে জলের খুব অভাব। গ্রীষ্ম ভয়ানক। শীত খুব তীব্র। বর্ষা খুব বেশি হয় না। মাটিতে জল পড়লেই শুষে নেয়। পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি।

তখন কী করবেন? ব্যবসাপাতি। ছোটখাটো ব্যবসা। কোনোটায় লাভ করেছেন, কোনোটায় পুরো লোকসান। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন, কী করে তা হবে? চার পুত্রের কনিষ্ঠ এই অবিনাশ ব্যতীত কেউ গ্রাজুয়েট হয়নি। তবে সে আমলে ক'জনই বা গ্রাজুয়েট ছিল? ছেলেরা বড় হতে নেমে পড়েছিল ব্যবসায়। তারাও যে সফল হয়েছিল তা নয়। তিনি কী না করেছেন, দোকানে কাজ করেছেন, মিলিটারি ক্যাম্পে ভাত সাপ্লাই করিয়েছেন বড় ছেলেকে দিয়ে। ফুলবনিতে একটা ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পে গিয়ে ফাই-ফরমাসও খেটেছে মেজজন। অবিনাশ যখন কলেজে গেছেন, সব সামলে নিয়েছেন গুরুদাস। তিনি ভাগ্য বদলাতে এসেছিলেন, বদলে নিয়েছিলেন তো সত্য।

সূর্য বলল, দাদু সন্ধে হলো প্রায়।

অবিনাশ আচ্ছন্নের দৃষ্টিতে তাকালেন সকলের দিকে। অনেকজন হয়ে গেছে। সদ্য বিধবা পুত্রবধূও এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা।

—হ্যাঁ বাবা, আপনি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। অনুনয় করল সূর্যর মা চন্দনা।

—যখন সন্ধে হতো, সেই শুক্রবারের কথা কেউ জানো ?

—কী কথা ? সূর্য জিজ্ঞেস করল।

অবিনাশ বললেন, নদীর নামটি অঞ্জনা, তাহার নামটি রঞ্জনা, বাবা একদিন বসিয়ে দিলেন রেডিওর সামনে, রাত আটটার আগে কাজ শেষ করে নাও সবাই, ছেলের বউরা, দুই মেয়ে, ছেলেরা সব রেডিওর সামনে এসে বসল, সব শুক্রবারেই রেডিও নাটক, মনে আছে তোর মনীশ?

মনীশ বলল, মনে আছে, আমিও শুনেছি।

—আর কী মনে আছে?

মনীশ চুপ করে আছে।

—তোমরা জানো বউমা?

কেউ কোনো কথা বলল না। তখন অবিনাশ বললেন, চাঁদ উঠেছে তো?

হ্যাঁ, জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল সকলের অলক্ষ্যে। মৃণাল ভাবছিল ভিতরে গিয়ে টেলিভিশনে আই. পি. এল. দেখবে। সে পায়চারি করছিল। পিতামহ-র এই কাহিনি সে শুনেছে অনেক। এখন আর নতুন কিছু মনে হয় না। নীলুর মৃত্যু একেবারে দুমড়ে দিয়েছে কাকাকে। নীলু যখন উগ্রপন্থীদের নামে হুমকি পাচ্ছিল, তাকে ফোন করেছিল। তার শ্বশুরমশায় ঝাড়গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ। এস. পি. ডি. এম—সব মহলে ভালো যোগাযোগ। মৃণাল বলেছিল ব্যবস্থা করবে পুলিশি সাহায্য দিয়ে। যারা হুমকি দিচ্ছিল তারা সুযোগসন্ধানী। মাওবাদী কি না সন্দেহ। মৃণাল ভুলে গিয়েছিল বলতে।

অবিনাশ বললেন, মৃণাল যেও না, আবার কবে আসবে জানি না, আমিই বা কতদিন থাকব।

—থাক ওসব। মৃণাল বলল।

—আমরা মনে করি যা, সব তো ঠিক মনে করি না, তুমি পারনি, পারনি আমি জানি, খেদ নেই তাতে।

মৃণাল মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অবিনাশ বললেন, আলো নিভিয়ে দাও বাইরের।

—কেন ? জিজ্ঞেস করল মনীশ।

অবিনাশ বললেন, জ্যোৎস্না হয়েছে, সামনে দেখ কত বড় চাঁদ!

সূর্য বলল, দাদু তুমি কি? কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

—হ্যাঁ, আমি তাই চাই। অবিনাশের গলা ধরে গেল।

—দাদু কথাটা কি সত্যি?

—হ্যাঁরে সত্যি, দুঃখ বয়ে বেড়ালে তোর কবিতাও হবে না, তোর ফুলবনি যাত্রা থেমেযাবে।

মুন্ডিত মস্তক গৌরবরণ যুবক বলল, মা জ্যোৎস্না রাতে লুকোচুরির কথা বলেছিলে না তুমি?

—তোর বাবা বলেছিল আমাকে। মুখে আঁচল চাপা দিল চন্দনা, তাঁর ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে পূর্ণিমা রাতে খেলতেন লুকোচুরি।

—স্বর্গীয় গুরুদাস চন্দ্র।

সামনে খোলা উঠোন। প্রাচীন এক শিউলি গাছ। দুটি আম গাছ, একটি নিম। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত খোলা জায়গায়। গাছের ছায়া পড়েছে তার ভিতর।

সন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে গুরুদাস বললেন, এস, আমরা সকলে জোছনায় লুকোচুরি খেলি।

—আমরা সবাই মিলে ?

—হ্যাঁ মা, তার ভিতরে নীলুও এসে যাবে।

—কে নীলু ? লক্ষ্মীরানি জিজ্ঞেস করেছেন, নীলু বলে তো কেউ নেই।

—কেন অবিনের ছেলে।

—অবিন, তার তো বারো বছর সবে। লক্ষ্মীরানি বললেন।

গুরুদাস বললেন, জোছনায় নেমে পড়, শালকেতে এমন চাঁদের আলো ছিল না।

সেই রাত্রি ফিরে এসেছে আবার। সকলে যেন ঘুম ভেঙে উঠে চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গনের দিকে তাকায়। আম, শিউলি আর নিমের ছায়াটুকুতে অন্ধকার। তা বাদে আলোয় সব ঝিলমিল করছে। সূর্য বলল, মা এসো, এমন জোছনা শালকেতে ছিল না।

চন্দনা ডাকল বিলুর বউকে। সে ডাকল মনীশের বউ সুমনাকে। মনীশের বউ সুমনা ডাকল মল্লিকাকে। মল্লিকা ডাকল মৃণালের বউ চম্পাকে। সূর্য ডাকল অভিষেককে। আর অবিনাশ ডাকলেন নীলুকে। আয়, এমন চাঁদের আলো বৃথা কেন নষ্ট হবে।

গুরুদাস বললেন, আমি বুড়ি হই, আমাকে ছুঁতে হবে।

নীলু। নীলুর মুখ দেখা গেল যেন। সূর্য জোছনার ভিতরে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আমি ফুলবনি যাত্রা করেছি বাবা, দ্যাখো পারব ঠিক, ঠিক পৌঁছে যাব, ভেবো না, পাহাড় অরণ্য, গণগণির ডাঙা চিনে চিনে।

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলি—

ব্ল্যাক মিল্ক

সন্নিহিতি

শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক গল্পসম্ভার

: অনুবাদ গ্রন্থ :

Alamort by Ananya Bandopadhyay
Cold Mist by Arunanshu Bhattacharya
Selected Poems of Mridul Dasgupta
Selected Poems of Pankaj Saha
Muse of Software Clad Body by Bablu Giri.

ন লি নী বে রা
গো অ্যাজ ইউ লাইক

আমাদের গ্রামের পশ্চিমে হেলে-পড়া বটগাছের তলায় আমাদের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। তখন আমার ক্লাস থ্রি।

নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ক'জনই বা টিচার! ওই তো বড়জোর দুজন 'বড়দা' আর 'ছোড়দা'। 'বড়দা' তার মানে হেডস্যার। 'ছোড়দা' সেকেণ্ড টিচার।

শনিবার শনিবার বড়দা ইস্কুলে আমাদের আবৃত্তি ধরত।

আমরা থ্রি-ফোরের ছাত্র-ছাত্রীরা 'খাই খাই'-এর মতো লম্বা লম্বা কবিতা আবৃত্তি করতাম। বিশেষ করে আমি, সেই যে সেই—

"খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যতকিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব, —থাক সেই আশাতে।"

ওয়ান-টু'য়ের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি না করলেও মন দিয়ে শুনত। শুনতে শুনতে তাদের চোখগুলি হয়ে উঠত ড্যাবা ড্যাবা। অত্যধিক মনোযোগ হেতু অসাবধানতায় মুখ থেকে লালা ঝরত।

'খাই খাই'-ই হচ্ছিল। আমারই কবিতা। শেষ হতে না হতেই টু-য়ের একটি ছেলে আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করল। আমরা থ্রি-ফোর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আ রে এ যে ক্লাস টু'য়ের অভয়চরণ! ডাকনাম 'হাড়িরাম'।

"কী ব্যাপার অভয়? উঠে দাঁড়ালে যে?"

বড়দার জিজ্ঞাসা।

অভয় হাত জোড় করেই বলল, "একটা আবৃত্তি করব!"

বড়দা ভারি উল্লসিত হয়ে টেবিল চাপড়ে অভয়কে অভয় দিয়ে বললেন, "এই তো চাই-ই! ছোটদের মধ্য থেকেও উৎসাহিত হয়ে কেউ যদি আবৃত্তি করতে চায়, বাঃ বেশ বেশ! অভয় শুরু করো!"

প্রথমটায় অভয় থতমত খেল। তারপর শরীর মৃদুমন্দ দোলাতে দোলাতে রুদ্ধশ্বাসে বলে চলল,—

"অ থ অথ ক র কর চ র চর ধ ন ধন
ই হ ইহ খ ল খল ছ ল ছল ন খ নখ
ঈ শ ঈশ গ ণ গণ জ ল জল ন ত নত
ঋ ণ ঋণ গ ত গত ত ট তট -"

বড়দাও হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "অভয়! থামো থামো! ওহে এ যে পদ্য নহে, গদ্য"

কিন্তু থামতে বললেই অভয় থামবে কেন? সে যে শেষ পর্যন্ত বলে তবেই ছাড়বে "ন র নর এ ক এক ঘ ন ঘন দ শ দশ প ট পট।"

থামল বটে অভয়। কিন্তু ততক্ষণে সারা ইস্কুলঘরে হাসির রোল আছড়ে পড়ল। বড়দাও না হেসে থাকতে পারলেন না।

অভয় টু থেকে থ্রি। আমার ফোর। এবার সে ইচ্ছে মতো কবিতা আবৃত্তি করতেই পারে। তাই মাঝে মাঝেই কবিতা মুখস্ত করে। সেদিন যেমন মুখস্ত করছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বাংলাদেশ'।

পড়াশোনায় তেমন মন নেই অভয়ের, খুবই অমনোযোগী। বঁড়শি দিয়ে মাছধরা, বাঁটুল দিয়ে পাখি মারা, আরও নানান কাজে তার ব্যস্ততা ভারি। ইস্কুলের চার দেয়ালের ভিতরে থেকেও তার মন পড়ে থাকত গাছের ডালে খালে-বিলে নদীধারে।

সেদিনটা অবশ্য ইস্কুলে এসেই ছোড়দা থ্রি-র ছাত্রদের বললেন, "তোরা 'বাংলাদেশ' কবিতাটা মুখস্ত কর।" বলামাত্রই শুরু হয়ে গেল কলরব—

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল,
কোন দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল।"

অভয় তথা হাড়িরামও দুলে দুলে শুরু করেছিল বৈকি "কোন দেশেতে"। কিন্তু " কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা"তে এসেই তার পড়া শেষ, ফের অন্যমনস্ক অভয়। পড়া থামিয়ে জানলার ফাঁক-ফোকর দিয়ে নদী দেখে, ইস্কুলঘরের পিছনের বটগাছটায় সাদা বকে বকে ছয়লাপ, বক দেখছে অভয়।

পুনরায় পড়ার কথা মনে এলে আন্দাজে সে মুখস্ত বলে, "এখন ফিঙে গাছে গাছে নাচে"। ফের থামে, ফের পড়ে। হায়! কিন্তু ঐ একটা লাইনই—"এখন ফিঙে গাছে গাছে নাচে।"

একটানা নাকী সুরে পড়ে যাওয়া "এখন ফিঙে গাছে গাছে নাচে" লাইনটা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড টিচার 'ছোড়দা'র কানে এসে ধাক্কা মারল। "ফিঙে গাছে গাছে নাচে" না হয় হল, তাবলে "এখন"?

ধীর পায়ে চুপিসারে অভয়ের পিছনে হাজির হয়ে ছোড়দা অভয়ের একটি কান একহাতে ধরে "এখন ফিঙে" বলতে বলতে দুলন্ত ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো বাম থেকে ডানে, আরেক হাতে আরেকটি কান টেনে "গাছে গাছে নাচে" ডান থেকে বামে পর্যায়ক্রমে যুগপৎ বলতে লাগলেন।

বলতে লাগলেন, বলতে লাগলেন। আর সেই থেকে অভয়ও হয়ে গেল "এখন ফিঙে।"

ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সবে শেষ হয়েছে। আমি, আমরা কোনও কোনও ইভেন্টে যার পর নেই ভালো ফল করেছি। বিশেষ করে আমি তো 'অঙ্ক দৌড়'-এ সবার সেরা।

কিন্তু 'এখন ফিঙে' অভয়চরণ সবটাতেই হেরো। সবার পিছনে। অবশেষে এল 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' বা যেমন খুশি সাজোর পালা। লুকিয়ে লুকিয়ে কে যে কতরকম সেজে এল। কেউ কেউ ভিখারি, কেউ বাউল, কেউ বা পাগল।

অভয়চরণ টুপিমাথায় 'দিল্লি চলো'র ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল ঘন্টার পর ঘন্টা। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল সে। আমরা ভাবলাম অবধারিত ফার্স্ট প্রাইজ।

হলও তাই। ছোড়দা,বড়দা, আমরা, সমবেত দর্শকেরা —একধারসে সবাই খুশি। 'এখন ফিঙে' বদনাম অভয়ের ঘুচে গেল চিরতরে।

ফোর পাস। তারমানে নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ। আমি, আমরা, আমার কতিপয় বন্ধুরা তোড়জোড় করে ভর্তি হলাম রোহিনী চৌধুরানী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুলে। একবছর বাদে ক্লাস ফোরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও বড় ইস্কুলে ভর্তি হতে পারল না অভয়।

বনেজঙ্গলে গরুমোষ নিয়ে অতঃপর সে চরাতে যায়। "ছাগলবাগাল কানকুটরি গরুবাগাল রাজা।" ইস্কুলহোস্টেলে থাকার সুবাদে তার সঙ্গে দেখা হয় না আর, লোকমুখে যা শুনি সে তো মাথায় তারের মুকুট পরে গোচারণে যায়। বাঁশি বাজিয়ে গান গায় "আমায় সাজায়ে দে গো! গোধন চরাইতে যাব বলাই দাদার সনে। আমায় সাজায়ে দে গো- "বড় ইস্কুল ছেড়ে, বলতে কী গ্রাম ছেড়ে আমি শহরে এলাম। কলেজ পাস করে চাকরিতে ঢুকলাম। চাকরিসূত্রে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াই। গ্রামে আর তেমন যাওয়াও হয় না। গেলেও তড়িঘড়ি ফিরে আসতে হয়। মোটে দেখা-সাক্ষাত হয় না অভয়ের সঙ্গে। কোথায় থাকে, কী করে কোনও খোঁজখবরও পাই না।

অবশেষে আমার চাকরির মেয়াদও একদিন শেষ হল। মনস্থ করলাম অবসর জীবনটা এবার গ্রামেই কাটাব। "নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।" গঙ্গা নাই থাক, সুবর্ণরেখা তো আছে।

কিন্তু আমাদের এজমালি বাড়িটা বসবাসের পক্ষে অপ্রতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন না, বাবা-কাকারা একুনে পাঁচ ভাই। তস্য সন্তানসন্ততিতে পারিবারিক কলেবর যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। অগত্যা একটা নতুন আস্তানা গড়তেই হচ্ছে।

ডাহি জমি। ধানী সোয়েম কিংবা বাস্তু নয়। ঝাঁটিজঙ্গল সাফসুতোরো করে বসতবাটী বানাতে হবে।

খুব মনে পড়ে, এককালে বাবা-মা দু'জনে মিলে এখানেই মকাই-বরবটি ঝিঙা-বৈতালের চাষ করতেন। বৈশাখ-জৈষ্ঠে প্রথমে মকাই বুনতেন। মকাইয়ের গাছ বুকসমান হতে না হতেই তলায় তলায় বৈতাল-ঝিঙা-বরবটির বীজ পুঁততেন।

মকাই এসে গাদর হতে না হতেই ডিঙলা-বরবটির লৈ-লতি ডিগডিগিয়ে বেড়ে উঠত। বাবা চলে গেলেন আগে আগেই, তার অব্যবহিত পরে পরেই মা একটা বিশালকায় বৈতালকে একদিন জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "তোর বাপের হাত বড়ো পয়া ছিল রে!"

সেই থেকে এই জমির উপর কেমন মায়া 'রহিয়া গিয়াছিল' আমারও। ঐ তো দক্ষিণের বাঁশঝাড় তার সীমানা! যেমনকার বাঁশঝাড় তেমনই আছে আজও। তবে মকাই-বরবটির চাষ কবেই উঠে গেছে।

পুরাতন ডাহির সেই জমিটাই একদিন বনঝাড় ঝাঁটিপালা পরিষ্কার করে পুরোহিত ডেকে ভিত-পূজা করাও হল। কিন্তু গোল বাধল ভিত খুঁড়তে গিয়ে। না না, ডেভেলপারকৃত নকশায় কোনও ত্রুটি ছিল না। কোদাল-শাবল-গাঁইতি নিয়ে মজুররাও মাটি খুঁড়তে একরকম প্রস্তুত হঠাৎ চোখে পড়ল জমির দক্ষিণের সীমানা থেকে প্রায় পনের-কুড়ি ফুট অন্দরে আমাদেরই জমির ভিতরে রাতারাতি কে একটা খুঁটি পুঁতে দিয়েছে! খুঁটিটার মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই করা।

এরকমটা কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন পড়েছি, কোথায় যেন হ্যাঁ, মনে পড়ল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরণ্যক " উপন্যাসে। ঐযে বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে। আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি খাম্বা।"

আমিও ভাই-ভাইপোদের ডেকে পাঠালাম। তারা এসে দেখেশুনে বলল,"এসব হাড়িরামেরই কীর্তি।"

"হাড়িরাম? মানে আমাদের অভয়চরণ?"

"হ্যাঁ, কোত্থেকে এক বনমালী নামের আমিন এনে জরিপ করিয়ে নিশানদিহি খাম্বা পুঁতে দিয়েছে। আমরা সে-জরিপ মানি না। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকেই দক্ষিণের বাঁশঝাড় আমাদের সীমানা।"

বলে তারাই খাম্বাটি উপড়ে দিয়ে যে যার সে তার ঘরে ফিরে গেল। ভিত-খননের কাজ অতঃপর যথারীতি চলতে লাগল। খোঁড়াখুঁড়ি প্রায় শেষ। এমনসময় একটা মিছিলের কলরব শোনা গেল।

জমির পাশ দিয়ে নয়াগ্রাম-টু-গোপীবল্লভপুরের পিচ সড়ক। যাত্রীবাহী বাস মালবাহী ট্রাক মাঝেমাঝেই ছুটে যাচ্ছে। তদুপরি ছোট ছোট গাড়ি, অটো-টোটো, ট্রেকার।

আমি ভাবলাম, ট্রাকবোজাই বা বাসবোঝাই মিছিলের লোক যাচ্ছে। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" আওয়াজও তো উঠছে মুহুর্মুহু। না না, বাস-ট্রাক নয় একটা আস্ত মিছিল এসে থমকে দাঁড়াল আমাদের জমিটার গা ঘেঁষে।

মাথায় একধরনের টুপি আছে প্রায় সকলেরই। খাকি পোশাকও পরেছে জনা কুড়ি-পঁচিশ। বাকিরা ধুতি-গামছা। কেউ কেউ লুঙ্গি। উপস্থিত রাজমিস্ত্রি ও তার হেল্পারদের জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কারা?"

"হাড়িরামের লোকজন। আজাদ হিন্দ ফৌজ।"

সবিস্ময়ে বললাম, "মানে?"

ততক্ষণে মিছিলটা জমিতে ঢুকে পড়েছে। শ্লোগান দিচ্ছে

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ"

আমার ছোটভাইয়ের ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমার কানে কানে বলল, "জেঠু, খোঁড়াখুঁড়ি আপাতত বন্ধ থাক। আমরাও না হয় সরেস আমিন এনে জরিপ করিয়ে সীমানা-চৌহদ্দি আগে ঠিক করে নিই।"

"তা নাহয় হল। কিন্তু ব্যাপার কী রে?"

তার মুখ থেকেই শুনলাম, সেই কোন ছোটবেলা থেকেই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়েছে অভয়চরণ। তার সঙ্গী ছাগলবাগাল গরুবাগাল, আর আর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। রীতিমতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত। যেখানে যতসব অন্যায় অবিচার প্রতিবাদে সে দলবল নিয়ে মুখর হয়।

"ক দ ম ক দ ম বা ড়া য়ে যা" গাইতে গাইতে এতক্ষণে সে আমার কাছেও ফৌজ নিয়ে হাজির হয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ করল।

নিশানদিহির খাম্বা যথাস্থানে পুনরায় পুঁতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে কপালে হাতের চেটো ঠেকিয়ে তাকে স্যালুট করে বললাম, "মনে পড়ে অভয়? নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল স্পোর্টসশেষে 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর কথা? নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেজে আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিলি।

আজও তোর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ '-এর কাছে আমি হেরে গেলাম অভয় !!

—কবি শকুন্তলা সান্যালের কবিতা সম্ভার—

গোপন ছবি

নাগরিক কথা

কানা মনের নিয়োজন

দেবযানীর প্রেম

অতএব শকুন্তলা

খচ খচ আমায় কৌশল শিখিয়ে গ্যালো

কল্পতরু ভাবতেই পারো এ উলূপীর কথা

গৌ ত ম দে
দুই বুড়োবুড়ি

নদীর স্রোতের সঙ্গে চলেছে রাশি রাশি ইলিশের সাঁতার। যত জল তত ইলিশ যেন! কেউ ভাবতেও পারেনি। জলের স্রোতের মধ্যে একেবারে হুড়োহুড়ি, গুঁতোগুঁতি পড়ে গেছে। জল আর দেখা যাচ্ছে না একটুও। কেবলই রূপালি শস্য। ইলিশ আর ইলিশ। শত শত ইলিশ মাছের ঝাঁক। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চারদিক ঝিকমিক ঝিকমিক করছে! বেশিক্ষণ তাকানো যায় না সেদিকে। কই মাছের মতো সব যেন পাড়ে উঠতে চাইছে। উঠতে চাইছে গঙ্গার দুই পাড় বরাবর। কেন উঠতে চাইছে? কেউই বলতে পারছে না।

একমাত্র ইলিশ বিশেষজ্ঞরা হয়তো বলতে পারবেন।

এই দৃশ্যটা চাউর হতে বেশি সময় লাগল না। বাতাসের থেকেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন লোকালয়ে। সবাই দেখি দেখি করতে করতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সবারই মনে বিস্ময়! বিস্ময়ের সঙ্গে খুশি। দুটি শব্দ মিলেমিশে একাকার। সাধারণ মানুষ তো খুশি হবেই। বাজারে ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষ বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করতেও এখন ভয় পান। অথচ খবরে প্রকাশ, প্রতিদিনই টন টন ইলিশ ধরা পড়ছে জেলেদের জালে।

তো আজ সাধারণ মানুষের খুশির বাঁধ ভেঙেছে। হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়েছে ঘোলা জলে। 'মাছ ধরিব আর খাইব সুখে'। এই একটিমাত্র স্লোগান সাধারণ মানুষের চোখেমুখে জ্বলজ্বল করছে।

এ এক আজব ঘটনা! দুর্ঘটনা কিছুতেই বলা যাবে না।

গঙ্গার দুই পাড়ের বিভিন্ন শহরের মানুষরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর যে যার মতো গঙ্গার দুই পাড়ে এসে পড়ল। ঘাট-আঘাটায় নেমে পড়ল। কারোর কোনও ভয়ডর বলতে কিস্যু নেই। একেবারে হইহই রইরই ব্যাপার স্যাপার। অনেকটা উৎসবের মতো। 'দুয়ারে ইলিশ' এসেছে গো! 'দুয়ারে ইলিশ' এসেছে! এটা এখন কথার কথা হয়ে উঠেছে জনমানসে। হাসিঠাট্টার পর্যায়ে চলে গেছে। বিভিন্ন ঠেকে কথাপ্রসঙ্গে এই কথাটি হাসতে হাসতে বলেও ফেলছেন কেউ কেউ।

গঙ্গার দুই পাড়ে একটা জোরালো উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে মেলা বসে গেছে। এখানে গরিব ধনীর কোনও ভেদাভেদ নেই। সবাই প্যান্ট আর শাড়ি গুটিয়ে জল কাদায় নেমে পড়েছে ইলিশ মাছ কুড়োতে। অনেকের বাজারের ব্যাগ ভরতি হয়ে উপচে পড়েছে। তবুও তাদের ইলিশ কুড়ানোর বিরাম নেই। রাস্তার ধারে দামিদামি গাড়ির লম্বা লাইন। গাড়ির ডিকিতে ডিকিতে ভরতি ইলিশমাছ। বাবুরা কিনছেন। বিবিরা হাসছেন। তাদের কেনার বিরাম নেই। অনেকেই আরও কিছু ইলিশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ক্ষণে ক্ষণে ওই ঘোলাজলে।

ইলিশগুলো কিন্তু খুব একটা ছোট নয় মনে হচ্ছে।

হুম ঠিক বলেছেন।

পাঁচশ'র নিচে তো নয়ই একেবারে।

এক কিলো, দুই কিলো, তিন কিলো সাইজের।

যাকে বলে ভরাপেট। এই সময় দলে দলে ইলিশ মাছেরা মিষ্টি জলে প্রসব করতে আসে মশাই!

জল কি আর মিষ্ট আছে ভিতুবাবু! বিষ। বিষ হয়ে গেছে।

কথাটা মন্দ বলেননি হিসিদা। মানে হিমাদ্রী সিংহকে সংক্ষেপে বন্ধুরা বলেন 'হিসিদা'। সেইরকম ভাবে আবারও বলেন, ঠিকই বলেছেন। একদম পারফেক্ট কথা বলেছেন।

হাজার হাজার মানুষের মুখের হাসি এই গঙ্গার জলের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যেন! গঙ্গার দুই পাড়ে মুহূর্তে অস্থায়ী দোকান গজিয়ে উঠল। বাতাসে ইলিশভাজার দুর্দান্ত গন্ধ। মুহূর্তে পাবলিকের আনা মাছ কম পয়সায় রান্না করে দিচ্ছে দোকানি। পাবলিক তাড়িয়ে তাড়িয়ে হাপুসহুপুস করে বেবাক খাচ্ছে ইলিশ মাছ ভাজা। হাসতে হাসতে খাচ্ছে। নাচতে নাচতে খাচ্ছে। আনন্দ করতে করতে খাচ্ছে। কেউ আবার উদ্দাম গলায় বেসুরো হিন্দি কিংবা বাংলা গান গাইছে।

আজ যেন একটা ঐতিহাসিক দিন। অনেকের কাছে। কেননা দুয়ারে ইলিশ! ন্যাজ নাড়ছে। অনেকেই নানাভাবে সেলিব্রেট করছে নিজেদের। নানা কায়দায় খুশি খুশি মুখে সেলফি তুলছে। একমাত্র সঙ্গী সেই ইলিশ মাছ। সেই সেলফিতে ইলিশ মাছের ভরপুর গন্ধ, ইলিশ মাছের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লেগে আছে যেন!

ইলিশ মাছ ভাজা খুশি মনে খেতে খেতে ঘোতনবাবু স্ত্রী পদ্মিনীকে (এই নামেই ডাকেন কখনও সখনও নন্দিনীকে। নন্দিনী হয়ে যায় পদ্মিনী। হিট ছবির নায়িকা। বিয়ের পঁয়তিরিশ বছর পরও! তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশের আগমন এই মড়া গঙ্গায়। এই মুহূর্তে আর পাঁচজনের মতো তিনিও ভরপুর খুশিতে ডুবে আছেন) বললেন, আমার এতো বছর বয়স হল এমনটি দেখিনি। তুমি কি দেখেছ?

না। ইলিশ মাছ ভাজা খেতে খেতে নন্দিনী বললেন।

বুঝলে পদ্মিনী, সবই তাঁর অনুপ্রেরণা। বলেই একচোট ছেলেমানুষের মতো হেসে নিলেন ঘোতন বিশ্বাস।

কত ইলিশ কুড়ালাম আমরা?

বিশ কিলোর মতো তো হবেই।

বাড়িতে গিয়ে ফ্রিজটা ফাঁকা করতে হবে। নন্দিনী মাছ খেতে খেতে আরও বললেন, সেখানে মাছ ঠুসিয়ে রাখব। নোনা ইলিশ তৈরি করব। সারা বছর ইলিশ খাব। আর রাক্ষুসে দামের কথা শুনতে হবে না। মনের সুখে ইলিশ মাছের নানান পদ রাঁধব। আর কবজি ডুবিয়ে খাব।

নন্দিনীর এই প্ল্যান শুনে ঘোতন বিশ্বাসের মনের মধ্যে পদ্মিনী কোলাপুরি নামটি বারবার ডিগবাজি খায়।

২

গঙ্গায় এই বিপুল পরিমাণ ইলিশ মাছের আগমনে ইন্টারন্যাশনাল খবর হয়ে যায়। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে শুরু করে এবং সমস্ত পয়লা নম্বরের খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বিগ হেডলাইনে প্রধান খবর হয়ে বেরোয়। সেই সঙ্গে গঙ্গার দুই পাড়ে সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। পৃথিবীর সর্বত্র লাইফ টেলিকাস্ট হয়। পাঁচ-পাবলিকের ইন্টারভিউ নেয় বিভিন্ন মিডিয়া। প্রতিবেশি দেশ থেকে ইলিশ মাছের আমদানির প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিস্তার 'পানি' বন্টনের কথাও বাদ যায় না।

ইলিশ মাছের সঙ্গে মানুষ। মানুষের সঙ্গে ইলিশ মাছ। সব একাকার হয়ে ওঠে। কেউ কেউ আবার নানান ব্যাখ্যা করছে। অনেক দেশে নাকি এইভাবে মাছেরা আত্মহত্যা করে। কেন করে হয়তো কেউ জানে না। জানার কথাও নয়। টিভির খবরে সেই দৃশ্য দেখেছে অনেকেই। ঘোতন বিশ্বাসও দেখেছেন। সেই নিয়ে আলোচনাও হয়। সবটাই নিজের মতো করে। এই দৃশ্য যে আমাদের দেশে মানে গঙ্গায় ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেননি। বিশেষজ্ঞরা নানা মতামত ব্যাখ্যা করছেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায়।

মাছে ভাতে বাঙালি। সেই বাঙালির পাতে প্রিয় মাছ 'ইলিশ মাছ' আজ বঞ্চিত। বাজারে আগুন দাম। যার কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে, সেই একমাত্র খেতে পারে। আমজনতার কাছে ইলিশ মাছ আজ অধরা। দূর গ্রহের বস্তু। অনেকটা স্বপ্নের মতো। প্রতিদিন ইলিশ মরসুমে সেই স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে।

স্বভাবতই প্রশাসন খুব খুশি। হাসিমুখের ছবি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

এটা কি কাকতালীয় ঘটনা? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। জনমানসে তর্ক চলবে। চলছেও।

অনেকের মধ্যে এই প্রশ্ন। আবার অনেকের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাসি মশকরা চলছে। অবিরত। তবুও প্রশাসনের প্রধান বেশ হাসিমুখে বললেন, বোঝা না। অন্য দেশের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না আমাদের। আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। ইলিশমাছ আমাদের প্রিয় মাছ। অনেকেই খেতে পারেন না। এখন আনন্দ করে খান। দেখছেন তো গঙ্গার বাতাসে কেমন ইলিশ ইলিশ গন্ধ। এই সুযোগে হাজার হাজার মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। আমরা খুশি। আমাদের সরকার খুশি। সরকার আপনাদের সবরকমের সহায়তা করতে প্রস্তুত।

আহা ইলিশ! বাহা ইলিশ!

এই সুযোগে ছোট বড় মাঝারি ব্যবসায়ীরা মাঠে নেমে পড়েছেন। নগদানগদি কিনে নিচ্ছেন বিপুল মাছ। গঙ্গায় জাল

ফেলার দরকার নেই। যে পরিমাণ ইলিশমাছ মানুষের হাতে ধরা দিচ্ছে তা নেহাত কম নয়। গঙ্গার দুই পাড়ের অন্ধকার বিরাট বিরাট হ্যালোজেনের আলোয় ভরে গেছে। যত রাত গভীর হচ্ছে মানুষের ভিড় বাড়ছে। বেড়েই চলেছে।

রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার এসি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। নগদানগদি দামে কিনে নিচ্ছেন সেইসব মাছ কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা। সমস্ত জায়গায় বাজার বন্ধ। সবাই জ্যান্ত ইলিশ মাছ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

প্রশাসন খুব খুশি। আজকের জন্য সরকারের প্রধান সব সরকারি অফিস, ইস্কুল, আদালত ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছে।

৩

আজ ঘরের গন্ধটা যেন অন্যরকম লাগছে পদ্মিনী। একপেট ঘুমিয়ে ঘোতন বিশ্বাস নরম স্বরে বলেন।

হ্যাঁ।

ঘরময় ইলিশ ইলিশ গন্ধ।

এইরকম ইলিশ খাওয়া সেই ছেলেবেলায় খেয়েছি। বলতে বলতে নন্দিনী বিছানায় উঠে বসেন। তারপর বড় বড় চোখ করে বলতে শুরু করেন—বাবা, এইয়া বড় ইলিশ মাছ এনে মার অপেক্ষায় থাকতেন না। সোজা কলতলায় চলে যেতেন। প্যান্টের পকেট থেকে পাঁচ পয়সা বের করে ভটাভট ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়াতেন। তারপর গোটামাছটা ভালোভাবে ধুয়ে মায়ের জিম্মায় দিয়ে দিতেন। মা কতরকম পদ রান্না করতেন। সারা পাড়া জেনে যেত আজ আমাদের বাড়ি ইলিশ মাছ হচ্ছে। সেই মাছের তেল ভাজার সঙ্গে গরম ভাত কী যে উপাদেয় লাগত তা আর বলার নয়! আহা!

সেরকমই মনে হচ্ছে আমার। নন্দিনীর কথা শেষ না হতেই ঘোতন বিশ্বাস বলেন, আমরা যেন টাইম মেশিনে ফিরে গেছি সেই অতীতে। ঠিক কথাই বলেছ, আমার ছেলেবেলারও একই ছবি ছিল। রাতের সিগেরেট খেতে পাড়ার গলি অবধি গেছিলাম। পাড়ার বাতাসে ইলিশ মাছের গন্ধ। তারপর নন্দিনীর গা ঘেষে এসে দাঁড়ান ঘোতন বিশ্বাস। আবারও বলেন—দেখ, দেখ, আমার গা দিয়ে ইলিশ মাছের গন্ধ কেমন ভুরভুরিয়ে বেরুচ্ছে। তোমার গা দিয়েও পদ্মিনী।

হ্যাঁ গো, ঠিক বলেছ।

৪

পাশাপাশি দুই বুড়োবুড়ি শুয়ে আছেন। বুড়োর মনে হয়, তারা যেন আর মানুষ নন, এই মুহূর্তে মাছ হয়ে গেছেন। ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছ। রূপালি শস্য। কিলবিল করছেন ঘরের মধ্যে। ঘরের চার দেয়ালের ভিতর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছেন। সাঁতার কাটতে কাটতে ঘর থেকে বেরুলেন। তারপর যা দেখলেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাদের মতো সবাই বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। গঙ্গার ধারে এসে ঝুপঝুপ করে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন। গঙ্গায় একটুও জল নেই। একটুও।

শুধু রূপালি আলোর চাকচিক্যে চাঁদের জ্যোৎস্নাও ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

সৌ মি ত্র চৌ ধু রী
খুকুকাকীর অন্তর্ধান

ছোটমাসি চোখ নাচিয়ে মা'কে বলে, 'খুকুদি এত খবর কোয়ায় পায় রে দিদি?' মা বলেন, 'জানিনে বাপু। হাওয়ায় অনেক কথা ভেসে আসে। বড় দুঃখী মেয়ে খুকু, বুঝলি!'

খুকুদিকে নিয়ে টুকটাক কথা হয়ই। কিন্তু হঠাৎ কী যে ঘটে গেল! পাড়ার সব বাড়িতেই খুকুদিকে নিয়ে জব্বর চর্চা। চলছে তো চলছেই।

খুকুদি ফর্সা। ধবধবে। পান খাওয়া লাল টকটুকে ঠোঁট। টানা নাক। লম্বা গলা। আর গলার স্বর? মোলায়েম নয়, কর্কশ নয়। কিন্তু জোরাল। খুব ধার। কান ভেদ করে সোজা মগজে ঠকাস করে মারে। হাতুড়ির বাড়ি একদম। আমাকেও মেরেছিল। যেদিন বলল, 'সন্তু, তুই একটা বোকার হদ্দ। তোর কাকার কাছে ইংরেজি পড়ে গোল্লা পাবি, বলে রাখলাম।'

মুখ নামিয়ে শুধু বললাম, 'আচ্ছা'। আর কী বলবো! খুকুকাকীর মুখের উপর কথা বলতে পারি? পাড়ার সব বন্ধু, দাদারাও মুখ খুলতে ভয় পায়। শুনেছি অনেকের নাকি প্যান্ট ভিজে যায়। কিছু বলতে হলে মাথা ঝুঁকিয়ে নরম গলায় সম্বোধন করে, 'খুকুদি'। তারপর খুকুদি মুখ তুললে দাদারা মিনমিন করে দু'একটা কথা বলে। আমরাও তাই করি। তবে 'খুকুদি' বলি না। কয়েক জন শুধু ডাকি, 'খুকুকাকী'। কারণ, আমাদের বন্ধু গাঁট্টাগোট্টা আফজল 'খুকুকাকী' নামেই ডাকে।

আফজলের মা রমিনা মাসি। সেলাইয়ের কাজে এক নম্বর। ফলস পিকো আর জরির কাজে তুখোড়। পাক্কা দরজি ফেল মেরে যায়। খুকুকাকীর ব্লাউজ সায়া বানিয়ে দিত আফজলের মা। হাত ধরে মাকে খুকুকাকীর বাড়ি নিয়ে আসতো আফজল। রমিনা মাসির কোমরে বাত, সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। আফজল মা-কে ঘরে ঢুকিয়ে খুকুকাকীর বাগানে চলে যায়। ছোট্ট বাগান। আগাছা ভর্তি। একটা আম, পেঁপে আর পেয়ারা গাছ আছে। গাছে উঠে কাঁচা হোক পাকা হোক যে ফলই পায়, পেড়ে আনে আফজল। খুকুকাকী দেখেও বকে না। শুধু বলে, 'কয়েকটা রেখে বাকীটা নিয়ে যাও।'

খুকুকাকীর ছেলে বুম্বা, মেয়ে অনুরাধা। দুজনেই পড়াশুনা নিয়ে থাকে। বুম্বার বাবা বাইরে কোথাও কাজ করতেন। শুনতাম, ওষুধ কোম্পানির এজেন্ট। খুব একটা বাড়ি আসতেন না। বড় জোর বছরে একবার। মানিঅর্ডার করে নাকি মোটা টাকা পাঠায়। খুকুকাকীর সংসার চলত ভালোই। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় কোনো অসুবিধা হত না। খুকুকাকীর মুখে অভাবের কথা শোনেনি কেউ।

তবে খবর শুনেছে অনেক রকম। সবার নাকি হাঁড়ির খবর খুকুকাকীর জিভের ডগায়। কথাটা প্রথম বলেছিল সুকুমারদা। পাড়ার টিমের যবরদস্ত গোলকিপার। নিজের মায়ের কাছে কথাটা শুনেছে সুকুমারদা। আমার মা-মাসিও নিশ্চয় অনেক কিছু শুনেছে। কয়েকদিন আগে ছোটমাসি চোখ নাচিয়ে মা-কে বলল, 'খুকুদি এত খবর কোয়ায় পায় রে?' মা বলেন, 'জানিনে বাপু। তবে হাওয়ায় কত কথা ভেসে আসে। বড় দুঃখী মেয়ে খুকু, বুঝলি!'

মায়ের কথার মানে বুঝি না। দেখি, খুব বকবক করে খুকুকাকী। পান চিবোয় আর বাড়ির ছোট বারান্দায় গোল হয়ে পায়চারি করে। হাঁটতে হাঁটতে নাগাড়ে কথা বলে যায়। কথা তো না, খবরের বন্যা। বড়রা বলে গেজেট। বারন্দার নীচে রাস্তায় খুকুকাকীর কথা শুনতে লোক দাঁড়িয়ে যায়।

হাজার বিষয় খুকুকাকীর ঠোঁটে। একটার পর একটা বেরিয়ে আসে। কোন্ দারোগা কত ঘুষ খায়। কোন্ উকিলের কেস জোটে না, কোর্টে গিয়ে শুধু সিগারেট ফোঁকে। কোন্ দিদিমনি স্কুলে না গিয়ে বাড়ি বসে সকাল-বিকাল টিউশনি করে।

সব জানে খুকুকাকী। স্বরূপানন্দ ভাল গুরু না মথুরানন্দ পুরী। কোন্ অসুখের কী ওষুধ। কোন্ ডাক্তার টুকে পাস। কোন্ মাস্টার না পড়িয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সিগারেট ফোঁকে। কোন্ স্যারের কাছে পড়লে লেটার মার্কস অবধারিত।

আমার ছোট কাকা উকিল। সময় পেলে ইংরেজি পড়ান। খুকুকাকীর পছন্দ নয় আমি ওঁর কাছে পড়ি। একদিন বললেন, 'সন্টু, তুই একটা বোকার হদ্দ। সুবোধ স্যারের কাছে ইংরাজি পড়। লেটার পাবি।' কথাটা ভাসতে ভাসতে কাকার কানেও পৌঁছে যায়। কাকা এমনিতেই দু'চোখে দেখতে পারেন না খুকুকাকীকে। সেদিন আমার সামনে রেগে টং। কাকার ফর্সা মুখ

লাল। রেগে গেলে তোতলে যান। বললেন, 'ওই খু-খুকুদি না আস্ত পাগল। খু—উব টাকার গরম! সব জান্তা ভাব, কিস্সু জানে না। শুধু বরফ—টাই। ওই পাগলি মহিলার বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁ—হাঁটবি না।'

কিন্তু আমারা খুকুকাকীর বাড়ির সামনে দিয়েই হাঁটি। বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে স্কুলে যাই। খুকুকাকীর ছেলে বুম্বা আমাদের স্কুলেই পড়ে। ওর ক্লাশ ফাইভ, আমার এইট। বুম্বা আমাদের সামনে দিয়ে রিক্সা চেপে স্কুলে যায়।

হঠাৎ কী ঘটে গেল! পাড়ার সব বাড়িতেই খুকুকাকীকে নিয়ে আলোচনা। পাশের পাড়ায় বীণাপাণি বিদ্যালয়ের কাছে দুই বাড়ি থেকে দু'জন ছেলে হঠাৎ উধাও। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। তিন-চার দিন হয়ে গেল, কোনোও খোঁজ নেই। খবরের কাগজে সন্ধান চাই ছবি বেরিয়েছে। ছেলে হারানো দুই বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে তো চলছেই।

দুই বাড়িতে শহরের সব লোক হামলে পড়ছে। সবাই গেল কিন্তু খুকুকাকী গেলই না। নিজের বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছে, 'দুই বদমাশ! পড়ায় মন নেই। ট্রেনে চেপে পালাতে গেছে। পালাবি কোথায়? ধরা পড়ে যাবি।'

ঠিক তাই হল। সিনেমার হিরো হবে ভেবে বোম্বে পালাতে গেছিল অরুণ আর মুকুলদা। তরপর রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। খবর পেয়ে অনেক কষ্টে নাগপুরে গিয়ে ছাড়িয়ে আনল ওদের বাবারা।

পাড়ায় আনন্দ হল। তবে চর্চা চলল খুকুকাকীকে ঘিরে। কেমন করে জানতে পারল? সব চাইতে উঁচু বাড়ির ছাদে শাড়ি মেলতে মেলতে নিচের দিকে তাকিয়ে রমাবৌদি বলল, 'বুঝলে সোমাদি, সবার খবর কি এমনই পায়? খুকুদির পোষা ভূত আছে। সে-ই খবর জোগায়।'

—ডাইনি বিদ্যা জানে নাকি গো?

—কী জানি, হতেও পারে।

কানে এসেছিল অনেক কথা। তবে সবচাইতে অবাক করা কথা বলল আফজল। শনিবার ছুটির পর নিয়ে গেল গোঁসাই পাড়ার পুকুরপাড়ে। শ্যাওড়া আর বিছুটির জঙ্গল চারদিকে। কয়েকটা বড় গাছ। নোনা আতা, যজ্ঞডুমুর, নিম। জায়গাটা নির্জন। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। রাতের বেলা নাকি সার সার বসে ভূতেরা আড্ডা মারে।

নিম গাছের ভুতুড়ে ছায়ায় দু'জন বসলাম। মাথার উপর দিয়ে কয়েকটা বক উড়ে গেল। পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের করল আফজল। একটা আমার হাতে দিয়ে আরেকটাতে কামড় বসাল। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলাম, 'ভুত নাকি খুকুপিসীকে খবর যোগায়!'

—ধূর ওসব নয়', আফজল শক্ত পেয়ারায় কামড় বসিয়ে চিবোতে লাগল। চোখ বন্ধ। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল, 'খুকুকাকী নিজের চোখে সব দেখে আসে', বুঝলি!'

—কী বলছিস যা তা!

চোখ বড় আফজলের। বলল, 'কথাটা কাউকে বলবি না তো!'

—না, বলবো না।

আফজল একটা ঢোঁক গিলল। চোখ দুটো আরও গোল এবার। থেমে থেমে বলল, 'নিজের চোখে সব দেখে আসে। খুকুদি উড়তে পারে তো!'

—কী যে বলিস! পাগল হয়ে গেলি নাকি?

—না রে, সত্যি কথা! কসম খেয়েছি মায়ের কাছে, তবু তোকে বলে দিলাম। কাউকে জানাবি না কিন্তু।

বলিনি কাউকে। ভুলেই গেছিলাম পড়ার চাপে। নাইনে উঠেছি। সকালে উঠে সাঁ সাঁ সাইকেল চালিয়ে অঙ্ক আর ইংরাজি স্যারের কাছে পড়তে যাই। বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া, তারপর স্কুল। ভোরবেলা উঠেই দেখি সাইকেলের চাকায় হাওয়া গায়েব। কেমন করে যে লিক হলো! হেঁটেই রওনা দিতে হল অঙ্কস্যারের বাড়ি। অনেকটা দূর। মাঠের রাস্তা ধরলাম। গোলপোস্টের পাশ দিয়ে শর্টকাট জংলা পথ। শীত কাল, কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ।

কী একটা দেখলাম! সাদা মতন কিছু একটা নড়ল কয়েক পা দূরে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, জিনিষটা মানুষের মতন!

লম্বা গলা। ছিপছিপে শরীর। সাদা শাড়ি, সাদা সোয়েটার। খুকুকাকী! হনহন করে হাঁটছে। কয়েকবার বকের মত বাতাসে লাফ দিল। তারপরই পাখা মেলল দুপাশে। দু'একবার ঝাপ্টা দিয়ে বকের মত উড়াল দিল খুকুপিসী।

খুকুপিসী পাখি হয়ে গেল! তাহলে আফজলের কথাই ঠিক। উড়ে উড়ে দেখছে। সবার হাঁড়ির খবর নিচ্ছে খুকুপিসী। কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, সব।

বললে তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আফজল বন্ধু, তবু ওর কথা বিশ্বাস করিনি। কাকে বলবো! ভাবছি। বাবাকে বলাই যায় না। সকালে বেরিয়ে রাত্তিরে ফেরেন। মাকে বললে মাসি জানবে। পাঁচ কান করে বেড়াবে। কাকাকে বলবো? কাকা বন্ধুর মত। বিশ্বাস করে আমার কথা। তবে মাঝে মধ্যে মাথা গরম করে ফ্যালে।

সন্ধ্যা বেলা। কাকার ঘরে এক মক্কেল বসে। লুঙ্গির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি। বুঝলাম গ্রামের পয়সায়ালা লোক। আমি চুপ করে ওঁর পাশের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

—কিছু বলবি?' কাকার স্বর বেশ নরম। তার মানে মন ঠাণ্ডা। বলা যেতে পারে এখন, ভাবলাম।

কিছুক্ষণ পর মক্কেল চলে গেলে কাকার চেম্বার খালি। রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। কাকার অবাক চোখ। সোজাসুজি বললেন, 'কী বলবি, বল।'

—ওই কেসটার কী হলো কাকা?

—কোন কেসটা?

—মন্দিরের পেছনের বাড়িতে যে মার্ডার হয়েছিল?

—খুনি ধরা পড়েনি। কোন্‌দিকে যে পালিয়ে গেল! পায়ের ছাপ বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছিল।

—কোথায় পালালো?

—জানলে তো! খুনি ধরা পড়লে, শহরের নম্বর ওয়ান উকিল বনে যেতাম, বুঝলি!

—একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

—কী জিজ্ঞেস করবো?

—কে খুন করেছিল, কেমন দেখতে?

—কাকে জিজ্ঞেস করবো?

—খুকুকাকী কে।' কাকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম।

—দূর, পাগল! ওই খুকুদি? সারাদিন বকবক করে। তবেএকবার আমার ঘরে এসেছিল, জানিস! বলেছিল খুনির চেহারা কেমন, কোন গাঁয়ে বাড়ি? এভিডেন্স তো ছিল না। ফালতু কথা। বিশ্বাস করা যায় নাকি!

—বিশ্বাস করলে ভালোই হত।

—কেন?

—জানো, খুকুকাকী উড়তে পারে। উড়ে উড়ে সব দেখে বেড়ায়।

—পাগলের মত কী যা তা বলছিস?' কাকার কপালে তিনটে ভাঁজ।

—নিজের চোখে দেখলাম!

—কী দেখলি?

—আমার চোখের সামনে। মাঠের পাশ দিয়ে পাখা মেলে টুকুস করে খুকুকাকী উড়ে গেল।

—ধূর, তাই হয় নাকি!

—হয় হয়।

—দেখাতে পারবি?

—পারবো।

দু'দিন পর ভোরবেলা অন্ধকার মাঠে কাকাকে নিয়ে গেছিলাম। সেদিন দেখাতে পারিনি। কাকা বললেন, 'তুই ঘুম চোখে কী দেখতে কি দেখেছিস।'

হবে হয়ত। দিনগুলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। অনুরাধা বড় হতেই বিয়ে হয়ে গেল। ধূমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিলেন খুকুকাকী। আমরা নেমন্তন্ন খেতে গেছিলাম। খুকুকাকীর বরকে দেখতে পাইনি। পাড়ার জটাবুড়ি সোমনাথের ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী গো খুকু, তোমার কত্তা আসেনি?'

হাসতে হাসতে সব কটা দাঁত বের করে উত্তর দিয়েছিলেন খুকুকাকী, 'না গো জ্যাঠাইমা, আসতে পারল না। কোম্পানি তো প্রোমোশন দিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছে ওকে। অনেকদূর, সেই লন্ডন।'

—এ আবার কেমন কথা!' একবার বলে চুপ হয়ে গেলেন জটাঠাকুমা।

অনুরাধা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। বুম্বাও পরের বছর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হল। সরকারী স্কলারশিপে পড়া চলবে ওর।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে খুকুকাকী বলত, 'এবার ঝাড়া হাত-পা। বাড়ি বন্ধ করে যেদিকে চোখ যায়, আমি চলে যাবো।'

খুকুকাকীর বাড়ি আজকাল বন্ধই থাকে। দরজায় দুটো বড় তালা। শূন্য বারান্দা। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে। কেউ জানে না কোথায় গেছেন খুকুকাকী।

আমরা বড় হয়ে গেছি। দর্জির কাজ শিখে আফজল দোকান দিয়েছে। জামা প্যান্ট বানায়। কোট বানাতে পারে না। আমি চাকরির ইন্টার্ভিউ দিয়ে যাচ্ছি। লাগছে না একটাও। আফজল পরামর্শ দেয়, 'বিজনেস কর।'

আফজলের গালে চাপ দাড়ি। কিন্তু ছোটবেলার মত গোল গোল চোখ করে বলল, 'খুকুকাকী সকালে হাঁটতে গেছিল।'

—তারপর কী হল?

—পাখি হয়ে কোথায় যে উড়ে গেল!

আমার উকিল কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খুকুকাকীর খবর কিছু জানো?

আইনের একটা মোটা বই থেকে মুখ তুলে কাকা বললেন, 'জানি না। খুকুদির জামাই তো থানায় গিয়ে একটা মিসিং ডায়েরি করেছে।'

অনেকেই জানে সে কথা। পাড়ার সব বাড়িতে খুকুকাকীকে নিয়ে কথা হয়। অনেকে মজা করে, হাসে। মা বলেন, 'ওরকম হাসতে নেই। একা একা জীবন কাটাল মেয়েটা। মুখ ফুটে কোনও দিন নিজের কথা বলল না। শুধু অন্যের কথা। বড় দুঃখী মেয়ে ছিল রে খুকুটা!'

কত বছর হয়ে গেল। খুকুকাকীকে নিয়ে আলোচনা চলছেই। শুনলাম খুকুকাকীর বাগানে আমগাছটায় কয়েকটা সাদা পাখি বাসা বেঁধেছে।

চন্দন চক্রবর্তী
টিকটিকির টোপ!

বড় সাহেব হাতটা টেবিলে পেতে দিয়ে বললেন, 'হাতটা দেখে দাও দিকিনি'।

বিশাল ঘরে সোঁ সোঁ করে ঠান্ডা মেশিন চলছে। দামি রঙে পেন্ট করা চারটে দেওয়াল। জানলায় শর্ট পড়দার সঙ্গে লঙ পড়দা ঝুলছে। বিশাল টেবিলে একটা ল্যাপটপ। সামনে দুটো মোবাইল ফোন। বেশ বড়সড়। ডান দিকে কর্নারের দেওয়ালে লক্ষ্মী গণেশের ছবি। ঠিক পেছনে ওঁর বাবাই ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রঞ্জনের দিকে। দেওয়ালে লেপটে থাকা টিকটিকির মত। টিকটিকির মতো সাদাটে রঙ। বেশ চালাক চতুর মানুষ। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কে পি রায় অ্যান্ড সন্স এর মালিক ছিলেন। আসাম, মেঘালয় সাইডে বেতের ব্যবসা। কলকাতায় হেড অফিস। চেহারাটাও ছিল বেতের মতো হিলহিলে। বেশ কিছুদিন হয়েছে গত হয়েছেন। কিন্তু এখনও যেন বেতমার্কা চেহারা নিয়ে শাসাচ্ছেন। 'আমার সিধেসাধা ছেলেকে বুরবাক বানাবি না, রঞ্জন'।

টিকটিকি মার্কা চোখ দেখে রঞ্জনের হঠাৎই টিকটিকির কথা মনে হলো। দুম করে বলে বসলো।

'স্যার একটা টিকটিকি পুষতে হবে'।

এমনিতেই বড় সাহেবের চেহারাটা সত্যিই ভালোমানুষের মতো। কিন্তু চোখ-মুখে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ রয়েছে। বয়েস কত আর হবে বছর চল্লিশ। টাইয়ের নটটা নাড়ানাড়ি করে বললেন, 'টিকটিকি পুষতে হবে মানে'? টিকটিকি ভাগ্য বলে দেবে'।

'স্যার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে অনেক যুক্তি আছে'। বড়সাহেব ঘাড়টা দুলিয়ে বেল পুশ করলেন। বাইরের টুলে বসে থাকা বেয়ারা মদন সরকারকে ডাকলেন।

'দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি তো সাংঘাতিক কথা বলে ফেললে। কড়া করে কফি না খেলে চলবে না'।

মদন মুখটা বাড়িয়ে বলল, 'আসবো স্যার'।

'এসো আর দু' মগ কফি নিয়ে এসো'। কী রঞ্জন তোমার চলবে তো?

খুব চলবে স্যার। একটু বেশি করে দুধ হলে ভালো হয়। ফ্যানা ওঠা কফি কোনোদিন খাইনি। বাড়িতে গিন্নি পাউডার দুধ দিয়ে বানিয়ে দেয়। তবে একেবারেই স্বাদ হয় না। কিপটের মতো দুধ দেয়। বললেই বলে, 'আরও একমাস চালাতে হবে'। ছেলেটার ইশকুলের পিছনে কত খচ্চা হয় জানো'?

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। বড়সাহেব থামিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে'।

মদন ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

যথারীতি বাইরে লাল আলো জ্বলছে। মানে ডোন্ট ডিসটার্ব নাউ'। এমনিতেই সবে পুজোর ছুটি গেছে। স্টাফ কম কাজও কম। সেই সুযোগটি বড় সাহেব নিলেন।

'এবারে বলে ফেলো তোমার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কথা। তুমি যে টিফিনের সময় বা অন্য সময়ে স্টাফেদের হাত দ্যাখো তা আমি জানি। এবং নাকি ভালোই দ্যাখো। তোমার ড্রয়ারে আতশ কাচ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইও আছে'।

রঞ্জনের মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল 'স্যার, আপনার টিকটিকি বলেছে তো'?

একটু অসন্তুষ্ট হলেন বটে। কিন্তু কৌতূহল কম হলো না।

'লোকটা বলে কী'?

'কার কথা বলছো তুমি'।

'স্যার কিছু মনে করবেন না, শুধু আমি না অফিসের সবাই ওই লিফটম্যান কাম দারোয়ানকে টিকটিকিই বলে। কারণ ওই নাকি স্যার আপনাকে সব খবরা খবর দেয়। কে কোথায় যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে, কী করছে — সব খবর'।

'হুম! ঠিক ধরেছ সে তো আর আজকে নয়। বাবার আমল থেকে এমনকি আমার খবরাখবর ব্যাটা বাবার কানে ঢুকিয়ে

দিতো। রাম যাদব বিহারের বাসিন্দা। অনেক কম বয়স থেকে এই অফিসে কাজ করে। খুব বিশ্বাসী। ওর পরিবার বিহারে থাকে। ও এখানেই থাকে। বহু পুরানো বিল্ডিং। ভেতরটা সাজানো বটে। অফিসের গেটের চাবিও ওর কাছে গচ্ছিত আছে।

দু'মগ কফি চলে এলো। আজ রঞ্জনের ভেতরে ভেতরে থিরথিরে উত্তেজনা। কেমন যেন হচ্ছে বড় সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে কফি খাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়!

(২)

এখন এই মুহূর্তে টিকটিকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কী করে? কিন্তু ভাবনাটা একেবারে অমূলক নয়। গতকাল সকালেই চা খেতে খেতে গিন্নি মলির সঙ্গে কথা হয়েছিল। রোজের মতো সাড়ে ছ'টায় ঘুম ভেঙে যায় দুজনের। মলি আগে দু'কাপ চা বানিয়ে এনে বসে। কড়কড়ে নেড়ে বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে মলি বলেছিল 'হ্যাঁগো, অফিসে যে হাতটাত দ্যাখো, নাকি তোমার খুব সুখ্যাতি তা ওরা পয়সা কড়ি কিছু দেয় না। মাইনের ওই ক'টা টাকা নিয়ে সংসার চলে'?

মুখ ভেটকে রঞ্জন একই কথা বলেছিল 'ভাবছি টিকটিকি পোষার কথা বলবো'।

'কেন টিকটিকি টিক টিক করে আগাম জানান দেয় বলে'।

'আরিব্বাস তোমার কী বুদ্ধি গো! কী করে বুঝলে'?

'রোজ টিকটিকি নিয়ে ঘর করছি। সব্বদা টিকটিক করছে, আর আমি জানবো না'।

'আমাকে টিকটিকি বললে! তাই যদি বলো, টিকটিকি কিন্তু বুদ্ধিমান জাত। পুলিশের লোকেরা যাদের মাধ্যমে স্পাইগিরি করে তাদের 'টিকটিকি' বলে কেন জানো'? তারা অত্যন্ত চালাক, তথা উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এবং সাহসীও। কত গোপন খবর আগাম বলে দেয়। সেই হিসাবে আমাকে বলতেই পারো'।

'ধুরতেরি তোমাকে কে বলছে'? দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখেছো'?

রঞ্জনের বাড়িটা একতলা। বহু পুরানো। বাবার আমলের। মা ছোট বয়েসেই মারা গেছে। বাবা একটা সামান্য কাজ করতো। বহু কষ্টে এই খালপাড়ে বাড়ি বানিয়েছে। ভেতরের প্লাস্টার ফুলে ফুলে গেছে। ঘরের বাইরে একটা কাঁচা ড্রেন গেছে। একটা পেকো গন্ধ। এই যার ঘরের অবস্থা তার ঘরের দেওয়ালে তো টিকটিকি পোকামাকড় দুটোই থাকবে। টিকটিকি আসে খাদ্যের সন্ধানে। আর পোকামাকড় খাদক হতে।

যাইহোক, রঞ্জন দেখলো, দুটো সাদাটে টিকটিকি ঠিক টিউবের নিচে ঠায় চিপকে আছে। কয়েকটা পোকাকে টার্গেট করছে।

মলি ফিক করে হেসে ফেলতে রঞ্জনের সম্বিত ফিরলো। ওর হাসির কারণটি বোঝার চেষ্টা করছিলো রঞ্জন। ঠিক তখনই মলি বলেছিল, 'চায়ে কি চিনি কম হলো, নাকি মুখটা অমন তিতকুটে করে রইলে কেন'?

—না মানে ভাবছিলাম'।

'তুমি কী ভাবছিলে জানি না। তবে এবার আমার ভাবনাটা শোনো। সত্যিই পুলিশের খোচড়কে টিকটিকি কেন বলে এখন বুঝতে পারছি। ব্যাটারা হাওয়া মোরগের মতো আগাম খবর পেয়ে যায়'।

ওরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্যোতিষি। প্রত্যেকটা থানায় দেওয়ালে যদি টিকটিকি পুষে রাখে তাহলে সব কাজ করার আগে ভাববে আর টিকটিকি টিক টিক করবে। বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু এর নিত্যদিন সুফল পাই।

—রঞ্জন, হাঁ। বলে,

'তুমি! কী রকম সুফল'?

—'বলে লাভ নেই, তুমি বিশ্বাস করবে না'।

—'বলেই দ্যাখো না'?

—'রোজ ভালোমন্দ কাজের আগে আমি মনে মনে জিজ্ঞেস করি। যখনই টিকটিক উত্তর আসে তখন বুঝি হয়ে যাবে। উত্তর না করলে বুঝি হবে না। যেমন ধরো আকাশ গড়বড় করলেই ভাবি আজ কি তবে কাচাকাচির কাজে লাগবো না'? অমনি টিকটিক আওয়াজ। অর্থাৎ হুম! ঠিক ধরেছি। সেদিন দেখা গেল সত্যিই দুপুরে বৃষ্টি নামলো। কত সময় হয়েছে তোমার

পকেট থেকে সামান্য দু'দশ টাকা সরিয়ে নেবো? ও বাবা টিকটিকি শব্দ করে না। আবার কখন করে। আমি বুঝে যাই টিকটিক করলে সরিয়ে নিই। আমাকে তো সংসারের জন্য একটা টাকা জমিয়ে রাখতে হয়!'

—রঞ্জন, হেসে ওঠে।

—'কী হলো? হাসলে কেন? জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না'।

—দ্যাখো, যখনই দেখলাম যে আজকাল হাতের রেখা ওয়েদার রিপোর্টের মতো বিট্রে করছে, তখন থেকেই টিকটিকির ব্যাপারটা আমারও নজরে আসে'।

—'হাতের রেখা বেইমানি করে কখনও'।

—করেছে রে বাবা! আফিসের অ্যাকাউন্টসের মিত্রবাবুর ছেলের হাত দেখে বলেছিলাম, বিয়ে সুখের হবে। রাজজোটক মিল। এখন আজকাল ছেলেমেয়েরা যে হাতের রেখাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে কী করে বুঝবো'?

—'কেন? বিয়ে হয়নি'?

—'হয়নি না। হয়েছিলো কিন্তু টেকেনি। ছ'মাসেই ছুটি! ব্যস তারপর থেকে মিত্রবাবু আমার মুখ দর্শন করে না। এবং অফিসের অনেকেই সেই পথে হাঁটছে। তারপর থেকেই টিকটিকির ভাবনা এবং প্রয়োগ। মানে, টেস্ট করার জন্য প্রয়োগ করবো ভেবেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে টিকটিকিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষি!'

'মলি গদগদ হয়ে বলে, 'তাহলে আমার কথা সত্যিই প্রমাণিত হলো'।

—'আলবাত তাই, আসলে তোমাকে সন্দেহ করার মতো সাংসারিক বুদ্ধি আমার নেই'।

—'সন্দেহ আমাকে'?

—'বাহ রে, পকেটে যতবার টাকা কম পেয়েছি মনে মনে জিজ্ঞেস করেছি, আমার কি গোনা ভুল? ও বাবা দেওয়ালের টিকটিকি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতো। উত্তর করতো না। অর্থাৎ আমি ভুল করিনি। এখন দেখছি টিকটিকি ঠিকই বলে। অতএব —

(৩)

অতএব টিকটিকি পুষতে হবে স্যার।

রঞ্জন আবার টুক করে কথাটা বুদবুদের মত ছেড়ে দিয়ে পেছনের দেওয়ালের বুড়ো সাহেবের ছবির দিকে তাকালো। সেই টিকটিকি — চাউনিতে উনি পালটা রঞ্জনকে দেখতে থাকেন।

—'বল কি হে? টিকটিকি পাখি নাকি যে রথের মেলা থেকে টুক করে কিনে এনে পোষ মানাবো? তার চেয়ে এক কাজ করো তুমি, তোমার বাড়ি থেকে একটা সাপ্লাই করো'।

—'তা কী করে হবে স্যার। শুনলেন তো দুটো টিকটিকি গিন্নির একেবারে পোষা। ও কি ছাড়বে? তাছাড়া লেজখসা টিকটিকি কোন কাজে আসবে না'।

—'লেজখসা মানে'?

—'টিকটিকি খোঁচা খেলেই ওর লেজ খসে পড়ে। এবারে বলুন স্যার বিকলাঙ্গ টিকটিকি কাজে লাগবে'?

হঠাৎ রঞ্জন-এর মনে হলো ছবির বুড়ো কত্তার চোখ দুটো ক্ষেপে গিয়ে কটকট করে উঠলো। মানে আমার ছেলেকে বোকা বানাচ্ছিস?

—'স্যার এটাও ঠিক এত সুন্দর পরিষ্কার ঝকঝকে দেওয়ালে আসল টিকটিকি এমনি এমনি আসবে না'।

—'আরে রঞ্জন আসবেই বা কোথা থেকে'?

—'না আসার কারণ নেই। বড়বাজার এলাকায় বাবুদের ঘর খুব সাজানো গোছানো থাকে, কিন্তু বিল্ডিং এতো পুরানো যে বাইরের ইঁট বার করা দেওয়ালে বট অশ্বথের বাসা বেঁধেছে ঠিক নিচেই নর্দমা। যত রাজ্যের আবর্জনা জমা হয়। এখন বাইরের দেওয়ালের টিকটিকি তো জানে না যে ভেতর দেওয়াল পরিষ্কার। তাই তারা ঘরের ভেতরে ঢুকতে চায় না। অতএব 'টোপ' দিয়ে ভেতরে আনতে হবে'।

—'টিকটিকিকে টোপ! আরে একি চারে মাছ আনার মতো কেস নাকি'?

—'কিছু মনে করবেন না স্যার সবইতো এখন টোপের ওপর চলছে। রাজনীতি বলুন বাজারনীতিই বলুন। শুধু খুড়োর কলের মতো সামনে 'টোপ' ঝুলিয়ে দাও। ব্যস গড়গড়িয়ে চলবে।

—'তা টিকটিকিকে কী 'টোপ' দেবে'?

—'স্যার মদনকে দিয়ে একটা কৃত্রিম টিকটিকি কিনে আনিয়ে দেওয়ালে চিপকে দিন। তারপর এসি বন্ধ করে জানলা খুলে দেবেন। বাইরের জগৎ দেখুন। দেখবেন ঠিক নকলকে দেখে একদিন আসল টিকটিকি চলে আসবে'।

—'কিন্তু সে তো সময় লাগবে! আমার যে খুব আরজেন্ট ছিল। টিকটিকি যদি টিকটিক করতো তাহলে না কথা ছিল। এবারে গলার স্বরটা নামিয়ে বললেন,

'কাউকে বলো না আমার স্ত্রীকে নিয়ে পোষাচ্ছে না। ভাবছি ডিভোর্স দেব'।

সঙ্গে সঙ্গে ছবির বুড়ো কত্তা যেন কেঁপে উঠলেন। অর্থাৎ উনি চাইছেন না। নিজে পছন্দ করে ছেলের বৌ এনেছিলেন। সেই বৌমা বাতিল! হতেই পারে না।

অনেক ভেবে রঞ্জন বললেন, 'ঠিক আছে স্যার আমিই না হয় টিকটিকি কিনে আনবো। দায়িত্ব নিলাম।

রঞ্জন ছবির বুড়োবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো 'ঠিক আছে! চিন্তা নেই বুড়োসাহেব। আমি তো আছি'।

(৪)

বাইরে আজ অনেক জ্যোৎস্না আলো। লম্বা রড দেওয়া দু'পাল্লার জানলা বেয়ে থই থই আলো বিছানায় খেলা করছে। ছেলেটাকে একপাশে দিয়ে রঞ্জন-মলি পাশাপাশি শুয়েছে। মলির শরীর থেকে ভেসে আসছে এক ভালোবাসার গন্ধ। গলায় সোনার চেনটা কেমন জ্যোৎস্নাতে ঝিকিয়ে উঠলো। ওটা বিয়েতে বুড়োকত্তা দিয়ে বলেছিলেন, 'অন্য কাউকে বলিস না'।

মলি বলল, 'এখন উপায়'?

'ভেবো না, ও টিকটিকি বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবে না। .... হা হা। এখন কাছে এসো'।

সু কু মা র রু জ
সরস্বতীর বীণা, হরিণের শিং

পমফ্রেট, সার্ডিন, চিংড়িগুলো বাজারের চাতালটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সব কড়া করে ভাজা। রাস্তায় ভাজা মাছগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু কোন কুকুর-বিড়ালের দেখা নেই। সেগুলোর আশেপাশে দু-একটা হাতের কব্জি, চুলওয়ালা মাথার খুলি, কিংবা নকল অ্যাডিডাস জুতো। তার পাশেই কাত হয়ে পড়ে আছে কফি-মেশিন। এখনও সেটা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

কিছুটা দূরে ইতস্তত ছড়িয়ে সাদা ধবধবে শঙ্খ। তার উপর টপ টপ করে রক্ত পড়ছে একটা মুণ্ডহীন ধড় থেকে। রকমারি গিফট-আইটেমের দোকানের মাথাটা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। তার সামনে ইমিটেশন গয়না-পরা একজন সুন্দরী মহিলা শুয়ে। দেখে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার কোমর থেকে নীচের দিকটা বেমালুম উধাও। তার ধবধবে ফর্সা বুক উদলা, কিন্তু তা দেখার জন্য কোন লোলুপ জীবন্ত পুরুষ দৃষ্টি নেই।

এলাকার সমস্ত মানুষ ফাঁকা হতে সময় লেগেছে বড়জোর দশ মিনিট। আর মিলিটারি পুলিশে ছয়লাপ হতে সময় গেছে আরো দশমিনিট। বাতাসে বারুদের তীব্র গন্ধ আর আহতদের নিদারুণ হাহাকার। সমুদ্রের বিচে ও বিচ-সংলগ্ন বাজারে থিকথিক করা মানুষগুলোর বুঝতে সময় লেগেছে মাত্র কয়েক মিনিট। ততক্ষণে ধোঁয়া ও আর্তনাদে ছেয়ে ফেলেছে পুরো এলাকা।

কিছুটা দূরে সমুদ্র থেকে জঙ্গলের দিকে যাওয়া পথের উপর থেকে এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। মিনিট দশেক আগে হয়েছিল তীব্র আওয়াজ, আর দেখা গিয়েছিল আগুনের হলকা। বাজার থেকে মানুষজন প্রাণপণ ছুটছে যেদিক সেদিক। ছুটতে গিয়ে যে পড়ে গিয়েছে, তার আর ওঠার সুযোগ নেই। ততক্ষণে তাকে মাড়িয়ে চলে গেছে অসংখ্য ছুটন্ত পা।

ছুটন্ত মানুষগুলোর চোখে-মুখে অজানা ভয় ভয়ংকর ভাবে আক্রমণ করেছে। এরকম অভিজ্ঞতা তাদের আগে কখনো হয়নি। ভয়টা প্রথমে ঢুকেছে কান দিয়ে। এত তীব্র আওয়াজ তারা কোনদিনই শোনেনি। ভরা কোটালে সমুদ্রের গর্জনের চেয়েও গম্ভীর, বজ্রমেঘ ডাকার চেয়েও তীব্র, আর হায়েনার হাসির চেয়েও ভয়ঙ্কর!

বাজারটাকে পিছনে রেখে সমস্ত মানুষ ছুটছে। কিন্তু পুষ্পা ছুটছে উল্টোদিকে। ওর চোখেও ভয়। কিন্তু ওই ছুটতে থাকা মানুষগুলোর ভয় আর ওর ভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। ও মরিয়া হয়ে ছুটছে সমুদ্রের ধারের ওই বাজারের দিকে। ওর বুকের পাঁজর, নয়নের মণি বাবুল যে বাজারে! তাকে বুকে পাওয়ার জন্য ছুটছে।

সে যে ঘন্টাখানেক আগে বাজারের পথে রওনা হয়েছে। বছর-বারোর বাবুল। তার কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলেতে হরিণ, ময়ূর, সরস্বতী ঠাকুর। সমুদ্রের ঝিনুক, ছোট শাঁখ, কড়ি, শাঁখের টুকরো এসব দিয়ে তৈরি জিনিসগুলো। এতক্ষণে বোধহয় বিচে যাওয়ার রাস্তার ধারে পলিথিন সিট পেতে সাজিয়েছিল ওই হরিণ, ময়ূর, সরস্বতী ঠাকুর।

কেন যে আজ ওকে আগে পাঠালো! রোজ তো হাতের কাজ সেরে, দুপুরে রান্না করে, খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেয়। তারপর মা-ব্যাটায় বাজারের দিকে রওনা হয়। দুজনের কাঁধেই থাকে মালভর্তি থলে। সেই ভোরবেলা থেকে শুরু করেছে হাতের কাজ। সামুদ্রিক প্রাণীর খোলাগুলো আঠা কিংবা গালা দিয়ে জুড়ে জুড়ে, ট্যুরিস্টদের পছন্দ হওয়ার মতো সামগ্রী গড়ে তুলতে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। রান্না-খাওয়ার পরে সেগুলোতে রং চড়িয়েছে। আরও কিছু মাল রঙ করা বাকি ছিল। এদিকে ঘরে আর রঙ কেনার টাকাও নেই। তাই আগেভাগে বাবুলকে কিছু মাল দিয়ে পাঠিয়েছিল, যদি দু'দশ টাকার বিক্রি-বাটা করতে পারে ছেলেটা! ও না হয় হাতের কাজটা সেরে, সমস্ত মাল নিয়ে বেলাবেলি বাজারে পৌঁছবে।

কিন্তু কী যে সব হয়ে গেল! পাশের বাড়ির চন্দা ছুটতে ছুটতে এসে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, বাজারে নাকি বোমা পড়েছে। ও মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। কথাটা শোনার পর পুষ্পা সেই যে বাজারের দিকে ছোটা শুরু করেছে, এখনও থামেনি।

দুই

পুলিশের এস. পি রঙ্গরাজনের মোবাইলফোনে বাঘের গর্জন। ওঁর খুব পছন্দের রিংটোন এটা। ও-প্রান্তে ডি. আই. জি পট্টনায়েক। পট্টনায়েকের কথাটা শোনার পর রঙ্গরাজন বাস্তবিকই হাত দুয়েক লাফিয়ে ওঠেন। যেন ওর পায়ের কাছেই বিস্ফোরণটা হয়েছে!

তার মিনিট দশেকের মধ্যেই এস. পি-অফিস থেকে আটখানা সাঁজোয়া গাড়ি বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য বিচ সংলগ্ন মার্কেট। লোকাল থানা থেকে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা পুলিশ ভ্যান, এমারজেন্সি অ্যাম্বুল্যান্স বেরিয়ে গেছে। বোম ডিটেকশন স্কোয়াডকে জিপে তুলে থানার ও.সি. স্পটে পৌঁছে গেছেন। ডি. আই. জি পট্টনায়েক তিন কম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্সকে স্পটে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও নিজের গাড়িতে বেরিয়ে পড়েন স্পেশ্যাল স্কোয়াড নিয়ে।

আবার রঙ্গরাজনের মোবাইলফোন গর্জন করে ওঠে। ডি. আই. জির ফোন। খুব সংক্ষেপে কিছু নির্দেশ দিলেন বোধহয়! রঙ্গরাজন শুধু তিনবার 'ইয়েস স্যার' বলেন। ওর মনে পড়ে যায়, ঠিক দু'ঘন্টা আগে ডি. আই. জি পট্টনায়েকের ফোনের উত্তরে তিনবার 'নো স্যার' বলেছিলেন।

ডি. আই. জি বলেছিলেন, "ব্যবস্থা সব নিশ্চয়ই ঠিকঠাক আছে! আরও কি সেন্ট্রাল ফোর্স-এর ব্যবস্থা করতে হবে?"

উনি বলেছিলেন, 'নো স্যার!'

পট্টনায়েক বলেছিলেন, "ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর রিপোর্ট লিক করেনি তো?"

নো স্যার!

এবারে কিন্তু রঘুনাথনকে ধরতেই হবে। পরে যেন কোনো অজুহাত শুনতে না হয়!

নো স্যার!

এস পি রঙ্গরাজন ভাবেন, সব 'নো' এখন 'ইয়েস' হয়ে গেল। উনি ভালো করেই জানেন, রঘুনাথন লোকটা খুবই বিপদ জনক ও ভয়ানক। কয়েকটা রাজ্য জুড়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের একজন উঁচু স্তরের নেতা। অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে আছে। বেশ কয়েকটা ব্যাংক-ডাকাতি, রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে দিয়ে রেল দুর্ঘটনা ঘটানো, এসব ওর কাছে যেন মজার খেলা!

বছর চারেক আগে নাকি সে একবার ধরা পড়েছিল। কিন্তু অসাধারণ কৌশলে ও বুদ্ধিবলে, কিংবা পুলিশের মধ্যেই কারও বিশ্বাসঘাতকতায় ও পুলিশি হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। তারপর আর ধরা পড়েনি। পুলিশ ও ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে সবসময় নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। একবার কঠিন পরিস্থিতিতে সে নাকি বি. এস. এফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে, সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে চলে যায়। এদিকে পুলিশি তৎপরতায় এই সন্ত্রাসবাদীদের অনেকে ধরা পড়ে।

অন্য দেশে গিয়ে রঘুনাথন বসে থাকেনি। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বলছে, সে নাকি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিয়েছে এবং অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, প্রচুর বিস্ফোরক ও দলবল নিয়ে আবার সে এই জঙ্গলে ডেরা বানিয়েছে। এবার তাকে ধরা খুবই দরকার। তা না হলে রাজ্য পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর আর সম্মান থাকছে না। তাই ভালো করে আটঘাট বেঁধে নামা হয়েছে। ডি. আই. জি-র স্পেশ্যাল রিকোয়েস্ট-এ দশ কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীও আনা হয়েছে। পুরো জঙ্গল ঘিরে ফেলা হয়েছে মিলিটারি-পুলিশ দিয়ে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শোনা যাচ্ছে, জঙ্গলের রাস্তায় মাইন পেতে রেখে ওরা দু'খানা মিলিটারি কনভয় উড়িয়ে দিয়েছে। আর সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছনোর জন্য বিচ সংলগ্ন বাজারে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

রঙ্গরাজনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভেবেছিলেন, রঘুনাথনকে জ্যান্ত ধরতে পারলেই নেক্সট প্রমোশনটা পেয়ে যাবেন। এখন ভাবছেন, কম্পালসারি লিভ কিংবা পানিশমেন্ট ট্রান্সফার ঠেকানো যাবে না।

আর যদি কোনভাবে রঘুনাথনকে ধরা যায় তো...! প্রয়োজনে পুরো জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি চালানো হবে। অঞ্চলের প্রতিটা মানুষের ঘরে ঘরে ছানবিন করা হবে। যে সমস্ত গ্রামবাসী ওদেরকে মদত দিচ্ছে কিংবা ওদের হাল-হকিকত লুকোচ্ছে, যেন তেন প্রকারেণ তাদের পেট থেকে কথা বের করতে হবে। এই ভেবে রঙ্গরাজন জিপটাকে আরও জোরে চালাতে বলেন।

তিন

পুষ্পা মরিয়া হয়ে ছুটছে বিচ-মার্কেটের দিকে। ওর বুকের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও কত ভাবনার ওঠানামা। ওর ঘরের মানুষটা থাকলে আজ কি এই দশা হতো! সে মানুষটা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেল তো গেলই, আজও ফিরল না। ওদের ট্রলার ফিরল, সঙ্গী-সাথীরাও ফিরল। কিন্তু সে নেই। তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। সঙ্গী-সাথীরা বলেছিলো, সে নাকি মাঝ সমুদ্রে অন্য ট্রলারে উঠেছিল। তারপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সে প্রায় দশবছর আগের কথা। বাবুল তখন বছর দুয়েকের।

সেই থেকে পুষ্পার জীবন সংগ্রাম শুরু। ছেলেটাকে মানুষ করতেই হবে। কিন্তু সে যে এখন কোথায় কী অবস্থায়, কে জানে! পুষ্পা বাজারের দিকে প্রাণপণে ছুটছে। বাকিরা উল্টোদিকে। ওকে অনেকে আটকানোর চেষ্টা করছে আরে এই মেয়ে! ওদিকে না, এদিকে পালাও!

একজন বয়স্কা মহিলা তো ওকে জাপ্টে ধরে ফেলল হ্যাঁ রে পোড়ামুখী, মরবি নাকি! ওদিকে বোমা পড়েছে। তার ওপর মিলিটারি পুলিশ যাকে পাচ্ছে, তাকেই পেটাচ্ছে।

বাজারে যে আমার ছেলে...!

তোর ছেলে কি বাজারে বসে আছে! সেও পালিয়েছে কোনদিকে। পরে ফিরে আসবে। তুই যাস না ওদিকে। মরবি।

পুষ্পার কান্না থামে না। ও বেপরোয়া। মহিলাটি বিরক্ত হয়ে ওকে ছেড়ে দেয় তবে যা! নিজেও মর গিয়ে!

পুষ্পা যখন মার্কেটে পৌঁছয়, তখন পুলিশের সাঁজোয়া গাড়িতে তোলা হচ্ছে মুন্ডু-বিচ্ছিন্ন ধড়, হাত-পা-মাথা আর মৃতদেহগুলো। আর আহতদের তোলা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। আলুথালু পুষ্পা সেই লন্ডভন্ড মার্কেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেহগুলোর মধ্যে হন্যে হয়ে তার বাবুলকে খুঁজতে থাকে। পুলিশ ধমক লাগায় এই মাগী! চল, হঠ! হাসপাতাল কিংবা মর্গে খোঁজ করবি দু'দিন পরে। এখান থেকে ভাগ, নইলে...!

চার

পট্টনায়েকের গলায় যেন বাঘের গর্জন আপনি ও আপনার পুলিশবাহিনী কি পেছন মারাচ্ছিলেন? ওয়ার্থলেস! আমি আপনার উপর ভরসা করেছিলাম, ভুল করেছি। সি. এম ফোন করেছিল। সাংবাদিকরা কাল পেপারে যা লিখবে, তার জন্য প্রস্তুত থাকুন! আমাকে তো রেজিগনেশন দিতেই হবে, নয় তো জঙ্গলে ট্রান্সফার। আর আপনার যা হবে, তার জন্য প্রস্তুত থাকুন!

এস পি রঙ্গরাজন হাত কচলায় স্যার! আমি মানে...!

শুনুন, এখনো সময় আছে, জঙ্গলটাকে ছেঁকে ফেলুন। আমি ড্যাম সিওর! ওখানেই রঘুনাথন আছে। যান! যত্তসব গাম্বাট, ইনকম্পিটেন্স!

রঙ্গরাজন থানার ও. সি-র উপর বাজার সাফ করে ফেলার দায়িত্ব দিয়ে, পুরো ফোর্স নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোন। বন্দুকধারী পুলিশেরা চলে যেতে পুষ্পা একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে ডাঁই হয়ে থাকা দেহগুলোর মধ্যে বাবুলকে খুঁজতে থাকে।

একজন লাঠিধারী পুলিশ বলে ওঠে এই মাগী! তুই এখনো যাসনি! এবার মিলিটারি আসছে। তোকে একা পেলে ছিঁড়ে খাবে। ওরা আমাদের মতো স্থানীয় পুলিশ নয়, তোর কথা কিচ্ছু বুঝবে না। এখান থেকে পালা শিগগির!

একজন ছোকরা পুলিশ লাঠি দিয়ে ওর পাছায় এক-ঘা বাড়িও মারে। পুষ্পার ইচ্ছা না থাকলেও এবার ওখান থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয়। ও বাড়ির পথে একটু করে এগোয় আর কান্নাভেজা চোখে পিছনে তাকায়। এমন সময় একদল লোক হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসে। বিস্ফোরণের পরে পালানোর সময় ওই লোকগুলো পুলিশের গাড়ির সামনে পড়েছিল। আসল লোককে না পেয়ে পুলিশ যদি ওদেরকে ধরে, এই ভয়ে ওরা তড়িঘড়ি ঝাউবনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মিলিটারি গাড়ি আসতে দেখে আবার পড়িমরি করে ছুট মেরেছে।

ওরা রাস্তায় পুষ্পাকে দেখতে পেয়ে বলে এই! ছুটে পালিয়ে যা শিগগির! পেট হয়েছে নাকি! ছুটতে পারছিস না?

অগত্যা পুষ্পাও ওদের পেছনে পেছনে ছুট লাগায়। ছুটতে ছুটতে প্রায় নিজের গ্রামের কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে বুড়ো

বটতলায় ছেলে-বুড়োর জটলা। ও পৌঁছতেই তারা হামলে পড়ে কী রে পুষ্পা! তোর কিছু হয়নি তো?

না, কিন্তু আমার বাবুল... ব'লেই হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে পুষ্পা।

বাবুলের কী হয়েছে? বেঁচে আছে তো?

খুঁজে পাচ্ছি না।

ও! তাহলে পেয়ে যাবি, কাঁদিস না! হয়তো কারোর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ঠিক ফিরে আসবে। চেনা কেউ সঙ্গে ছিল? একা ছেড়েছিলিস কেন? আশপাশে খুঁজেছিস?

পুষ্পা কাঁদবে, না কথার উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তাই ওর কান্না আর কথা মিলেমিশে কিছুই বোঝা যায় না।

একসময় লোকগুলোর সান্ত্বনা দেওয়ার রসদ ফুরিয়ে আসে। পুষ্পারও বোধহয় চোখের জল ফুরিয়ে আসে। একটু পরেই সন্ধে নামে। গাছতলা থেকে একে একে সবাই ঘরে ফেরে। যাবার আগে সবচেয়ে বয়স্ক মুরুব্বি মানুষটা বলে এই মা! ঘর যা! তোর ছেলে ঠিক ফিরে আসবে।

পুষ্পা উঠে দাঁড়ায়। ওর পা যেন বাড়ির পথে চলতে চাইছে না। তবুও পা টেনে টেনে ও বাড়িমুখো হয়। চলতে চলতে ওর মনে আসে কত কথা! ছেলেটাকে কারণে-অকারণে কতদিন মেরেছে! সেদিন রঙ করতে গিয়ে একটা হরিণের শিং খসিয়ে ফেলেছিল। এমনিতেই দেরি হয়ে যাওয়ায় পুষ্পার মেজাজ ছিল সপ্তমে। দিয়েছিল ছেলেটার পিঠে গুম করে এক কিল। তাতে ছেলেটার হাত থেকে হরিণটা মাটিতে পড়ে গিয়ে সমস্ত শঙ্খ, ঝিনুক খুলে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ছেলে তো ভয়ে কাঠ! এবার যে কত মার পড়বে পিঠে-হাতে-পায়ে! এসব কথা মনে পড়তে পুষ্পার ভেতর থেকে কান্না উথলে ওঠে। ঘরে যেতে মন চায় না। ও রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় বসে পড়ে। যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক যেন!

মন উথাল-পাথাল ঘরের মানুষটা দশবছর ধরে নিখোঁজ। ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছিল। সেটাও চুরমার হয়ে গেল। এখন আর বেঁচে থেকে কী লাভ! এখানেই পড়ে থাকা যাক। নেকড়ে-হায়নারা যদি রাতের বেলায় এসে খেয়ে ফেলে তাহলে ভালো হয়। মনের জ্বালা জুড়োয়।

কাঁদতে কাঁদতে ও কখন ওই গাছতলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকটা রাত হয়েছে। আকাশে একফালি চাঁদ। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক, রাতচরা পাখির আওয়াজে পুষ্পার ঘুম ভেঙে যায়। বাবুল যেন ডাকছে মা মা...! দরজা খোলো!

ও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। কোথায় বাবুল! কোথায় দরজা! ও তো এখন...! এবার ওর খুব ভয় করতে থাকে। এখান থেকে বাড়ি বেশ কিছুটা পথ। এত রাতে একলা যাবে কী করে! এখানে থাকলেও তো বিপদ। তাছাড়া বাবুল যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকে, ওকে তো খুঁজে পাবে না! ইস! কী ভুল যে করেছে! কেন যে মরতে গাছতলায় বসতে গেল! সে বেচারা ঘরে ঢুকতে পারবে না। হয়তো পথের ধারেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। খুব লাজুক ও। পাশের বাড়িতেও যাবে না।

এসব ভেবে পুষ্পা বাড়ির পথে পা বাড়ায়। গাছতলা থেকে এসে রাস্তায় নামে। এমন সময় ও বাজারের দিক থেকে দু'জন লোককে আসতে দেখে। তাদের কথার আওয়াজও কানে আসে। ও খুব ভয় পেয়ে যায়। যদি খারাপ লোক হয়! যদি ওকে ধ'রে...।

ও একটা গাছের আড়ালে লুকোয়। লোকদুটো বেশ কাছাকাছি। মনে হচ্ছে একজন বয়স্ক লোক আর একটা বাচ্চাছেলে। আচ্ছা! বাচ্চাটা বাবুল নয় তো! ওর মনটা ধক করে ওঠে। লোকদুটো এবার প্রায় গাছটার সোজাসুজি। অন্ধকারের মধ্যেও ওর চোখে যেন একশো প্রদীপ জ্বলছে। চোখ বড় বড় করে বাচ্চাটাকে দেখতে চেষ্টা করে। বাচ্চার কাঁধে একটা ঝোলা, আর লোকটার খালি হাত। ওরা কথা বলতে বলতে জোর কদমে পথ হাঁটছে। বাচ্চার গলাটা ঠিক যেন বাবুলের মতো! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও বাবুল! পুষ্পা চিৎকার করে ওঠে—বাবুল...! আমার সোনাটা! লোক দু'জন থমকে দাঁড়ায়। বাচ্চাছেলেটা চেঁচিয়ে ওঠে মা...!

পুষ্পা নিশ্চিত ও বাবুল। এবার ও গাছের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বাপ আমার! তুই কোথায় ছিলিস? ওরে আমার সোনা! কাঁধের থলেটাও ছাড়িসনি দেখছি!

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে মালের থলে আমি ছাড়িনি রে মা! সব মালই আছে, বোধহয় ভেঙে গেছে। আমাকে যেন মারিস না! তবে আবার জোড়া লাগানো যাবে রে মা। সরস্বতীর বীণা, হরিণের শিং, ময়ূরের পেখম, সব সব জোড়া লাগানো যাবে। আমি এ-গলি ও-গলি ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। জঙ্গলের ধারে চলে গিয়েছিলাম। এই

লোকটা আমাকে জঙ্গলের ধারে দেখতে পেয়ে শুধোয়, "কোথায় থাকিস? সঙ্গে কেউ নেই? চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই।"

পুষ্পা আর কোন কথা বলতে পারে না। ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরে। সঙ্গের মানুষটা এতক্ষণ যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ও কোনক্রমে এবার বলে ওঠে এটা তোর মা?

লোকটার গলা শুনে চমকে ওঠে পুষ্পা। এ-গলা তো...! লোকটা বলে ওঠে এইটুকু ছেলেকে একা বাজারে পাঠাও কেন!

পুষ্পা অন্ধকারের মধ্যেও মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করে। লোকটা রুক্ষ গলায় বলে যাও, ছেলেকে নিয়ে ঘরে যাও। এখানে থেকো না।

পুষ্পা এবার স্থির নিশ্চিত, এটা সেই মানুষটা, যে দশবছর আগে...। ওর মনের মধ্যে এক ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে। সে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রর ঝনঝনি ওকে যেন বধির করে দেয়। গোলা-বারুদের ধোঁয়া ওর গলা বুজিয়ে দেয়। তীব্র অভিমান, ঘৃণা, রাগ, কষ্ট মিলেমিশে অনেক একটা কথাই বলতে পারে কেন তুমি এমন করলে!

লোকটা কোনও কথা না ব'লে ছেলেটার কাছে আসে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খায়। তারপর বলে আমার এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। দশবছর ধরে পুলিশ আমার পেছনে পড়ে আছে। আমি যাচ্ছি।

এরপর কোনদিকে না তাকিয়ে লোকটা সোজা জঙ্গলের দিকে হাঁটা দেয়।

পুষ্পা মানুষটাকে ডাকতে গিয়েও থেমে যায়। হনহন করে হাঁটতে থাকা লোকটার দিকে ফ্যালফেলে চোখে তাকিয়ে থাকে। ওর খুব ইচ্ছে করে লোকটাকে ডেকে একটু ভালো করে দেখে। কিন্তু কোন এক অজানা ভয়ে ওর গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।

জ য় দী প চ ক্র ব র্তী
রাধু ও মান্দার

জেঠুকে বলেছিলাম, 'আমি কিছুতেই সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব না।'

'বেশ তাই এসো', জেঠু বলেছিলেন, 'আমি পিকলুর কাছে কাগজপত্তর রেখে দেব। সেই তোমার সঙ্গে কথা বলে সই-টই যা করানোর করিয়ে নেবে'খন...'

পিকলু জেঠুর ছোট ছেলে। বড় ছেলে টুকলু শুনেছি এখন নয়ডায় থাকে। বছরে বড়জোর বার দুই আসে রাধানগরে।

আমি তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা।'

জেঠু আবার বললেন, 'তোমার ঘরদোর বড়-মা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবেন, চিন্তা কোরো না। আর যে ক'দিন থাকবে, আমাদের এখানেই খাওয়া দাওয়া কোরো। একদম হেজিটেট করবে না। আমরা তো তোমার আপনার জন জয়ন্ত...'

আমি গম্ভীর গলায় বলেছিলাম, 'আমি পরদিন সকালবেলাতেই ফিরে আসব।'

'সে কী কথা! এত দিন পরে বাপ পিতামহের ভিটেতে আসবে, হাতে তো একটু সময় নিয়ে আসতে হয়—'

'আমার কাজ আছে। পরদিন ফিরতেই হবে', জেঠুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেছি আমি। তিনিও আর কথা বাড়াননি। ফোন রেখে দিয়েছেন।

রাধানগরে আমাদের শরিকি পৈতৃক বাড়িটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে। বাগান, উঠোনসহ অত বড় বাড়ি আজকালকার দিনে বাহুল্যই। আর পুরনো বাড়ি হলে তো কথাই নেই। রক্ষণাবেক্ষণ করার খরচ জোগাতে মালিকের ফতুর হয়ে যাওয়ার অবস্থা। গত কয়েকদিন ধরে জেঠু এই কথাটাই আমাকে বার বার বোঝাতে চেয়েছেন। পিকলুও। আমাকে এমন পাখি-পড়ানোর প্রয়োজন ছিল না। তবুও...

জেঠু এবং তাঁর ছেলেরা চান, প্রোমোটারের হাতে পুরো প্রোপার্টিটা তুলে দিতে। তাতে নগদে বেশ কিছু টাকা হাতে আসবে। আর আমাদের দুই শরিকের জন্যে দুটো তিন কামরার ফ্ল্যাটও পাওয়া যাবে। কথাবার্তা তাঁরা এগিয়েই রেখেছেন। আটকে আছে আমার সইটুকুর জন্যে।

রাধানগরের বাড়ি নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। থাকার কথাও নয়। বছর দশেক আগে রাধানগর ছেড়ে চলে আসার পরে একবারের জন্যেও ও-মুখো হইনি আর। কাজেই জেঠুদের প্রস্তাবে না করার কোনও কারণই ছিল না।

বাস থেকে রাধানগর স্কুল মোড়ে নামলাম যখন, সন্ধে গড়িয়েছে। রাস্তা পার হতে হতেই দেখলাম, এই দশ বছরে রাধানগর অনেকখানিই বদলে গেছে। সন্ধের পরে হলদেটে বাল্বের আলো-আঁধারিতে মোড়া রাধানগর এখন ঝকঝকে আলো আর একগাদা দোকান-পাটে রীতিমতো শহর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখে আমার ফেলে আসা সেই গ্রামটাকে চেনাই যায় না। রাস্তা পেরিয়ে সেই অচেনা রাধানগরের পথে কয়েক পা হেঁটে আসতেই খোকনদার চায়ের দোকানটা চোখে পড়ল। স্বস্তি পেলাম খানিক। এই একটা দোকান প্রায় আগেরই মতো আছে এখনও। দূর থেকে খোকনদাকেও দেখতে পেলাম। আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছে। চুলেও পাক ধরেছে দশ বছরে। কিন্তু সেই একই রকম তৎপরতায় লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে খরিদ্দার সামলে যাচ্ছে লোকটা।

রাধানগর থেকে যখন চলে গিয়েছিলাম, সবে কলেজের পাট চুকিয়েছি। কয়েকটা টিউশন পড়ানো শুরু করেছি সন্ধের পরে। রোজ পড়িয়ে ফেরার পথে খোকনদার দোকানে গিয়ে দাঁড়াতাম চা খাবার জন্যে। মাঝেমধ্যে সিগারেট। আজও প্রায় অভ্যাসবশেই খোকনদার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করে চা বানাচ্ছিল খোকনদা। হঠাৎই মুখ তুলে আমার দিকে চোখ পড়তেই দু'চোখের ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'জয়ন্ত না?' খোকনদার গলায় উচ্ছ্বাস।

'চিনতে পেরেছ?' আমি একটু অবাক হয়েই বলি।

'চিনব না কী গো?' খোকনদা মাথা নাড়ল, 'তোমার বাবার কথা এখনও মনে পড়ে। কী ভালো মানুষ ছিলেন...' বলেই খোকনদা থেমে গেল। সম্ভবত ভেবেছে, বাবার প্রসঙ্গ উঠলে আমি অস্বস্তি বোধ করব। বাবার মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলেই

চালানো হয়েছিল। পুলিশও তেমনটাই জানিয়েছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই জানে, ওটা দুর্ঘটনা ছিল না। ট্রেনের কামরা থেকে তাঁকে ইচ্ছে করে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করাই হয়েছিল...

আমি মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। অনেক দিন ধরে চাপা পড়ে থাকা স্মৃতিরা হুড়মুড় করে উপর দিকে উঠে আসছিল। খোকনদা কাঁধে আলতো হাত রাখল, 'চা খাবে তো?'

'দাও', আনমনে উত্তর দিলাম আমি।

খোকনদার দোকান থেকে একটু তফাতেই রাস্তার উল্টোদিকে ছিল হেমেন্দ্র ফার্মেসি। দোকানটা নেই আর। সেখানে একটা তিনতলা সুপার মার্কেট হয়েছে।

খোকনদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানেই তো হেমেন্দ্র ফার্মেসি নামে ওষুধের দোকানটা ছিল তাই না, যে দোকানের বাইরে নিচু বারান্দাটায় রাধু শুয়ে থাকত?'

'ও প্রসঙ্গ থাক না', খোকনদা হাসার চেষ্টা করল, 'সেই কবেকার কথা...'

'দোকানটা উঠে গেছে?' খোকনদার কথার মাঝখানেই বলে উঠি আমি।

'হুঁ', মাথা নাড়ে খোকনদা, 'নাড়ুদের এখন অন্য হাজারটা ব্যবসা। খুব পয়সা করেছে গত দশ বছরে...' খোকনদা আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয়।

আমি সিগারেট ধরিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকি। শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে তির তির করে। সামনে বাঁ দিকে একটা পুকুর ছিল। দেখলাম পুকুরটা নেই আর। সেখানে চারতলা ফ্ল্যাট উঠেছে। এমন প্রথম বসন্তেই রাধু একদিন আচমকা রাধানগরে এসে জুটেছিল। আশ্রয় নিয়েছিল হেমেন্দ্র ফার্মেসির দাওয়ায়। ছেঁড়া কামিজ, রুখা চুল, ঘোলাটে দৃষ্টি অথচ মুখে এক অদ্ভুত হাসি লেগে থাকত মেয়েটার...

রাধানগরে বিভিন্ন সময় কতই তো পাগল মানুষ এসে জুটেছে, কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হত তাদের সকলের চেয়ে রাধু ছিল একেবারে অন্যরকম। আমি টিউশন পড়িয়ে ফেরার সময় রোজ রাতে দেখতাম, দুটো রাস্তার কুকুর আর রাধু জড়াজড়ি করে শুয়ে ঘুমোচ্ছে হেমেন্দ্র ফার্মেসির দাওয়ায়। আকাশে চাঁদ থাকলে জ্যোৎস্না নেমে এসে জড়িয়ে ধরে থাকত মেয়েটাকে। মাঝেমধ্যে সেই জ্যোৎস্নার স্রোত গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ত ঘুমন্ত রাধুর ঈষৎ হাঁ করা মুখের মধ্যে। আর কৃষ্ণপক্ষে অন্ধকার আটকে থাকত তার গায়ে। তখন রাধানগরের পথেঘাটে এত আলো-বাতি ছিল না। প্রায়ই দেখতাম, রাধুর ধুলোমাখা চুলে জোনাকিরা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। সবুজ রঙের আলো জ্বলছে রাধুর মাথা জুড়ে...

রাধু মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতেও চলে আসত আলুথালু, হাঁটতে হাঁটতে। আমাদের বাড়ির উঠোনে যে মান্দারগাছটা, ঠিক তার নিচে এসে বসত সে। মা তাকে খেতে দিত। সে দু'হাত দিয়ে খেত আর মায়ের দিকে চেয়ে হাসতো।

আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম। রাধু এসে বসেছে মান্দারগাছের তলায়। মা জিজ্ঞেস করল, 'তুই যে একা একা হেমেন্দ্র ফার্মেসির দাওয়ায় শুয়ে থাকিস রাতে, তোর ভয় করে না?'

রাধু অকারণ খিল খিল হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। রাধুর মাথার রুক্ষ, জট-পড়া ময়লা চুল ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আরও খানিক বেশি ময়লা হয়ে গেল।

মা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে থাকবি রাধু, আমাদের বাড়িতে?'

বাবা, জ্যাঠার ঘরদোর ভাগ হয়ে গেলেও উঠোনের মাঝে কখনও পাঁচিল ওঠেনি। সেই অবিভক্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার জেঠু তামাক দিয়ে দাঁত মাজছিলেন তখন। মায়ের কথাটা কানে যেতেই তড়িঘড়ি কল থেকে মুখ ধুয়ে এসে মা-কে প্রায় ধমকেই উঠলেন, 'রাধুটা না হয় রাস্তার পাগলি। তার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু তোমার মাথাটাও কি খারাপ হয়ে গেল বউমা?'

'কেন?' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

জেঠু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'পাগলিটা থাকবে কোথায়? বাথরুম পায়খানা করবে কোনখানে?'

'আমাদের পুরনো গোয়ালঘরটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে দাদা, এখন তো আমাদের গরু নেই... এই বয়েসের একটা মেয়ে... বোঝেনই তো মেয়েদের কত বিপদ...'

জেঠু মায়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে রাধুর কাছে গিয়ে ঠিক গরু তাড়ানোর মতো করেই চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'এই হ্যাট, হ্যাট...যাঃ, ওঠ এখান থেকে---'

রাধু তখনও হেসে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। মাঝে মাঝে এক হাতে জড়িয়ে ধরছে মান্দার গাছের গুঁড়িটা। তখনই আমার চোখে পড়ল, রাধু যেখানে বসেছিল, সেখানে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে। মাটি প্রাণপণ শুষে নিয়েও অত রক্ত লুকোতে পারছে না---

আমার বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু কী যে হল ওই মুহূর্তে! আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, 'মা, রক্ত---'

মায়ের মুখে গোলাপি আভা ফুটল। আর জেঠু একটা লাঠি নিয়ে এসে রাধুকে খোঁচাতে লাগলেন, 'ওঠ, ওঠ বলছি হতভাগী। পাঁচজনের লাই পেয়ে যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটাতে আসে পাগলিটা আমাদের এই ভিটেতেই...'

পাঁচজন নয়, আমি জানি, মা-কে বিঁধেই জেঠু কথাটা বলছিলেন। জেঠুর মুখের উপর আমরা কথা বলতে পারতাম না তখন। সেদিনও বলতে পারিনি। রাধু উঠে দাঁড়িয়ে কিছুই হয়নি এমন ভাব করে দিব্বি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। জেঠু মায়ের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ও পাপ-রক্ত কে ধুতে যাবে এখন?'

মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমিই তাড়াতাড়ি একটা বালতি নিয়ে এসে কল থেকে জল ভরে মান্দার গাছের গোড়ায় ঢালতে লাগলাম। জলে জলে কাদা হয়ে গেল জায়গাটা, কিন্তু রক্তের দাগ কিছুতেই মুছল না। কল থেকে জল টানতে টানতে হাঁপিয়ে উঠলাম আমি।

এমন কিছু রাত হয়নি, তবু আমাদের বাড়িটা যেন থমথম করছে। উঠোনের পুব প্রান্তে জেঠুদের অংশে আবছা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ঘরের দিকটা ফ্যাকাশে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। পিকলু জানে আমি আসছি আজ, তবু একটা আলো জ্বালিয়ে রাখেনি।

শহরে কৃত্রিম আলোর অহংকারী রোশনাই কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষের হিসেব রাখার কথা মনে পড়তে দেয় না। কিন্তু রাধানগরে এসে অনেকদিন পরে চাঁদের আলোর অভাব অনুভব করলাম আজ। এখন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদের আলোয় জোর নেই তেমন। নক্ষত্র আর দুর্বল, রুগ্‌ণ চাঁদের মিলিজুলি আলোয় হঠাৎই চোখে পড়ল, উঠোনের মাঝখানে সেই মান্দারগাছটা তেমনই একা দাঁড়িয়ে আছে এখনও। পায়ে পায়ে গাছটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাণ্ডের ওপরে হাত রাখলাম সন্তর্পণে। আর আমার সারা শরীর যেন শিউরে উঠল। এত নরম হয় মান্দারগাছের শরীর! আর এমন ঊষ্ণ? পায়ের নীচে মাটি কেমন যেন চটচটে, আঠালো লাগছে। অস্বস্তি হচ্ছে আমার। আমি ছিটকে সরে এলাম।

রাতে ঘুম আসছিল না। আমাদের অংশে ইলেকট্রিকের কানেকশন কেটে দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। ঘরে একটা হ্যারিকেনের ক্লান্ত, টিমটিমে শিখা জেগে ছিল আমার সঙ্গে। জেঠিমা আন্তরিকভাবেই খাইয়েছেন। যে কথা ফোনে বলেছেন আগেই, খাওয়ার সময় জেঠু আজ আবার বললেন ইনিয়ে বিনিয়ে। পিকলু বলল, 'দাদা, নাড়ুদা নিজে আমাদের জমিটা প্রোমোট করছেন। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান এখন নাড়ুদাই। যে দাম দিতে চেয়েছে, অন্য কেউ তার ধারে কাছে যেতে পারবে না...'

আমি সব কথা শুনিনি। শুনতে ইচ্ছে করছিল না। পিকলুকে থামাতে বলেছি, 'আজ বড় ক্লান্ত লাগছে রে। কাগজপত্তর আমার ঘরে রেখে যা। সকালে দেখে সই করে দেব'খন।'

পিকলু খুশি হয়নি। কিন্তু জোরও করেনি আমায়।

রাধু যেদিন জেঠুর তাড়া খেয়ে চলে গেল তার দিন চার পাঁচ পরে একদিন রাতে পড়িয়ে ফিরছি, দেখলাম হেমেন্দ্র ফার্মেসির খোলা দাওয়ায় রাধু একলা শুয়ে আছে। কুকুর দুটো নেই। খোকনদার দোকানে চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কুকুরগুলো কোথায় গেল বলো তো?'

'কোন কুকুর?' খোকনদা চা বানাতে বানাতেই জিজ্ঞেস করল।

'রাধুর সঙ্গে যারা শুয়ে থাকে', আমি বললাম।

'কাল থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আজ দোকানে আসার পথে একটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি রাস্তার পাশে। আর একটার খবর জানি না...'

'কী করে মরল?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'তা কে জানে!' খোকনদা ঠোঁট উল্টে বলল নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

আমার শরীরের মধ্যে বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে ঢক ঢক করে জল খেলাম খানিক। দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এখন চাঁদ বেশ উজ্জ্বল। ঝকঝক করছে আকাশ। মান্দার গাছটার দিকে চোখ পড়ে গেল আমার। আমি চমকে উঠলাম।

দোল পূর্ণিমার কয়েক দিন আগে, এখনও মনে আছে আমার, একদিন ট্রেনের গন্ডগোলের জন্যে বাবার ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। বাবা বাড়ি ফিরল যখন, পুরো শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। চোখে মুখে রাগ, আতঙ্ক, ঘৃণা... বাড়ি ফিরেই হড়হড় করে বমি করল বাবা। আমি আর মা কতবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী হয়েছে। বাবা উত্তর দেয়নি। কাঁপা গলায় শুধু একটাই আক্ষেপ করেছিল, 'আমি কিচ্ছুটি করতে পারলাম না। ওরা আমাকে নিকেশই করে দিত আজ, আর একটু এগোলেই...'

'কারা?' আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। বাবা মুখ খোলেনি।

পরদিন সকালেই রাধুর গ্যাং রেপ্ড্ হওয়ার খবরটা কানে এসেছিল। ক্ষতবিক্ষত, রক্তে ভেসে যাওয়া রাধুর মৃতদেহ দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি আমার। মা খবরটা শোনা থেকে গুম মেরে বসেছিল ঘরের মধ্যে। বাবা তিন দিন অফিসে গেল না। চতুর্থ দিন ভয়ে ভয়ে বেরলো বটে, কিন্তু আর ফিরে এল না।

মর্গ থেকে বাবাকে আনতে গিয়েছিলাম আমি। পাড়ার ছেলেরা সঙ্গে ছিল। ওরাই চাপা গলায় বলেছিল, 'নাড়ুর দলের কাজ সব। পার্টির দাদাদের হাত রয়েছে মাথায়। কিস্যু হবে না ওদের, দেখে নিস...'

কারও কিছু সত্যিই হয়নি আজ পর্যন্ত। কিছুদিন রাধানগরের বাইরে থাকার পরামর্শটা জেঠুই দিয়েছিলেন। মা আমাকে নিয়ে গিয়ে উঠেছিল মামার বাড়িতে। রাধানগরে মা আর ফিরতে চায়নি ওখান থেকে...

দখিন দিক থেকেই হাওয়া বইছে, তবু শীত করছে আমার। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখছি, মান্দারগাছ নয়, যেন দু' হাত তুলে রাধুই দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানে। একলা, উলঙ্গ। হাওয়ায় উড়ছে তার উলোঝুলো চুল। রাধুর পায়ের কাছের মাটি রক্তে লাল হয়ে আছে...

সম্মোহিতের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে কে জানে! কখন রাত শেষ হয়ে আলো ফুটেছে, তাও বলতে পারি না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি তত ক্ষণে।

পিকলু দেরি করেনি। এক্কেবারে ভোরবেলাতেই সে এসেছিল আমার কাছে। আমার বিছানার পাশে টুলের ওপরে রাখা কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে সে বলল, 'সইটা করে রেখেছ তো জয়ন্তদা?'

'উঁহু', আমি হেসে দু' দিকে মাথা নাড়ালাম, 'আমার অংশ আপাতত বিক্কিরি করছি না। ওই মান্দারগাছটাকে দত্তক নিতে চাইছি আমি। প্রোমোটারের হাতে গাছটা কাটা পড়ুক, আমি কিছুতেই চাই না...'

পিকলু বোকার মতো তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

আমার অপেক্ষা করার মতো সময় ছিল না। এখন ফিরতে হবে। আমি ব্যাগ হাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে মান্দারগাছটার নীচে এসে দাঁড়ালাম। আলতো হাত রাখলাম তার গায়ে। গাছের মাথায় সূর্যের আলো এসে পড়েছে তখন। পাতারা দুলছে। গাছ থেকে ঝরে পড়া লাল টুকটুকে ফুলগুলো বিছিয়ে রয়েছে মাটির উপরে, রাধুর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ব্যর্থ রক্তেরই মতন...

সা য় ন্ত নী ভ ট্টা চা র্য

মুশকিল আসান

খাঁটুরায় কঙ্কনার বাঁওড়। গোবরডাঙা স্টেশন থেকে সাইকেল-ভ্যানে মিনিট পনেরো। মেঘ জমেছে, আকাশ ঝুলে পড়েছে, আম-বট-নিম ঝুঁকে আছে। সামনেই চন্ডীমন্ডপ। শিরীষ গাছের ছায়ায় ঢাকা এলোমেলো সিঁড়ি নেমে গেছে বাঁওড়ের জলে। হাঁসেরা ডুবছে, মাথা তুলছে। চুপচাপ এক ডিঙি নৌকো। অফুরান প্রকৃতি। বৃষ্টি এই নামল বলে।

মনিরানি সহিসের এখন কোনো দিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই। ইলিশ মাছের টুকরোতে নুন, হলুদ, কাঁচালংকা বাটা, কাঁচা সরষের তেল আর বাটা সরষে মাখিয়ে স্টিলের টিফিন বাক্সতে ভরে, ভাপে বসিয়ে নাকের কাছে হাত নিয়ে গন্ধ নিলো মনিরানি। চোদ্দশো টাকা কিলো মাছ। ঝকঝকে মাছ। বাঁওড়ের জলে রোদ্দুর খেলা করলে যেমন ঝকঝক করে, তেমন।

রান্নাঘরের খোলা জানলা দিয়ে ভুরভুর করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে ভেতর জুড়িয়ে দিচ্ছে। আঁচ একটু কমিয়ে জানলার কাছে গেল। কঙ্কনার টলটলে জলে পানকৌড়ি গলা উঁচু করে তাকিয়ে। নীল বিদ্যুৎ এপাশ-ওপাশ দাগ কেটে যাচ্ছে। গমগম করছে মেঘ। অন্ধকারে মনিরানির ছেলের কথা মনে পড়লো।

পাঁচ বছর হয়ে গেল ছেলে বাড়ি আসে না। মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়। এক-আধবার ফোন করে। ওই পর্যন্তই। কাজ করে সার্কাসে। মনিরানি আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস ফেলে। ছেলেটা ছাড়া আর আছেই বা কে! বাঁওড়ের জলে তাকিয়ে মনিরানি ভাবে সার্কাসের দিন ফুরোনোর কথা। দিন যে কেন ফুরোয়!

একটু দূরেই মনিরানির ঘর। সিমেন্টের দেয়াল, মাথায় টালি। একফালি, তবু নিজের। সামান্য উঠোনে ওলের ডগা উঠেছে লকলক করে। ছেলেও ওলের ডগার মতো, তাজা। জীবন কেমন তার! রাতে মাদুর পেতে শুয়ে মনিরানি ছেলের কথা ভাবে।

ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে এলো। রান্না হয়ে এসেছে। মনিরানি গ্যাস নিভিয়ে দিলো। এবাড়ির কাজে বেশি হুজ্জোত নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্কুলে পড়ায়। একজনের স্কুল গোবরডাঙায়, আরেকজনের ঠাকুর নগরে। দুই ছেলে। বড় ছেলে থাকে দিল্লি। চাকরি করে। ছোট ছেলে ব্যাঙ্গালোরে কলেজে পড়ছে।

মনিরানি দু'বেলা খাবার পায় আর মাসের শেষে চার হাজার টাকা। চলে যায় খারাপ না। আজ বৃষ্টিতে মনিরানির মনখারাপ করছে। ছেলের মোবাইল আছে। তিন চারদিন ধরে সে ফোনে ফোনই লাগছে না। ভয় ভয় করছে মনিরানির।

বাঁওড় বৃষ্টিতে ধুয়ে আবছা হয়ে আসছে। মনিরানি চন্ডীমন্ডপের কাছে, শিরীষ গাছের নিচে দু'জন চেনা মানুষকে বসে থাকতে দেখল।

— "রান্না শেষ হল মনি?"

মনিরানি ফিরে দ্যাখে বৌদি দাঁড়িয়ে। বলল, "হ্যাঁ, এই হল।"

— "ছেলের খবর পেলে? ফোন করলো?"

— "নাহ, তার কোনো খবর নেই। বলছি যে বৌদি, আমি একটু আসছি।"

— "এত বৃষ্টিতে কোথায় যাবে?"

— "ওই দ্যাখো না, শিরীষ গাছের নিচে বকুলখেপি আর নুটুখ্যাপা বসে। তোমরা মানো না বটে, কিন্তু এখানে এদের নামডাক খুব। সাক্ষাৎ ভগবান। দেখি যদি ছেলের খবর কিছু দিতে পারে।"

—"আচ্ছা যাও। আর বোলো ছেলের খবরের সাথে সাথে আমার হারিয়ে যাওয়া কানের দুলের খবর জানলে, যেন তাও তোমাকে জানায়।"

মনিরানি ঘাড় নাড়ল। বৌদির কানের দুল হারিয়েছে দিন পাঁচেক আগে। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকার গয়না। গেল কোথায়! চুরি করলে করল কে!

মনিরানি ঠোঁট চেপে ধরে। চোখ ছলছল করে, ঝলসায়! এরা মনিরানিকে সন্দেহ করছে কিনা বুঝে উঠতে পারে না। রাগ হয় খুব। কার ওপর যে রাগ!

২

বকুলখেপি মাথা ঝাঁকালো। জটা থেকে তিনটে উকুন সামনে রাখা সাদা কাপড়ে পড়ল। নুটুখ্যাপা সে উনুন মেরে ফেলল। বকুলের সিঁদুরের টিপ ভেটকে গেছে। নুটু বিড়ি টানছে। গাছ যত ঘাপসাই হোক না কেন, জলের ছিটে লাগছে এদিক-ওদিক থেকে।

মনিরানিকে আসতে দেখে নুটুর মনে হল এর থেকে ভালো কামাই হতে পারে। দুপুরে স্টেশনের গা-লাগা হোটেলে দু'মুঠো ভাতের আর চিন্তা থাকবে না। বকুল পেট ভরে খাবে, ঠোঁটের কোণায় সাদা ভাত লেগে থাকবে ভেবে নুটুর আরাম হল।

বাঘ যেমন মাংসের গন্ধ পায়, বকুলও মনিরানিকে দেখে রোজগারপাতির গন্ধ পেলো। চোখ বুজে, মাথা দুলোতে লাগলো। ঘোরের গলায় বলে চলেছে, "আয় আয় আয়।"

ভরা শ্রাবণ, ঝুম বৃষ্টি, গাছপালার কালো-সবুজ, কোথাও কেউ নেই। ভয় ধরে মনিরানির।

শিরীষের কাছে এসে বকুলের পায়ে হাত ঠেকাতে যেতেই নুটু চেঁচিয়ে ওঠে, "করো কী, করো কী! ভরে পড়েছে, পায়ে হাত দিতে নেই এখন। আগে মা চোখ খুলুক, বিপদের কথা তারপরেই বোলো।"

মনিরানি অবাক হয়ে বলে, "খ্যাপাবাবা বিপদের কথা আপনি বুঝলেন কেমন করে?"

নুটু ভেতরে ভেতরে হাসে। নিতান্ত গাধা। এত বৃষ্টিতে এসেছে মানে মাথার ওপর বিপদ ঝুলে আছে। এ আর নতুন কথা কী!

মনিরানি জোড় হাতে ছেলের কথা বলে। কদিন হল খোঁজ নেই, ছেলেটার বিয়ে দেওয়ার বড্ড শখ, একা হাতে মানুষ করেছে ছেলেকে এসব বলে। বলে খানিক শান্তি হয় যেন। বলে গরীবের ঘরে জন্মানো হতভাগার কথা, যার চেহারাই এমন যে সার্কাস ছাড়া আর কোথাও কাজ জুটলো না। তা অল্প বয়সে ছেলেকে সার্কাসে দিয়েছে বলেই ছেলের অভিমান হয়েছে হয়ত বা! মনিরানি নুটুর হাতে একশো টাকা দেয়।

বকুল চোখ খোলে। টকটকে লাল চোখ। সরষের তেল ঘষে লাল করে নিয়েছে একফাঁকে। ওই চোখেই কাজ যা হওয়ার হয়ে যায়। অদ্ভুত ঘ্যানঘ্যানে গলায় সুর করে বলতে থাকে, "ফিরবে তোর ছেলে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে। আছে সে রাজার হালে। চিন্তা করিস না কিছু। কয়েকদিনের মধ্যেই মা বলে ডেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে তোকে।"

মনিরানির চোখ ভাঙে। সুখ কেমন জিনিস এদ্দিনে টের পেলো না। কিন্তু সুখের আশায় বেঁচে থাকার সুখ টের পায়। ছেলে ফিরে আসার সুখ। মন হালকা হয়। ফিরতে ফিরতে হালকা গলায় ছেলের নাম ধরে ডাকে, "রাজা, রাজা।"

বৌদির কানের দুলের খবর জানতে চায় না মনিরানি। ইচ্ছে করে না। নুটু আর বকুল ভাবে একশো টাকায় পেট ভরে ভাত; মুশকিল আসান। মনিরানি ভাবে ছেলের ভালো খবর পাওয়া; মুশকিল আসান।

৩

রাজা সাড়ে সাত ফুট লম্বা। মাথা থেকে পা তার অনেক দূর। তারওপর মাথায় চুল নেই, হাত-পা সরু সরু। সামনের সারির দুটো দাঁত পড়ে গেছে এই বাইশ বছর বয়সেই। রাজার নিজেকে কেমন যেন বাজে ঝলসানো পাতাহীন তালগাছের মতো লাগে। কী রোগে শরীর এমন, সেকথা জানে না রাজা। জেনে হবে কী!

তো সে যাকগে, এখন রাজা শুয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স আসবে সেই অপেক্ষায়। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই উবে যাবে হয়ত। ভালোই হবে, ঝামেলা কমবে। মুশকিল আসান। সার্কাসের তাঁবুর এক কোণায় শুয়ে রাজা টের পেলো এখনো রক্তে তার শরীর ভেজা। ট্রাপিজের লালিয়ার কানের দুল চুরির

অভিযোগে সবাই মিলে খুব মারলো। হাটুরে মার। জন্তু-জানোয়ার পাচারের খবর চাপা দিতে রাজাকে সরানোর জন্য কিছু একটা এমন করতেই হত। আদৌ অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছে কিনা তাই বা কে জানে!

রাজা নিজের অবস্থা বুঝে নিজেকে বিড়বিড় করে বলল, "তুমি তো চললে হে। আফশোস একটাই, সত্যি যদি তুমি লালিয়ার কানের দুল দুটো চুরি করে নিয়ে ভেগে যেতে, তাহলে মনিরানি সহিসের জীবনে একটু সুখ দিতে পারতে। তাও তো পারলে না ভাই। মনিরানি সহিস এখন একা একা বাঁচবে কী নিয়ে!"

রাজার মনে পড়ল বাড়িতে মুশকিল আসান দরবেশ আসতো। হাতের সাদা চামর বুলিয়ে বিড়বিড় করতো। মা এসে তার ঝোলায় চাল-ডাল ঢেলে দিতো। তারপর মুশকিল আর আসান হল না। হয় না কখনো।

রাজা দেখলো সে ক্রমশ আরো লম্বা হয়ে উঠছে। আকাশের থেকে, পৃথিবীর থেকেও লম্বা। মনিরানি সহিস কি ঘাড় উঁচু করে রাজাকে দেখতে পাচ্ছে? কে জানে!

৪

রাত হয়েছে। মনিরানি চুপিচুপি বিছানার তলা থেকে লুকিয়ে রাখা গয়নার বাক্স বের করে দ্যাখে বৌদির কানের দুল। রাজার বিয়ের সময় এই দুল ভাঙিয়ে বৌকে অন্য কিছু গড়িয়ে দেবে। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই রাজা ফিরে আসবে।

পৃথিবী এইসময় ক্লান্তির হাসি হাসল কিছুটা। শ্বাসও ফেলল লম্বা। ওদিকে মনিরানি ভাবনা দিয়েই সব মুশকিল আসান করে ফেলল, বকুল আর নুটু ভাত খেলো। রাজা আরো লম্বা হল। দরবেশ চামর দুলিয়ে বলল "মুশকিল আসান, মুশকিন আ-সা-ন।"

প্রবন্ধ

সো মা লি চৌ ধু রী

হুদুড় দুর্গা ও দাঁসায় পরব

অয়ি গিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ শিরোধিনিবাসিনী বিষ্ণু বিলাসিনী জিষ্ণুনুতে
ভগবতী হে শিতিকণ্ঠ কুটুম্বিনি ভুরিকুটুম্বিনী ভুরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।
'মহিষাসুর নির্নাশি ভক্তানং সুখদে নমঃ'-

মহিষাসুর হিন্দু পুরাণে বর্ণিত একটি চরিত্র। মহিষাসুর ছিলেন রম্ভার পুত্র এবং ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপের প্রপৌত্র। ওষুধ গুবতি দানুর বংশধর ছিলেন অসুর রাজ রম্ভাসুর। একদিন রম্ভাসুর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এক স্ত্রী মহিষের দেখা পেয়েছিলেন। অলৌকিক ক্ষমতাধরী রম্ভাসুর জানতে পেরেছিলেন যে ওই স্ত্রী মহিষটি পশুরূপ ধারণ করা এক রাজকন্যা, যার নাম শ্যামলা। অভিশাপের কারণে মহিষ রূপে তাকে পরিণত হতে হয়েছিল। অসুররূপ ছেড়ে মহিষের রূপ ধারণ করে রম্ভাসুর নেমেছিলেন জলাশয়ে এবং মিলিত হয়েছিলেন মহিষ রূপী শ্যামলার সঙ্গে। এই মিলনের ফলে শ্যামলা গর্ভবতী হন এবং রাজকন্যা শ্যামলার গর্ভ থেকে জন্ম নেন বিশ্বভুবন কাপানো মহিষাসুর।

পুরাণ অনুযায়ী মহিষাসুরকে বধ করেন পরমাত প্রকৃতি দেবী দুর্গা। শুধু দুর্গা নন, একইসঙ্গে পূজিত হন মহিষাসুরও।

এসব তো হলো পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর পরেও একটা কাহিনী আছে যা অনেকেরই অজ্ঞাত। যদিও এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে আজও বিবাদ আছে। কালিকাপুরাণ অনুসারে দেবী দুর্গার ত্রিশূলের আঘাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হয়। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মহিষাসুরের বংশধরদের খোঁজ পাওয়া যায় এই পৃথিবীর বুকে। অবাক করার মত ঘটনা মনে হলেও ভারতের বেশকিছু অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মহিষাসুরের বংশজাত বলে মনে করেন আজও তাদের মধ্যে তেমনই কিছু অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের প্রাচীনতম উপজাতিদের একটি অংশ এই অসুর সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের একটি অংশ, দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকা, ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কিছু অংশে বসবাস করে এই অসুর সম্প্রদায়।

সভ্যতার বিবর্তনের এত যুগ পরেও শিক্ষার আলো সেভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। এখনো তারা নিজেদের আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ অন্যান্য সকলের থেকে অতিমাত্রায় আলাদা। শুধুমাত্র একটি দুটি পরিবার নয়; ২০১১ সালে সেন্সাস অনুসারে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে অসুর বংশজাত সদস্য সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশি।। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই উপজাতিভুক্ত মানুষেরা সমাজের নানা কাজে যুক্ত হতে শুরু করেছেন। কিছুটা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে তারা মিশে যেতে চলেছে সকলের সাথে সকলের ভিড়ে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত মা দুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গোৎসব ভারত উপমহাদেশের একটি প্রচলিত হিন্দু সংস্কৃতি, তবে বর্তমানে সারা বিশ্বে বিশেষভাবে ঐতিহ্যের সাথে দেবী দুর্গা পুজো পালন করা হয়। তবে শুধু সন্তানসহ দেবী দুর্গা নন, মহিষাসুরও এই পুজায় পূজিত হন।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালিরা যে সময় দুর্গোৎসব পালন করে ঠিক সেই সময় এই অসুর বংশীয় আদিবাসীরা শোক পালন করে থাকে। তাদের লোককথা অনুযায়ী, আর্যদের দেবী দুর্গা এই সময়ে তাদের রাজা মহিষাসুরকে ছল করে হত্যা করেন। আদিবাসীদের লোককথা অনুযায়ী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা হওয়ার কারণে আর্যরা ভারতে আসার পর যখন কিছুতেই তাঁকে পরাস্ত করতে পারছিল না, তখন এক গৌরবল নারী রাজাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। রাজাও নারীর মোহিত করা রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর নয় দিন সুন্দরী নারীর সাথে রাত্রি যাপন করেন এবং নবম দিনে ওই নারী রাজাকে কৌশলে হত্যা করে। রাজা অত্যন্ত নারী-বৎসল হলেও নারীদের যোগ্য সম্মান দিতেন। এই কথা আর্যরা জানতেন এবং এই ধারণাকে অস্ত্র করে আর্যরা এই কৌশল অবলম্বন করে। রাজার মৃত্যুর খবর শুনে আর্যরা রাজ্য

দখলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে উপজাতির পুরুষ সদস্যরা তাদের ধর্ম-গুরুর পরামর্শ অনুযায়ী সরস্বতী নদীতে স্নান করে নারীবেশ ধারণ করে দাসাই নৃত্য করতে করতে রাজ্য থেকে পালিয়ে যায়।

দুর্গা পুজোর এই আনন্দঘন সময়ে আদিবাসী সমাজ মহিষাসুরের জন্য শোক পালন করে থাকে। সমস্ত সমাজ অরন্ধন পালন করে, জানলা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে অনেকেই, যাতে পুজোর মন্ত্র বা ঢাকের আওয়াজ তাদের কানে না যায়। দুর্গা পুজোর সময় তারা অশৌচ পালন করে এবং ভুয়াং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ করে এই সম্প্রদায়।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড এবং ছত্রিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অসুর সমাজ 'মহান অসুর সম্রাট হুদুড় দুর্গা স্মরণসভা'-র আয়োজন করে প্রতি বছর। হুদুর দুর্গা হল খেরওয়াল সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা, যাকেঁ সাঁওতালরা হিন্দু ধর্মের মহিষাসুর বলে দাবি করে থাকে।। অনেকেই মনে করেন এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, এই গল্প আসলেই দেব-পক্ষ ও অসুর পক্ষের সংগ্রামকে আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্ব বলে চালিয়ে দেওয়ার ভিত্তিহীন প্রয়াস। আবার বিরোধীরা এই বিষয়টিকে সাঁওতালদের মূলনিবাসী তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করে থাকে।।

এখানে হুদুড় শব্দের অর্থ ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ বা বজ্রের ধ্বনি। মহিষাসুরের প্রভাব আর শক্তিই ছিল বজ্রের মত। আবার দুর্গা শব্দটি দুর্গের রক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত। সুতরাং সে এক পুরুষ। প্রবল শক্তিশালী এক দুর্গের রক্ষক বা রাজাই হলেন মহিষাসুর বা 'হুদুড় দুর্গা'। আদিবাসী ও সুর জাতির মতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল এবং বলশালী।

অসুর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস মহিষাসুর তাঁদের পূর্বপুরুষ এবং তাই পূর্বপুরুষদের হত্যাকারিনী দুর্গার মুখ দেখা পাপ। তাই তারা শখের মধ্য দিয়ে পশুর পুজো সম্পন্ন করে। পুজোর চার পাঁচ দিন কালো কাপড় দিয়ে বাড়ির চারপাশ তারা ঘিরে রাখেন। এই পুজোয় কোন ফুল, বেলপাতা, নীল পদ্ম, কিংবা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের কোন অনুষঙ্গ নেই। তার পরিবর্তে সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে ছাতা উত্তোলন করা হয়। হুদুড় দুর্গার মাথায় থাকে এই ছাতা। এই কারণে অনেক সময় এই উৎসবকে 'ছাতা ধরা' উৎসব বলা হয়ে থাকে।

অন্য একটি গোষ্ঠীর মতে 'হুদুড়' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মেঘ। এই সময় তারা দাসাই উৎসব বা দাসাই নাচ গানের মধ্য দিয়ে মূলত প্রকৃতি দেবীর বন্দনা করে থাকে। তারা মনে করে 'হুদুর দুর্গা' শব্দটির প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই। সাঁওতাল বুদ্ধিজীবী বিবেকানন্দ সরেনের মতে, দাসাই অর্থ দাঃআঁশুআয়। ইতিহাসের খোঁজে নয় জলের আশায় প্রকৃতি দেবীকে পূজা করাই লাটিদাসাই এর মূল উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, ভারতের আদিকালে যত ধর্মীয় উৎসব তার প্রতিটি কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত।

আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করে, আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের পর নিখোঁজ হয়ে যান অনার্য জাতির রাজা হদুড় দুর্গা। তাই দুর্গাপুজোর এই চার দিন ধরে দাসায় নাচের মধ্য দিয়ে সেই রাজাকে খুঁজে বেড়ায় এই উপজাতি সম্প্রদায়। তারা বিশ্বাস করে, কোথাও না কোথাও হুদুর দুর্গা আজও লুকিয়ে বেঁচে আছেন; আর তাকে খুঁজতেই পুরুষেরা মহিলার বেশে গ্রামের পর গ্রামে তাদের প্রিয় রাজাকে খুঁজে বেড়ায়। এছাড়া তারা দাসায় নাচের মধ্যে দিয়ে হুদুড় দুর্গার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে থাকে। এই নাচের প্রতিটি গানের শুরুতে 'হায়রে হায়রে' বলে শোক জানানো হয়।। অনেকের মতে, ভক্ত নারী গণিকা হওয়ার কারণে হিন্দুরা দুর্গা পুজোয় দুর্গার প্রতিমা তৈরি করতে গোমূত্র, গোবর এবং গঙ্গা জলের সঙ্গে গণিকালয় বা পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার করে থাকে।

দাসাই উৎসবের মূল গীতি এবং তার অর্থ:

হায়রে হায়রে
অকয় যাপে জুঁড়িয়াদা দেশ দ
অকয় যাপে আতার আদা দিলাম দ
দেশ দরে ল-লাটি চ এন দ
দিলাম দরে হাসায় ডিগিরেন
ঠাকুর গেচয় জুঁড়িয়াদা দেশ দ
ঠাকুর গেচয় আবার আদা দিশম দ
হায়রে হায়রে।
অকয় যাপে জুঁড়িয়াদা হায়রে হায়

সিঞবির দল : কান দ হায়রে হায়
মানবির দ হাসায় ডিগিরেন
দেসে ছিতা দেহে কাপড়া হায়রে হায়
জারগে দা ঃ দ নতে বিন হায়রে হায়
তারসে রাকার, তারসে নাড়গ হায়রে হায়
সিঞবির দঃ কানদ হায়রে হায়
মানবির দলঃ কানদ হায়রে হায়।।

অর্থাৎ প্রচন্ড অনাবৃষ্টির ফলে দেশ তথা মানভূম এবং সিংভূমের জঙ্গল জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে-হে ঠাকুর বৃষ্টি দাও। ছিতা এবং কাপরা (জাহের দেবীদের অন্যতম দুই দেবী) -দেশে বৃষ্টি দাও।

বলা যায়, সাঁওতাল ও কুর্মী সম্প্রদায়ের দাসাই নাচ জঙ্গলমহলে প্রতিটি মন্ডপের ভিন্ন মাত্রার সাংস্কৃতিক অঙ্গ।

সাঁওতাল লোকগাথা অনুসারে, 'আয়নম' এবং 'কাজল' নামে দুই সাঁওতাল যুবতী জঙ্গলে কাঠপাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। আর্য সমাজের কয়েকজন তাদের অপহরণ করায় মহিলাদের রক্ষা করতে একাই এগিয়ে যান হুদুর দুর্গা। তবে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে সাঁওতাল সমাজের একদিন সময় লাগে। সাঁওতাল পুরুষরা মহিলাদের পোশাক পরে লাউয়ের খোলায় তীরের ফলা, অস্ত্র ইত্যাদি লুকিয়ে হুদুর দুর্গা, আয়নম এবং কাজলের খোঁজ করতে থাকেন। অতি বৃষ্টি এই সন্ধানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সাঁওতাল ভাষায় দাসাই শব্দের অর্থ প্রশমন। জল বা বৃষ্টি কমার অপেক্ষায় সন্ধান করতে দেরি হয় এবং প্রিয় মানুষদের খোঁজ না পেয়ে 'হায় হায়' শব্দ করে গান করতে থাকেন।

আদিবাসী সম্প্রদায় দুর্গাপুজোর সময় শোক পালন করলেও উৎসবের পনের দিন পর 'বাঁদনা' পরবে গৃহপালিত পশু মহিষের পুজো করে। কেবল পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০০ টি জায়গায় এই জনজাতির মানুষেরা মহিষাসুর স্মরণে দাঁসাই উৎসব পালন করে। এই নাচের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো ভুয়াং, যা শুকনো লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি।

মনে করা হয়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ আদিবাসী অসুর জনজাতি। আলিপুরদুয়ারের সম্পূর্ণ একটি গ্রামের নামই হল অসুর। মন্ডল কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী তফসিলি জাতির প্রথম জনজাতি হল অসুর। অজিতপ্রসাদ হেমব্রম বলেন,"আমরা সাঁওতাল, খেরওয়াল উপজাতির একটি শাখা। এই সম্প্রদায়ের মানুষ 'অসুর' উপাধি ব্যবহার করেন। আমাদের পূর্বপুরুষ হুদুড় দুর্গাকে দুর্গার পায়ে দেখতে আমাদের কষ্ট হয়"।

বিগত কয়েক বছর ধরে হুদুড় দুর্গা পুজো বা শোক উৎসব বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ৭০০টি জায়গায় শহীদ হুদুড় দুর্গা স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে। রাচি, গুমলা, হাজারীবাগের অসুর জনগোষ্ঠীর মানুষ চরম ক্ষোভে দুঃখে অপমানে বাংলার দুর্গোৎসবে শোক পালন করে থাকে।

একটি উৎসব ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদযাপিত হয়। যেমন হিন্দুদের দুর্গাপুজো ও সাঁওতাল উপজাতির হুদুড় দুর্গার বাসায় পরব। হিন্দুদের কাছে এই উৎসব আনন্দের ও শুভ স্বরূপ হলেও সাঁওতাল বা অসুর উপজাতির কাছে তা দুঃখের এবং শোকের।

তথ্যসূত্র:

দুর্গা : একটি অবলোকন—অরুনাভ চট্টোপাধ্যায়
আবাসভূমি : অসুর আখ্যান
নিম্নবর্গের ইতিহাস : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়
Myth against myth-Dhaka tribune
BBC news Bangla
The New Indian express
Mahishasur day observed at JNU

কবিতায়

কে ষ্ট চ ট্টো পা ধ্যা য়
ভোটের ছড়া

এক।।

মুখ চাই না সুখ চেয়েছি
কর্মময় বেলা
একটু পড়া একটু লেখা
একটু মাঠে খেলা।

দুই।।

ঢপের টাকা কত দিচ্ছ
কাজের পাত্তা কৈ
আশা দিচ্ছ কত শত
মুখে ফুটছে খৈ।

তিন।।

কাজের জন্য বসে আছে
বছর থেকে বছর
আশা দিচ্ছ কত শত
চারিদিকে চোর।

চার।।

মিটিং আছে রাত বারোটায়
যাবি কিন্তু আশা
গেলে পরে কাজ হবে রে
বেজে উঠবে তাসা।

পাঁচ।।

তাসা বাজবে কতক্ষণ
তাসা যাবে বিসর্জন
তাসা বাজবে কতক্ষণ
তাসা যাবে বিসর্জন।

বৌ ধা য় ন মু খো পা ধ্যা য়
ভালোবাসি, কায়রোতে

ভালোবাসি তোমার ত্বকের নম্রতা
লঘুপাঠ, আচমন, দুপুরের ক্ষিপ্র আলো
নাইপল ভালোবাসি, ক্যারিবীয় বিহারি আচার
'হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস' প'ড়ে আশ্চর্য হই
আর ভাবি আমিও তো এভাবেই লিখতে পারি
নধর গ্রন্থখানি উপনয়নের পরে
তবু এতো হিন্দি সিনেমা দেখি
ইউ টিউব আর নেটফ্লিক্সে

হঠাৎ ইংরিজি হারিয়ে যায়
নাকের বাতানুকূলে প্রগাঢ় নিঃশ্বাস বয়
বুঝি ঝিম চেতনা আবার আসছে ধেয়ে
এই বুঝি টেসে যাবো মেঘের বিছানায়, পিরামিড দেশে
কে বডি নিয়ে যাবে কঙ্কালীতলায়
ধড়ের ভিতরে কি আগাম মৃত্যু লেখা থাকে?
তাহলে আবার আচমন করি
দুপুরে মরুভ্রমণ সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ি
স্বপ্নের জাদু যদি নিয়ে যায় বাসর নাচ ঘরে

ত প ন কো লে
মগ্ন ঢেউ

কথা ফুরোয়, ফুরোয় না তার বৃত্তান্ত
ধুলো থেকে মাথায় তুলেছি তাকে

ধোঁয়া আর ধোঁয়াশাময় সম্পর্কের মাঝখানে
শীত জমে ওঠে কালান্তক

পাতা ও পাথরের চুম্বন শেষ হল বুঝি
ঢেউ ওঠো....ঢেউ..... মগ্ন ঢেউ

বী থি চ ট্টো পা ধ্যা য়
কুসুম চিহ্ন

কফিন বুকে নিয়ে হাঁটবে কলকাতা
ঝরছে পথে পথে হালকা ফুল
কবরে বয়ে যাবে শীতের হিম হাওয়া
তারায় ঝিলমিল সে উপকূল;

বর্ষা বহুদূর, কফিন এলো শীতে
কীভাবে ঝরে ঝরে পড়বে মেঘ?
সমাধি ঢেকে দেবে কুয়াশা ভালবেসে
মাটির নিচে সব নিরুদ্বেগ!

কফিন বয়ে নিয়ে হাঁটবে কলকাতা
কোথায় যাচ্ছেন রাশিদ খান?
নীরবে হেঁটে যাওয়া, জীবন এরকমই
মৃত্যু হয়ে ওঠে একটা গান।

ফুল তো ফুটবেই এমন অঙ্গনে
তামাম পার্কস্ট্রিট, চাঁদনীচক!
একটা গান নিয়ে হাঁটবে কলকাতা
কোমল ধৈবত, রাগ তিলক।

বর্ষা বহুদূর, এখন এ-শহরে
পলকে ঝিলমিল তারার রাত;
কফিন এলো বলে শহরে হতে পারে
সহসা মেঘভাঙা বৃষ্টিপাত?

ত্রি দি বে শ চৌ ধু রী
বিচার

কোনো অভিযান নয়—
অন্যায়ের বিচার চাইতে
— দ্বীপ-দ্বীপান্তরে-দেশ —
বিদেশে বা ক্রৌঞ্চদ্বীপে আন্দোলন যেন হয় —
অন্যায়ের বিচার —
পাপীর শাস্তি যেন হয় —
তৎক্ষণাৎ বিচার ও শাস্তি না হলে —
ধামাচাপা কালচারে মুনি —
ঋষিরা জেগে ওঠেন পরিবর্তনের
সত্যযুগ জেগে ওঠে —

শ কু ন্ত লা সা ন্যা ল
মুক্তি কোনো আইটেম নয়

কিসে মুক্তি? কি উপায়ে নারী-পুরুষ,
সঠিক পরিপাক হতে পারে বলো?

কতোটা মুক্তি, কতোটা স্বাধীনতা তুমি ও তোমরা আমাকে দাও?
তুমি নারী আমিও নারী, তুমি পুরুষ যখন, আমিও পুরুষ।
তবু নাড়ানাড়ি, তবু বাড়াবাড়ি,
স্বাধীনতা তুমিও চাও।

তুমি সত্যবতী, মিথ্যাবতী,
আদি থেকেই, তুমি আমাব—
তুমি, অসাম্যের কারণ আমার হও।

তবে, সবি কি আর একরকম?
সবি ভিন্ন, তবু অভিন্ন,
আপদকালীন বুদ্ধিমত্তায় বুদ্ধি এসে বসে,
সে বুদ্ধিও দেখেছি সীমায়িত।

তবে এসো আড্ডা,
এসো, আড্ডা, ঘরে রোয়াকে আলো হয়ে বসো,
হয়তো তুমিই একমাত্র, যুক্তি গেঁথে—
মুক্তির হাওয়া বহাতে পারো।

ম জি দ মা হ মু দ
জ্ঞান ও আয়ু

আয়ু ফুরিয়ে গেলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
জীবনের সকল শেষ ও সুন্দর
আমাদের আয়ুর সাথে থাকে
আমাদের সকল পাঠ ও অভিজ্ঞতা
সময়ের বিনিময়ে সঞ্চিত হতে থাকে
মানুষ জানে—জীবন সময়ের নাম
সময় উদ্যাপনের তাড়না
ফুরিয়ে যাবার ভয় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে তাকে
যদিও একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থিত হয়ে থাকে
সকল কিছুর শেষে অর্থহীন কর্মহীন
শূন্যতা পেয়ে বসে
গতকাল হয়তো ছিলেম ভালো
আজকের দিন মাটি হয়ে গেল
পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে
এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে বেশ
কিন্তু সঠিক উত্তরের অপেক্ষা হয়নি কো শেষ
অনেক ইমারত গড়েছি আমরা
বহুদূর চলে গেছে রেলের লাইন
বিনা তারেও কথা হয় বেশ
কথার ফুলঝুরি—দর্শন ও বিজ্ঞান—
কে কার চেয়ে বড়
ঈশ্বর আছে বা নাই এইসব যুক্তির
কোনোদিন হবে না শেষ
কনফুসিয়াস বুদ্ধ ইসা বা মোসেস
শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জন্মাবেন হয়তো আমাদের নবী
ঈশ্বর না থাকলে এতসব কীর্তি কার কাছে গচ্ছিত রবে
সকল পাপের ভার দুঃখ ও আনন্দের কথা ভেবে
ক্ষয়িষ্ণু আয়ুর কাছে রেখে যাবে তবে
তবু পরমায়ু শেষ হলে মানুষ প্রাপ্ত হবে প্রকৃত জ্ঞান
হতে পারে সকল বিতর্কের অবসান
পৃথিবীর কারবার শেষ হলে বস্তু ও শূন্যতার মাঝে
প্রকৃত জ্ঞানের আলো পরপারে খেয়াযান হয়ে ভাসে।

নি র্ম ল সা ম ন্ত
অনাবৃতা

অনাবৃতা শরীরে অনেক প্রশ্নের ছাপ!
প্রশাসন কিংবা বন্ধ চোখের অন্ধকার
দুঃস্বপ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় আনাচে-কানাচে ....

তুমি একাকিনী নও,
একাকীত্বের মৃত্যু গহ্বরে বন্দী করেছে তোমাকে শ্বাপদের দল,
যারা ভেবেছিল তোমাকে হারিয়ে দেবে গুম করে
তারা আজ আনাচে-কানাচে উঁকি দেয় খুনীর পোশাক খুলে....

ওগো অনাবৃতা একাকিনী,
তোমার রক্তের ছোঁয়ায় এ-বিশ্ব উঠেছে কেঁপে
কোটি মানুষের কলরব তোমাকে একা হতে দেয়নি,
কোটি মানুষের আগুনচোখ
তোমাকে একা হতে দেবে না....
কোটি মানুষের প্রতিবাদ নেকড়ের মৃত্যুর আগে
তোমাকে একা হতে দেবেই না.....

স ঙ্গী তা মু খা র্জী ম ণ্ড ল
ভালোবাসার আদিম যত্নে

ভালবাসি না, তবুও চিবিয়ে খেতে চাই।
অন্তত একবার, তোমার ইচ্ছের পুরুষ নয়,
শুধু যন্ত্রণার বীজ পুঁতে দেবো দু পায়ের মাঝে
সারা শরীর জুড়ে।

হাতের আঙুলের ডগায়, ঠোঁটের ছোঁয়ায়
শিরা বেয়ে নামবে, শুধুই নীল যন্ত্রণা
নাম গোত্রহীন ভালোবাসার আদিম যত্নে,
হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে পুড়ে।

প্র ত্যু ষ প্র সূ ন ঘো ষ

পথিক সময়

একটি চোখে অগ্নি শলাকা
আর একটিতে মেঘ বিদীর্ণ বারিধারা
একটি হাতে শাণিত কৃপাণ
আর একটিতে অমৃত শান্তি
এভাবেই পৃথিবী ও সৌরলোক মিলেমিশে থাকে
তবু কি কখনও নক্ষত্রলোক,
ছায়াপথ, সপ্তর্ষি, অক্ষরেখা
দুলে ওঠে না!
সেই অসির চঞ্চলতার মুহূর্ত
পর্বতশীর্ষ থেকে
অতলান্ত শূন্যে পাড়ি দিতে চেয়ে
পদানত আকাশের হাহাকারে হারিয়ে যায়।

কবির সংজ্ঞাহীন চৈতন্য
কিছু কবিতার খসড়া
দুর্বোধ্য লিপিতে লেখে,
কয়েক হাজার বছর পার হয়ে
কারা এসে খুঁজে পাবে
সে প্রতীক্ষায়
মানুষ চলেছে দূর থেকে দূরে
গ্রহ গ্রহান্তরে।

অং শু মা ন ক র

১

একটি জনগণতান্ত্রিক কবিতা

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেলা যায়। ভোরের আকাশ দেখি। দেখি মেঘলা আকাশ। দেখি শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। দেখি গোধূলির আকাশ। দেখি রাতে আকাশে একে একে জ্বলে উঠছে গ্রহ ও নক্ষত্র। চাঁদ। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আকাশকে ভালবাসতে বাসতে রাত্রি যায়। শুধু সূর্য যখন প্রখর তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। তখন আকাশে কিছু নেই। শুধু তেজ। শুধু বহ্নি। একার হুংকার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেলা যায়। রাত্রিও যায়। শুধু বেলা বারোটায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। তখন আকাশকে ভালোবাসা যায় না সে যতই সূর্য হোক না আমাদের শক্তির উৎস। আকাশ তো সবচেয়ে সুন্দর যখন সেখানে ঝলমল করে নক্ষত্র। এক নয়—লক্ষ, হাজার।

২

আশা

সে কি পাহাড়ের শীর্ষে ফুটে থাকা
ছোটো হলুদ ফুল?
অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামের শেষ বাড়িটি থেকে শুনতে পাওয়া
অশ্বখুরধ্বনি?
কুয়োর অতলে থাকা
শান্ত, শীতল কোনো ঘুম?
আর কিছুই নয়,
সে টিমটিমে আলো-জ্বলা বাসস্ট্যান্ডে
ধুঁকতে ধুঁকতে আসা শেষ বাস
যাতে
ঝুলতে ঝুলতেও বাড়ি ফিরে আসা যায়।

স প্ত র্ষি রা য়

ফিরে এসো

এবার বৃত্ত পূর্ণ হলে ফিরে এসো
অশ্বক্ষুরে ঝড় উড়িয়ে। ফিরে এসো
প্রতিদিন থেকে বহুদিনের দিকে
এগিয়ে যাওয়াটাই অপ্রেমের বিরুদ্ধে
প্রেমের বিদ্রোহ।

এবার বৃত্ত পূর্ণ করে ফিরে এসো
তোমার আদিগন্ত ঢেউখেলানো সৌন্দর্যে
উদ্ধত দুই কামনার যৌবন চূড়ায়
পাপড়ি ছড়িয়ে রাখা ভালবাসার উপত্যকায়।

এবার বৃত্ত পূর্ণ করে ফিরে এসো
অভ্যাসের অন্তঃসারে বেড়ে ওঠা
আর্য অনার্যের দ্বন্দ্ব মুছে দিতে
ধর্ম অধর্মের বিচারহীন যুদ্ধের বিরুদ্ধে
সভ্যতার স্থায়ী অক্ষর রেখায়।

অ লো ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

শনাক্তকরণের আগে

শনাক্তকরণের আগে যারা ভিড় করেছিল মর্গের বারান্দায়
তারা সব মান্যগণ্য তাদের কি সহজে চেনা যায়?
সেই রাতে পানাশালা আলো করে যেসব হরিণ-শিশু
সরল জিশুর মতো
উদার আহ্বানে কানে কানে বলেছিল, ধারে কাছে আর
কোনও গুপ্তশত্রু নেই
তারা তো একথা জানে সর্বের মধ্যেই ভূত
শিষ্যদের মধে থাকে আপৎকালীন কোনও আততায়ী
এখন শোকের কাল, কাটাছেঁড়া আপাতত স্থগিত থাকুক
কিছুটা চোখের জল, মায়াকান্না, কিছু বিড়ম্বনা,
প্রশংসার অতিরেক যা কিছু মানায় এই নির্দিষ্ট আবহে
সমানুপাতিক ভাবে সমসত্ত্ব মিশ্রণের আয়োজনে
কোনও ত্রুটি যেন না থাকে কোথাও

এমন নিদান দিয়ে শুভানুধ্যায়ীরা একে একে যে যার বাড়ির পথে পাড়ি দেয়
মৃতদেহ মিট মিট করে হাসে, সে তো বোঝে মোদ্দা কথা
সোনালি রাংতার নিচে কঙ্কালের বিষয় আশয়

উ দ য় ন ভ ট্টা চা র্য

প্রকৃতির কাছে

প্রকৃতির কাছে ফিরতে চাই ব'লে
আজ সন্ধ্যায় পরস্পরকে পরস্পর আলিঙ্গন করলাম
সেই থেকে গাছ আমার বন্ধু হয়ে গেল।
ফেলে দিলাম কুঠার।
একটি সিংহ আকারের মেঘ
মেষ আকারের কালো মেঘকে আঁকড়ে ধরলো
তারপর উপর্ঝরণ বৃষ্টি।
পরমাণু আচ্ছন্ন পৃথিবীতে
ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন
স্থাপত্য ও লাবণ্য
আমি তার মধ্যে মিশিয়েছি মধুক্ষরা
পুরীর মন্দিরে তার সে চরণচিহ্নে চকিতে
সেবার পা লেগে গেল অমঙ্গল
স্পর্শমুখি সেই পাথরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বেলা যায়
স্থাপত্য নিয়ে বিদেশে চলে যায় লুঠেরা
আমাদের স্বপ্ন হাহাকারে ভরা।

প্র গ তি মা ই তি

ফাঁকা মাঠে গোল

তর্জনিতে কালি মাখবে বলে
কাজ কামাই করে ইয়াসিন
সক্কাল সক্কাল লাইনে দাঁড়ায়
অপেক্ষার পর অপেক্ষা
লাইন নড়েও না চড়েও না
দেখতে দেখতে লাইন মাঠ
পেরিয়ে রাস্তায়
তবুও লাইন থমকে থাকে
লাইনের প্রথমদিকের বৃদ্ধ চিল্লায়
তার চিৎকার বাতাসে ভেসে
কারও কারও কানে গেল
মুহূর্তে লাইন বে-লাইন হতে
হতে পুরো মাঠটাই ফাঁকা
গণতন্ত্র এখন ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে

কা লি দা স ভ দ্র

বল্মীক

এখন চাঁদকে আর কাস্তে মনে হয় না

দিন বদলে গেছে হঠাৎ
ঘন ঘন পাড়ি দিচ্ছ চাঁদে
মাটিতে খুঁজছে প্রাণ

বৈঁচি ফুলের ঝোপে
একাদশীর চাঁদ দেখতে
তোমার শ্রমিক-চোখ পেয়েছিল
কাস্তে যেন চাঁদ
গনগনে ক্ষিদে জড়িয়ে
শ্রমজীবী নামাবলী হাতে
মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে
হেঁকেছিলে জ্যোৎস্নায় ভাসুক খেত খামার
কাজ পাক হাত

লোভী মানুষের শোষণ
অবিরাম এখন চাঁদেও

সারাটা জীবন দিগন্ত জুড়ে চাঁদ
মানুষের অফুরান কল্পনা
তাও আজ ঢেকে দিচ্ছে শোষক-বল্মীক...

শ ঙ্খ অ ধি কা রী

বাঁকা সোজা

রাস্তাটি বেঁকে গেলেও
আমি সোজা হয়ে হাঁটবার কথা ভাবি।
ঘোর অন্ধকার রাতে যদি কেউ বলে
"ঘরের কবাট খোলো আমি আলো দিতে এসেছি গো!"

চিতার আলোর কথা তখনই মনে পড়ে যায়
আর চৈত্রের সূর্যের কিরণের তেজ।

আজকাল সবাইতো স্নান না করেই
চির শুদ্ধ হতে চায়।
তাই বাঁকা রাস্তা ধরে সোজা হয়ে হাঁটতে গেলেও
অযাচিত ভয় পেয়ে বসি।

স জ ল ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

তাদের কথা আর ভাবিনা

যারা আঙুল তুলেছিল সেদিন
ভয় দেখিয়েছিল অস্ত্রের ঝলকানিতে
তাদের কথা আর ভাবিনা!

কালের স্রোতে তারা পথ হারিয়েছে।
আবার এসেছে আরেক দল
সেই একই অস্ত্র ..... একই ভয়
এরাও হারিয়ে যাবে একদিন
তাই এদের কথাও আর ভাবিনা!

আসলে মদিরা সেই একই আছে
পাত্রটাই যা বদলেছে কালে কালে
তাই ভয় পাইনা ..... মাথা ঝোঁকাইনা
তাদের কথা ভাবিনা আর।

জানি সবই হারিয়ে যাবে একদিন।

শ ঙ্ক র ঘো ষ

বকখালি

ফের নিদ্রা ভেঙে বহুদূর উড়ে চলে, ওড়ে
আর জ্বলে-যাওয়া মোমদেহ মারাশনি আলোয়
নৈঃশব্দের কার যেন ইশারায়
সৌমনা রাত্রিটি নগর ঘুরে
সোজা চলে গেল মিউজিয়ামের মমিটাকে দেখতে
আর দেখামাত্রই সে বুঝিয়ে দিল
অন্ত হারিয়ে যাওয়ার গ্লোবাল সুড়সুড়ি
অন্যদিকে নদী পুড়িয়ে জ্যোৎস্না কাব্যগ্রন্থে
ঈর্ষাময় ব্যাস্ততার ফাঁকে প্যারাডাইস টকিজ
শেফালি, জবাদের চাঁদে নিয়ে যাওয়া হবে
কন্ডোমগুলো রাখতে
আর, এদিকে বকখালির চালচিত্র ছুঁয়ে
গোটা কয়েক কবি তাকিয়ে থাকা ছাড়া
কি আর করে — হঠাৎ পেছনে ঘুরে দেখে
বাহান্নটা বাঘ নদী থেকে উঠে
ভাঙা ভাঙা আয়নায় নিজেদের দেখছে

প্র ভা ত কু মা র মু খো পা ধ্যা য়

ইত্তেলা

পুণ্যিভাব কখনোই পাবে না—পাপ, উল্টোদিক থেকে পড়লেও
রমাকান্ত কামার যেরকম,—ভাবলেশহীন, অবিচল, নির্বিকার, যথাপূর্বম
সরল বিশ্বাসের চোরকুঠুরিতে ভাড়াটে হয়ে আমাদের ঘরকুনো যাবজ্জীবন
আকাশকুসুমের খোঁজে বেলুনের—অমোঘ শূন্যতাপ্রিয়তাই : প্রেম
'পাত্র'-'দে, 'ধর'- 'মিত্র', 'মিশ্র'- 'মাল'- 'খান', 'লায়েক'-'সরকার',
'জানা-গুপ্ত-গুণ' : পাপ
সদম্ভে দাখিলা দিল প্রমাণসাপেক্ষ নাকি পবিত্রতার যাবতীয় নির্ঘোষ ঈশ্বরের মতোন,
লক্ষ করেছি অতিসামান্যই হেরফের, আই মীন, প্রবল মরুঝড়েও, মরুময় হয়নি পৃথিবী,
অনভিপ্রেত যদিও ফসলের ফসিলতা তালাবন্ধ গোলাঘরে, ধ্যুস রন্ধনপাত্রে বরং
পরিত্রাতা হয় পাবক, কাষ্ঠময় চিতায় মান-হুঁশ, আল্টিমেটলি
তো আমাদের ফ্রেমজ দহন। অতঃপর, নির্দিষ্ট অস্তিমতা, চৌচির স্মৃতি-কলস

নৃ পে ন চ ক্র ব র্তী

কত দুঃখ ছিলো মনে কতটা পাথর!

কত দুঃখ ছিলো মনে
কতটা পাথর!
কত দুঃখ জমা হলে অভিমানে
একা একা চলে যাওয়া যায়!

দুপুর স্টেশনে গেলে
এখনো বুকের ভিতর
ছুটে যায় দুরন্ত এক্সপ্রেস!

বুক পকেটে এখনো জড়িয়ে আছে
রোদ্দুরের ঘ্রাণ দোমড়ানো কাগজ
ও মৃত জোনাকির পাখা!

কারা যেন চশমাটা তুলে রেখে
শহর ছাড়িয়ে মিশে গেছে মানুষের ভিড়ে,
দেখা হলে শেষ কথা জানা হয়ে যেতো।

কণ্ঠ নালিতে কি তখনও তেষ্টা জমে ছিলো?
কখনো হলো না জানা
অন্ধকারে থেকে গেলো সব।

কত দুঃখ ছিলো মনে
কতটা পাথর!
কত দুঃখ জমা হলে অভিমানে
একা একা চলে যাওয়া যায়!

সো মা মু খা র্জি

অন্তর্লোকজাল

আমি এক মূষিক প্রসব করেছি
সে নিশ্চিন্তে নষ্ট করে
সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে রাখা সামান
ভবিষ্যতের লালিত স্বপ্নের প্রায় সবটাই
তার উদরস্থ

আমি এক মূষিক তৈরি করেছি
যে কুরে কুরে খায়
নতুন প্রজন্মের শিঁড়দাড়াটা
মুখ থুবড়ে পড়া তাই
স্বাভাবিক ঘটনা

দশমাস দশদিন নয়, দশ বছর ধরে
গর্ভে ধারণ করেছি তাকে
সে এখন আমারই মুড়ো চিবোয় নিত্য
রসিয়ে বসিয়ে খায়
আমার মাথা বিলুপ্তপ্রায়
তাই
বমনের প্রশ্নই ওঠে না।

অ ম রে শ বি শ্বা স
নবীনের প্রবীণ যাত্রা

মরমী কথাগুলো ছিন্ন হয়ে যায়
কাঁচা রোদ তা থেকে মুক্ত
শক্ত বাগযুদ্ধ ঠাওর হয়নি সকালে
আঘাত এলেও পাত্তা দেয়নি ভোর।

একদা বড়দের প্রাপ্য সম্মান
কিছু কি এখন পাতে পায় আদর্শ
আলেখ্য জোর কদমে ব্রাত্য থেকেছে
দায় কেবল নবীনের নয় ভেবে দেখার।
যাওয়ার বেলায় শুদ্ধ হয় মন
মানতে হবে শুদ্ধাচারীর নেত্রে
ওখানেই যত গন্ডগোল
কানাঘুষায় সেই কথাটি সঠিক।

তা প স মি ত্র
বুঝিনা বলেই এত পথ হাঁটা

বুঝিনা বলেই এত পথ হাঁটা
শৈশবে যারা সব ভোরের শিশির
তারা সবাই নিরুদ্দেশ
উড়ো মেঘ

তারপর ধীরে ধীরে সূর্য মাথার ওপর
কব্জিতে রোদ্দুরের ঘ্রাণ
প্রিয় বন্ধুরা
মনে হতো গাছের মত লতার মত
কত যে সন্ধ্যা নির্জন দুপুর
ভোরের স্বপন কোনদিন সত্যি হয়নি

এখন মেঘ নেই ছায়া নেই ধু ধু
স্বপ্নেরা এ পথে হাঁটে না ছড়ানো কাচ
ক্লান্তিরা শুধুই ভয় দেখায়
বুঝতে পারি না ঠিক কাকে খুঁজে চলেছি
আলো অন্ধকার
না কি যে বার বার ঠকিয়েছে স্বার্থপর

খ গে শ্ব র দা স
রাস্তা, দড়ি ও সাপ

রাস্তাগুলো যেন দড়ি, দীর্ঘ শুয়ে আছে
রাস্তাকে যেই দড়ি ভেবেছি
সাপ হয়ে নেমে গেল জলে
জলের অতলে এখন আমার বড় ভয়।

যত অভয় ঘোষণা থাক না
সাপের বিষে অবিশ্বাস
শুধু সাপ নয়
আজকাল ভাঙা রাস্তায় ভয়ের বাতাবরণ।

গলায় দড়ি অমঙ্গলের
মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা শুনব না
নয় কোন রাখঢাক
সাপ নয়, দড়ি নয়,
চলার অঢেল রাস্তা বিনির্মাণ।

ভ বা নী শং ক র চ ক্র ব র্তী
আলোকযাত্রা

অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি দেখো একবার
ভূতেরা দেখে না এসব বলেই
ভূতলের জনারণ্যে থাকে না তারা
আমরা মানুষ
আমাদের ভেতরে আলো অন্ধকারের লুকোচুরি
লুকোতে চেয়েছি যা কিছু
সেসব তো অন্ধকারেই

অন্ধ হয়েছে চোখ
দেখি না মন্দ-ভালো হিতাহিত
এ প্রলয়কালে

ডাক দিচ্ছে আলোর উৎসব
চলো ফুলেশ্বরী, শুরু হোক আলোকযাত্রা—

ছোটগল্প

অ নি ন্দি তা গো স্বা মী

গল্পগাছার গল্প

গল্পের উত্তরে একটা গল্প লিখবে ঠিক করেছে প্রিয়দর্শিনী।

বন্ধুরা বলল, মানে! কোন্ গল্পের উত্তর সেটা বলবি তো!

প্রিয়া কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলল, সেটা ধরে নে।

বিডন স্ট্রিটের একটা একতলা বাড়ির পশ্চিমদিকে একটা ঘুপচি মতো ঘরে ওদের আড্ডা জমেছে। নিনা, অলি, প্রিয়া আর রিক্তা। এপেল জুসের গ্লাসে একটা হালকা সিপ দিয়ে নিনা বলল, ধরে নেব মানে? এ কি তোর ক্লাস নাইনের বীজগণিত শিক্ষা যে প্রথমেই একখান এক্স ধরে নেব।

অলি বলল, আড্ডা যখন নিরামিষ তখন ওই ইস্কুল ইস্কুল ধরাধরিই ভালো। বললাম, ভদকা ফদকা আন। না সতী সাবিত্রী সব।

উঁহু। তা না। আসলে তাহলে আর নির্ভেজাল গল্পটা হবে না। যেহেতু ব্যাপারটা আমাদের কাছে একেবারেই স্বাভাবিক না। আমরা কেউই ঠিক অভ্যস্ত নই। তাই ওটা নিয়েই তখন আমরা এতো উত্তেজিত থাকব, যেন একটা শিকল ভাঙা গোছের কিছু। একটা বিপ্লব বিপ্লব ব্যাপার।

রিক্তা বলল, এটা এক্কেবারে ঠিক বলেছিস প্রিয়া। আমিও তাই চাইনি আজ আড্ডায় ওসব আয়োজন থাক। সে হবেখন। আমরা যদি এমন মাঝে মাঝে বসতে পারি তখন এমন আড্ডা জমতেই পারে।

অলি বলল, নেশাশক্তি যদিও আমার না পছন্দ।

প্রিয়া বলল, হ্যাঁ আমারও। তবে বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে এক আধ চুমুকে আমার ছুৎমার্গ নেই। সত্যি বলতে ভাই আমার ওই বিপ্লব করার জন্যেই ইচ্ছেটা করে, নচেৎ আমার ওসব লাগে না। আমি তো এমনতেই সব সময় নেশাতে আছি। হলুদ মাখা ঝিমঝিম।

নিনা বলল, নে অনেকক্ষণ দাঁত ক্যালাচ্ছিস। এবার বলত তুই ঠিক কোন্ গল্পের উত্তরে কী গল্প লিখবি?

ধৈর্য ধরো বৎস। ক্রমশ প্রকাশ্য। বলে বেশ একটু র‍্যালা নিয়ে তাকিয়ায় কাত হলো সে।

নিনা বলল, বেশ ইন্টারমিশনে আমি একখান গান ধরি। এটলিস্ট সেটা এক্স ধরার থেকে ভালো।

হুম, বেটার। গুরুগম্ভীর ঘাড় নাড়ল রিক্তা। হয়ে যাক।

চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল অলি। চোখের ওপর দু'হাত ঢেকে।

ওরা একটা ফরাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এই ঘরটা নিনার। সে একাই থাকে। শুধু একটি বছর সে বরের সঙ্গে কাটিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এসেছিল নিজের বাড়িতে। তখন অবশ্য মা বাবা ছিল। তারপর বাবা মারা গেল আর মা চলে গেল দাদার কাছে রৌরকেল্লা। মাঝে সাঝে এখানেও আসে। খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসে গান ধরলো নিনা। মাথাটা উর্ধমুখি। মরণ হতে যেন জাগি.. ধরাস করে লাফিয়ে উঠলো অলি,এই শালা না শুতেই মেরে দিলি।

নিনা বলল ন্যাকা ন্যাকা লাগছে না? কী গান ধরি বলতো?

চোখ মটকে রিক্তা বলল, অলি দিদিমণি কথাটা ভাবিয়া বলিলেন নাকি না ভাবিয়া?

সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে ভেবে নিয়ে অলি বলল, ওহ রিক্তা তুই পারিসও। শোন মরে মরে তো এক জন্মে তিন জন্ম দেখে নিয়েছি তাই কোনো মরামরিতেই আর সাধ নেই। ওই কথাটা শুনলেও এখন আমার হাড় মড়মড়ি ব্যারাম হয়। তুই অন্য গান ধর বাপু নিনা।

নিনা খাড়া হয়ে উঠে বসে চোখ বুঁজে গাইলো, যদি কিছু আমারে শুধাও কী যে তোমারে কবো।

এবার আর বাধা দিল না প্রিয়া। যে গাইবে তাকে কি বারবার বাধা দেওয়া চলে। অলিটা উজবুক। সব সময় ফাজলামি। রিক্তাও তথৈবচ। কিন্তু এই গানটা সহ্য করা প্রিয়ার পক্ষে খুব মুশকিল। কেমন একটা অসম্ভব কষ্ট হয় বুকের মধ্যে। মাথাটা

টাল খায়। নিনা অনেক স্মার্ট, লড়াকু মেয়ে। এসব কথা বলতে গেলে তাকে দেবে ধমকে। সে উঠে চলে গেলো বারান্দায়। তারপর ফোন নিয়ে খুব নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলো কারো সঙ্গে। উঁহু কারোর সঙ্গে না। ওটা আছিলা। পলায়ন প্রবৃত্তি।

গল্পটা সৌভিকের। যে গল্পটা এখন ভাবছে প্রিয়া। গল্পটা দেবকীর। এরা প্রিয়ার গল্পের চরিত্র। মিস্টার এন্ড মিসেস এক্স।

গান শেষ করে নিনা বলল, কীরে প্রিয়া কার সঙ্গে এতোক্ষণ হ্যাজাচ্ছিলি? সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার?

ডান কাঁধ সামান্য উঠিয়ে প্রিয়া বলল, হুম একেবারে হাবুডুবু।

রিক্তা বলল, এই সসেজ খাবি? নিনার ফ্রিজে আছে দেখলাম।

নিনা বলল, খাবি তো যা না ভেজে আন। অত জিজ্ঞাসা করার কী আছে। লোকে কীর্ত্তনের মধ্যে বাঁশের গাড়ি ঢুকায় আর তুই প্রেমের মধ্যে শুয়োরের গাড়ি ঢুকালি।

ও শুয়োর! লাফিয়ে উঠলো রিক্তা। দারুণ। আমি তো ভাবছিলাম মুরগা। চিকেন সসেজ ঠিক জমে না।

প্রিয়া বলল, এই যা ভাগ, এবার গালি দেব কিন্তু।

গালি দেবার জন্যেও শুয়োর পারফেক্ট, বলে ঠ্যাং তুলে একটা লাফ দিয়ে রিক্তা চলে গেল।

দু'হাতে মাথার ওপর তুলে আড়িমুড়ি ভেঙে অলি বলল, হুমম, প্রেমের জন্যেও। বঁধু মিছে রাগ কোরো না কোরো না

প্রিয়া পা ছড়িয়ে বসেছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। নিনা বলল, ক্যামেরার জন্যে তোর হাতে এখন একটু সিগারেটের দরকার ছিল। জ্বলন্ত। আগুনের সামনে ছাইটা পড়বে না। লেগে থাকবে।

প্রিয়া বলল, তুই ক্যামেরা ধরলে আমি সিগারেট ধরবো। বাতেলা রাখ। সব তো ডকে তুলেছিস। তবে কহনের লাগি একখান কথা ছিল, সবসময় স্টিরিও টাইপ ভাবিস না। এখানে সিগারেট না দিলেও চলে। পাঠক বা দর্শককে নিজের মতো কিছু বসিয়ে নেবার স্পেস ছাড়তে হয়। আমি হলে ওই না দেখাতাম ছাই, না দেখাতাই ওই না পোড়া অংশ। শুধু আগুনটা দেখাতাম ওই শুয়োরীর রান্নাঘরে। বলে হা হা করে হেসে উঠলো সে। স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে না বস! টাকা তো ওরাই ঢালবে।

এই তুই তো সত্যি ইউনিক আইডিয়া দিলি রে। আরে সবকিছু ডকে তুলেছি তো দেশ ছাড়ার জন্যে। শুধু সিটি বাজার অপেক্ষা।

বিড়ি জ্বালাই রে জিগর সে পিয়াতারাক তাকতাক, তারাক তাকতাক..ট্রে হাতে গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল রিক্তা। বলল, শোনো বস, বিদ্যা অন্নময়। নাও গেলো। নাহলে অতো আঁতলামি ধোপে টিকবে না।

ফর্কে বিঁধিয়ে একটা ধোঁয়া ওঠা সসেজের টুকরো মুখে ফেলে চোখ বুজে প্রিয়া বলল,আঃ! ব্যাপক।

রিক্তা বলল, টিউনিক বাঁচিয়ে লহ সরিষার সস।

নিনা বলল, তোর গল্পের কী হলো।

মুলতুবি। আগে খেতে দে। রিক্তা কিন্তু জমিয়ে দিয়েছে যাই বলিস। এই একটু কফি বানা না।

আরে তাতেই তো জমে যাবে। উরুতে চাপড় মেরে সোজা হয়ে উঠল নিনা। শুরু কর। শুরু কর।

প্রিয়া বলল, গল্পটা মজার। জীবনে এমন ঘোল খাইনি মাইরি।

কি রে, কি রে? কৌতুহলী চোখগুলো এগিয়ে এলো চারদিক থেকে। রিক্তা বলল, সামথিং ফিসি?

খুব চটুল জোকস থেকে কখনো কোনো গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করে দেখেছিস?

কীরকম, কীরকম?

আমাদের ছোটবেলায় শোনা সেই জোকসটা, মনে আছে, এক লোক তার এক গাদা ছেলেপুলে নিয়ে ট্রেনে চলেছিল তার অভাবের গল্প করতে করতে। তা উল্টোদিকের লোকটা ওই ভদ্রলোকের অত্তগুলা ছেলেপুলে কেন বলে বকুনি দিলে সে কী বলেছিল?

অলি চোখ গোল গোল করে বলল, কীইইই বলেছিল?

রিক্তা লাফ মেরে উঠে প্রিয়ার হাতটা তুলে নিজের মাথায় রেখে বলল, সেই জন্যেই তো সেই থেকে বসে আছি, কবে তোর সৃষ্টির হাত আমার মাথায় উঠবে।

নিনা বলল, পুরো শুটিংটাই পারাদ্বীপে করবো ভাবছি, পুরী থেকে কাছে হবে। জয় জগন্নাথ।

তাহলে তোর জাহাজ? হাত দেখিয়ে থামিয়ে রাখবি নাকি? কৌতুকে ভ্রু বাকাঁলো প্রিয়া।

নিনা বলল, অবশ্যই, ওই জন্যেই তো পারাদীপ। বন্দরও ছাড়লাম না, আবার হাতও ছাড়লাম না।

অলি বলল, তাছাড়া সর্বরকম জলোচ্ছ্বাস ক্যামেরাবন্দী করার সুযোগ। আহা। আমায় কস্টিউমস এর দায়িত্বটা দিস।

রিক্তা বলল, আর আমি তো ঘোষিত খাদ্যমন্ত্রী। নে শুরু কর।

প্রিয়া খানিকটা উদাসভাবে বলল, এক্স ধরে বলবো না সরাসরি?

রিক্তা বলল, সরাসরি। ধরাধরি পর্ব তো এতোক্ষণ চালালি, আবার কেন। তারপর ঝুপ করে কেমন চুপ করে গিয়ে বলল, অবশ্য তোর যাতে সুবিধা হবে তাতেই বলতে পারিস। ইচ্ছে না হলে নাও বলতে পারিস।

প্রিয়া বলল, দেবকী আর সৌভিক, বলে কিছুক্ষণ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা বলি, সরকারি যখন বলতে বললি তখন এই নাম দুটোও বাদ দিই? গল্পটা না আসলে আমার আর উৎপলের।

অলি কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, এই কফি ডেতেও বেহালা বাদন!

প্রিয়া বলল, আরে না। সেই জন্যেই তো বলছি এটা একটা জব্বর উত্তরের গল্প। শোন না ঘটনাটা তোদের ব'লে নি, পরে লেখার সময় ওই নাম দুটো বসিয়ে নেব।

বেশ। বলে চামচে সামান্য চিনি তুলে নিল অলি।

প্রিয়া বলল, শোন কেসটা। আরে লেখাপত্তর তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। যা টিপ্পনী উৎপলের। তারপর পড়ছেই বা কে। গাদা গাদা লিখেই আর কী হবে। গান শুনে আর ঘুমিয়েও তো দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। তা আমি লিখছিনা দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল উৎপল। ঝামেলা টামেলাও অনেক কম হচ্ছিল। আমি আমার সমস্ত পান্ডুলিপি জলে ভাসিয়ে দেব ঠিক করেছিলাম। না মানে এমন কখনোই ঠিক করিনি। ওটা জিন্দেগীতে পারবো না বুঝলি। ওটা গল্পে লিখব। চরিত্রের নামকরণের মতো।

নিনা বলল, লিখবি? বলছিস? অতিনাটকীয় হয়ে যাবে না?

রিক্তা বলল, না না থাক, ওটা একটু দরকার। তারপর?

তারপর দেবকী একদিন দেখলো সে যাই বলে সৌভিক তাই উড়িয়ে দেয়। বলে ও এখন গল্প লেখা ছেড়ে গল্প বলা শুরু করলে। আমার সব কথাই তার উদভট্ লাগে বুঝলি। আমি শত চেষ্টাতেও বুঝাতে পারিনি যে, যাক গে যাক। এ জা'গাটা একটু ঠিকঠাক করতে হবে। কী মুশকিল দু'জন দু'মেরুর লোক সারাজীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দিল, এর থেকেও উদভট্ কিছু হতে পারে? কিন্তু হলো।

হলো? রিক্তা বালিশ টেনে নিল কোলের ওপর।

হুম। পুরো ঘোল খেয়ে গেলাম।

অবজেকশন, অবজেকশন। উঠে বসলো অলি। তুই একবার ফাস্ট পারসেন একবার থার্ড পারসেন করছিস কেন। যা বলবি সেটা বল। হয় তুই তোর গল্প বল, নাহয় তোর চরিত্রদের।

আরে যাহা প্রথম তাহাই তৃতীয়। মানুষই তো মানুষের চরিত্র, মাঝখানে বসে তুই। তোর প্রেমিক বর, তাকেও গুঁজে দেব কোথাও। চিন্তা নেই। হ্যাঁ তা যা বলছিলাম,পান্ডুলিপি আলমারি বন্দী হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন এক প্রকাশক চেয়ে নিলেন। পর পর দুটো।

রিক্তা বলল, কেন? তোর আগের অতগুলো বই ছিল, সেগুলো কী হলো?

প্রিয়া বলল, আমার ছিল, আমার চরিত্রের ছিল না। হা হা, আসলে আগে ছিল তারপর বেশ কিছুদিন আর ছিল না। বাদ দে, গল্পে ফের।

নিনা বলল, তার মানে তুই এখন সরাসরি গল্পে সিফট করছিস?

প্রিয়া বলল, বলা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে চল, ভদকার আফসোস চলে যাবে।

চল মেরে সঙ্গ সঙ্গ, লে লে দুনিয়াকা রঙ, হো যা রঙ্গিলা রে। আয়িরে আয়িরে..কাঁধ নাচিয়ে দুলে উঠল রিক্তা।

প্রিয়া বলল, পুরো পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা তখন এই গানটা নিয়ে।

হুম, ঘাড় নাড়লো নিনা। নাচটাও।

ঠিক। দুর্ধর্ষ। নিনা বলল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের প্রত্যেকের চোখ। প্রিয়ার গল্প থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো ওরা সেই কবেকার উত্তম পুরুষে।

কত্তো যে গল্প ছিল বল? বেশ কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করার পর খানিক দম নিয়ে বলল, অলি। ফিরতে হবে। তোদের আর কি, সব তো কাছে কাছে। আর প্রিয়া বোধহয় আজ মায়ের কাছে থাকবি। শেষ কর তোর গল্পটা। উঠব। নিনা উঠে গিয়ে বলল, দাঁড়া,মিষ্টি মুখ না করে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ। তারপর প্লেটে সাজিয়ে আনলো ক্ষীরপুলি।

ওয়াও। চারজনেই একটা করে তুলে নিল। প্রিয়া বলল, আমি ওরফে দেবকী একদিন দেখলো একখানা চিঠি এসেছে প্রকাশনা দপ্তর থেকে। এক ওষুধ কোম্পানি তার প্রচুর বই কিনে নিয়েছে। যাব্বাবা কেন? প্রকাশককে ফোন করলে তিনি বললেন, তা তো বলতে পারবো না ম্যাডাম। তারপর সেই কোম্পানি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে তথ্য উঠে এলো তা দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। সেই কোম্পানির অন্যতম এম ডি এখন সৌভিক! সৌভিক কবে বদল করলো তার চাকরি সে জানেই না!

গল্পটা কি সত্যি? অলি জিজ্ঞাসা করলো।

প্রিয়া বলল, পুরোটা না হলেও কিছুটা। ওর কোম্পানি কোনো একটা অনুষ্ঠানে বই উপহার দেবার অনেকগুলো আমার বই কিনেছে। তারপর শিল্পের শর্ত মেনে অতিরঞ্জন।

রিক্তা বলল, ও তা তোর এটা কীসের উত্তরে কী গল্প?

প্রিয়া বলল, এটা হলো এক নম্বর গল্প। উত্তরের গল্পটা তো এইবার লিখব। এতো প্রেম ঠিক হজম হচ্ছে না। সারাজীবন বাগড়া দিয়ে এখন কেমন দয়া দয়া মনে হচ্ছে।

অলি উঠে পড়ে বলল, এই শোন ন্যাকামি করে আর কাঁদুনি গাইবি না। যথেষ্ট রসেবশে আছিস। চললুম রে।

হ্যাঁ চল উঠব আমিও। বলে উঠে পড়লো রিক্তাও।

যাই বলে ওরা জড়িয়ে ধরলো একবার একে অপরকে।

বাসের ঝাঁকুনিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল প্রিয়া। আসল গল্পটা বলে নি সে। একদম তৈরি করা গল্প নিজের বলে চালিয়েছে। কেন বলবে? আড্ডার শুরুতেই তারা আলাদা ঘরে শোয় বলতেই অলি এমন আশ্চর্য্য চোখে তাকালো যেন তার আর অলির মধ্যে মরুদ্দান আর মরুভূমির ব্যবধান। যা শালা বেদুইনের নাচ দেখ আর বিরিয়ানি খা। ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পয়সা পাচ্ছে না প্রিয়া টিকিট কাটার। একটা মজার গল্প লিখতে গিয়ে ঠিকমতো দানাই বাধাতে পারলো না সে কাহিনির। নেহাৎ উপকারী ছানার মতো ফেটে যাওয়া কিছু ফর্ম টর্ম আছে বলে বেঁচে গেল এ যাত্রায়। বাসটা কাঁপছে দেখো থরথর করে। যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত অবশ্যম্ভাবী। দাঁড়াতেই পারছে না। করে কি পুরো নিগম! রাস্তাঘাটের এমন বিচ্ছিরি অবস্থা! উৎপল কি জানে সে বারবার বারবার জেতাতে চেয়েছে উৎপলকেই।

রিক্তা কম্পিউটার জেনারেটেড ছোট্ট একটা কাগজের বিল কুটিকুটি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাঁটছিল। এতো কুচি করছিল যেন তা ধুলো হয়ে মিলিয়ে যায়। একটা কফি শপে মাত্র দু-কাপ কফি। এতো তৃপ্তি আর কখনো দেয়নি। সেদিনের থেকেও আজ যেন ধোঁয়া ওঠা সুগন্ধটা নাকে এসে লাগলো। উৎপলদাকে ডেকে নিয়েছিল সেই। আর বই কেনার বুদ্ধিটাও সেই দিয়েছিল। আর তাকে নিযুক্ত করেছিল সেই প্রিয়ার গল্পের মিস্টার এক্স। তবে হ্যাঁ, প্রিয়া যেটা জানে না সেটা হলো মস্তিষ্কের ভেতরের গল্প। ওই একটু টোকাতেই ওপরের মলিনতাটুকু সরে গিয়েছিল উৎপলদার। সে সত্যিই খুব খুশি হয়েছিল প্রস্তাবে।

সবাই বেরিয়ে গেলো। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে কফির কাপ, ফেলে রাখা ট্রে, নিচু হয়ে সেসব গুছাচ্ছিল নিনা। মই বেয়ে মেঘ ধরতে উঠেছিল যে বিচ্ছু, সে নেমে এসে বলল, ডান। দিদি রাতের মধ্যে তোমায় পাঠাচ্ছি।

নিনা বলল, হ্যাঁ যা। বাড়ি গিয়ে ল্যাদ খাবি না কিন্তু।

না না। বলে বেরিয়ে গেল সে।

নিনা বেসিনে বাসনপত্র নামিয়ে রেখে এসে মোবাইল ফোনে তাদের আড্ডার ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে

হাসলো। যা সাবধানে বাড়ি যা সব। প্রিয়া তুই যে গল্প লিখছিস লেখ, সে গল্প নিয়ে বিলম্বে ভাবা যাবে আপাতত আমাদের আড্ডার গল্পগাছা জাহাজে চাপছে। হুম রে। বাস্তবিকই আমি সব ডকে তুলছি।

অলি বাড়ি এসে একবার ঘাড় উঁচু করে তাকালো তার তুলে রাখা তানপুরাটার দিকে। রাতে তার বর বলল, কী হলো, আলো নিভিয়ে দি?

অলি বিরক্ত হয়ে বলল, কেন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি পড়ছি?

তার বর সোহাগ করে তার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, হুম, অরুচি? হেবি খাওয়া দাওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে আজ পার্টিতে?

অলি বলল, উঁহু আমার বন্ধুরা বেশি খায় না। শুধু আমি বেশি খেয়েছি, বোকার মতো। খেতে খেতে কোলা ব্যাঙের মতো হয়েছি। আর তোমার সংসারে গ্যাঙর গ্যাঙ করেছি। এককালে আমিও যে পড়াশোনা করতাম, এবং ওদের থেকে কমও করতাম না,আজ ওদের আড্ডায় আমার তা মনে হলো না। বেশি ঘি খেলে ক্ষুধামান্দ্য হয়, আমারও তাই হয়েছে, বলে সে উঠে চলে গেলো অন্যঘরে। বাহ! কী চমৎকার তাদের এই বসবার ঘরটাও। কত্ত জায়গা। এটা কি তাদেরই বাসা! কেমন যেন অচেনা লাগছে। দুপাশে দুহাত;হাতে ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল, হুম মন্দ নয়। আলো নিভিয়ে দিলে এতো মহাকাশ!

কবি সুচরিতা চক্রবর্তী
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

ভাবনা ২০১৪

তবুও তৃষ্ণা ২০১৭

বিষণ্ণ পাখির ডানা ২০২১

গান বাঁধো বাউলানি ২০২২

এসো মুমূর্ষু এসো আত্মীয় স্বজন ২০২৩

নি খি ল ম ন্ড ল

দক্ষিণ রায়

"এই বুদে শোন, বাবু ডাকতেছে।" কথাটা কানে গেছে বুদের। সে একবার আড়চোখে মাছের আড়তঘরের দিকে তাকায়, ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিমলকে দেখে, তার অপর পাশে মনা। তারপর কী মনে করে আড়তের দিকে এগিয়ে যায়। আড়তঘরে মাঝবয়সি নাদুস-নুদুস চেহারার নিবারণ ঘোষ একটা মোড়ার উপর বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে আড়তদার বলল, "আয় বুদে, তোরে ডাকেলাম। বলতেলাম আমার দাদনের—"হঠাৎ বুদে চেঁচিয়ে ওঠে, "দক্ষিণ রায় আসবে। দক্ষিণ দেশের রাজা। তেখন ক'নে থাকবে তোমার দাসনের ট্যেকা?"

বুদের এমন স্বভাবের কথা সবাই জানে। বনে মধু কাটতে গিয়ে চোখের সামনে বিশুকে বাঘে টেনে নিয়ে যেতে দেখে সেই যে "দক্ষিণ রায়-দক্ষিণ রায়" বলে চেঁচিয়ে উঠল, সেই ভাব আর গেল না। সেদিন সে নৌকায় দাঁড়িয়ে স্বগত-উক্তির মতো বলেছিল— দক্ষিণ রায় যারে নেয়, তারে একেবারেই নেয়। পেটডা চিরে তার রক্ত খায়। পাপের বোঝা ভারি হলি তারে টানে নেয়। বাঘটি চলে গেছে বুঝে বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন বিশুর দেহ উদ্ধার করা হলো, দেখা গেল তার টুটিতে বাঘের দাঁতের দাগ আর পেট ফালা-ফালা করে চেরা।

সেই থেকে বুদের অন্যধারা। কথা কম বলে, যখন লোকজন বিরক্ত করে তখন চেঁচিয়ে ওঠে, "দেখবি দক্ষিণ রায় আসবে। দক্ষিণের রাজা। বন কাটে বসতি বানাইছিস তাতে পাড় পায়ে যাবি? এটাও তার রাজ্যি। অন্যায় করলি সবকটারে পেট চিরে ফ্যেলবে"— কথাগুলো বলতে বলতে তার মধ্যে যেন কেমন পরিবর্তন হতে থাকে। চোখ-মুখ দেহ পাল্টাতে থাকে, ক্রমে হিংস্র হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন এই মুহূর্তে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা শক্তসমর্থ শরীরের ছাব্বিশ বছরের যুবক বুদেকে তখন কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

বুদের আসল নাম ভূদেব মাঝি। বাবার নাম বলরাম মাঝি। ভূদেব মাঝি যে কী করে বুদে হলো সে জানে না। জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছে লোকে ওই নামে তাকে ডাকছে। অবশ্য বাবার আদরের ডাক পাগল। তা সেই বাবা বলরাম মাঝি কতদিন আর ডাকতে পারল। বুদের যখন বছর দশেক বয়স জঙ্গলে গিয়ে আর ফিরল না। সেবার ওই বিশু অন্য দু'জনকে নিয়ে বলরাম মাঝির সঙ্গি হয়েছিল। লোকে বলে বলরে বাঘে টেনে নে যাইনি, তার মৃত্যুর পিছনে আড়তদারের কারসাজি ছিল। অন্যায় দেখলি বলরাম মাঝি যে আড়তদারেরও ছাড়ে কথা বলত না।

বুদের বাবা কিছু টাকা নাকি আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নিয়েছিল। সংসারে অভাব, প্রতি সাঁজে ভাত জোটে না। শেষে ছয় মাস যেতে না যেতে বুদের মা আড়তে কাজ নিতে বাধ্য হলো। মাইনের থেকে খাই-খরচা বাবদ টাকা কেটে বাকি টাকায় দাদনের টাকা শোধ হবে। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই বুদের যুবতী মা গর্ভবতী হয়ে পড়ল। আড়তদার তাকে অ্যাবরসন করিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু সে তখন অর্ধ-উন্মাদ। আড়তে এসে মাঝে মাঝে আড়তদারের দিকে ছুটে যায়। বলে, এই হচ্ছে গে, বনের বাঘ। বুদের বাবারে খ্যায়েছে, আর আমার শরীরের রক্তটা চুষে নেছে। হাড়গোড়গুলো পড়ে আছে। তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে আড়তদারের দিকে। আড়তদারের লোকজন তখন তাকে ধরে পিঠে দু-চার ঘা কষিয়ে জেলেপাড়ায় দিয়ে আসে।

আস্তে আস্তে বুদের মা অনেকটা স্বাভাবিক হলো। সে এখন নদীতে থোপা ফেলে কাঁকড়া ধরে, নদীর চরের পাঁক ঘেটে গুলেমাছ ধরে রান্না, বাড়ির কাজ সবই করে। নিজের মনে বিড়বিড় করলেও একমাত্র বুদে ছাড়া কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না।

বুদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আড়তদার বলল, 'খ্যায়ে না খ্যায়ে চেহারা খানডা তো বাবার মতো তাগড়াই বানাইছিস। তা কাজে লাগা। এদিকি যে বাবার দাদনের টাকা বাড়তি বাড়তি এক কাঁড়ি। মা-ডাতো বছর ঘুরতি পাগল। আর তুই কয়েকবার বনে যাতি না যাতি চোখের সামনে যেই একজনেরে বাঘের পেটে যাতি দেখলি, অমনি নেতিয়ে পড়লি। জেলের ছাবালের অত ভয় পালি চলে?'

বুদে বড় বড় চোখ করে একবার চারপাশ তাকালো। তার ঝাঙড়া এক মাথা চুল, মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ, দুই হাতে লম্বা লম্বা নখ, চোখ লাল। খসখসে ভারী গলায় বলল, 'দক্ষিণ রায় আসবে আড়তদার। তোমার পাপ কাজের সাগরেদ ওই বিশুরে শাস্তি দেছে। তার পেট চিরে রক্ত খায়েছে। এবার তোমাগো পালা। পালাও পালাও—' বুদে উঠে পড়ে।

তার মার উপর অত্যাচারের কথা সে লোকজনের কাছ থেকে শুনেছে। সে কথা মনে পড়তে তার সারা শরীর রাগে জ্বালা করে ওঠে। দেহেও যেন কেমন পরিবর্তন হতে থাকে। সে দৌড়ে নদীর ভেড়িতে ওঠে। ছোট নদী, ওপারে জঙ্গল-সুন্দরবন। বুদে নদীর চরে নেমে পড়ে। হাতগুলি মাটিতে দিয়ে চার হাত-পায়ে বাঘের মতো রাজকীয়ভাবে চলতে থাকে। মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ। দু'চার জন যারা রাস্তা থেকে দেখল তারা বলল— পাগলের কান্ড, মাথাটা এক্কেবারে উল্টিয়েছে।' কিন্তু বুদে বুঝতে পারে তার শরীরের কেমন পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে এখন একটা বাঘে পরিণত হয়েছে। তবে কি দক্ষিণ রায় তার শরীরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। পূর্বে এমনি আরও কয়েকবার ঘটেছে। দিনে নিজের কুঁড়ে ঘরে ঘুমালেও একটু রাত হতে সে বেরিয়ে পড়ে। তখন মাঝে মাঝে তার শরীরটা যেন এক বাঘের শরীর হয়ে যায়। প্রথম এমন ঘটেছিল মাস সাতেক আগে জঙ্গলে বিশুকে বাঘে ধরার সাত দিন পর এক রাত্রে। সেই থেকে বুদে রাত্রে সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়। নদীর চরে বাইন, গেঁয়ো, ক্যাওড়া গাছের ভিতর দিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে তার শরীরের ভিতর আস্ত একটা বাঘ ঢুকে পড়ে।

গভীর রাত্রে জেলেপাড়ার মানুষরা বাঘের ডাক শুনতে পেল। ভয়ঙ্কর সে ডাক। সে ডাক শুনে ঘরের ভিতর শুয়ে থাকা বাচ্চা-বুড়ো সবাই কেঁপে কেঁপে উঠল। তারা বুঝল, নদী পেরিয়ে বাঘ চলে এসেছে। এইসময় তো তাদের আসার সময়। এখন মাঠ ভর্তি উঁচু ধান গাছ। বাঘ ঐ ধান খেতের ভিতর দিকে লুকিয়ে থাকে আর রাত্রে কুকুর অথবা গৃহস্থের ছাগল, গরু ধরে খায়। সুযোগ পেলে মানুষকেও ছাড়ে না। পরদিন থেকে সন্ধ্যার আগেই সবাই ঘরে ঢুকে গেল। নিবারণ ঘোষের আড়তও সন্ধ্যার আগেই বন্ধ।

আড়তদারসহ জেলেপাড়ার লোকজন বেশ ভয়ে ভয়ে আছে। রাত্রে বাঘের ডাকটা এই পাড়ার কাছাকাছি শোনা গেছে। নিবারণ ঘোষের বাড়ি দূরের পাড়ায়। কিন্তু সারা দিনটা তাকে জেলে পাড়ায় কাটাতে হয়। জেলেদের দাদান দেওয়া আর তাদের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করে ক্যানিং চালান দেওয়াই তার ব্যবসা।

বিশু বাউলে লোকটা ভালো ছিল। সেও সাত-আট মাসে আগে বাঘের পেটে গেল। আড়তদারের খুব প্রিয়। কত কাজ তার করে দিয়েছে। তাই বলে দাদনের টাকা তো ফেলে রাখা যায় না? তাছাড়া বৌটারও বা চলবে কী করে? কোলে আবার একটা বাচ্চা ছেলে। আড়তদার তাকে কাজ দিল। সকালে এসে আড়তের এটা-ওটা কাজ, আড়ত বন্ধ হলে ঘরে ফেরা। কাজে আসার সময় শাশুড়ীর কাছে রেখে আসে বাচ্চাটা।

আড়তের ছোট ঘরটি আড়তদারের বিশ্রামের ঘর। সেই ঘরের খাটের উপর বসে আড়তদার বিশুর বৌকে জড়িয়ে ধরল। বিশুর বৌ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার স্বামীরে বাঘে খ্যায়েছে। আড়তদার তুমি আমারে খায়ো না। আমার এটডা ছোট ছাবাল আছে, তোমার দুটি পায়ে পড়তিছি।"

আড়তদার চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ কর ঢ্যেমনি। দাদনের টাকা শোধ হবে অমনি-অমনি। এই আড়তে ঢুকলি কেউ ছাড়া পায় না। বেশি বাড়াবাড়ি করলি-তোর ছাবালডারে নে নদীতে ফেলে দ্যেব।"

কথাটা শুনে থমকে যায় বিশুর বৌ। তার সব প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে যায়। একটা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আড়তদার তার দেহের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলে খাটের উপর শুইয়ে দেয়। নিজেও দেহের সব জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়ে বিশুর বৌএর বুকের উপর। শীতের বিকাল, দু'জনের গায়ের উপর টেনে দেয় একটা লেপ।

আর তখনই ঘরে প্রবেশ করে বুদে। সে আড়তের বাইরে থেকে বিশুর বৌ-এর কান্না শুনতে পেয়েছে। এখানে ঢোকার সময় মনা ও বিমল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ধাক্কা মেরে তাদের সরিয়ে এখানে চলে এসেছে। এখানে এসে এই দৃশ্য দেখে তার শরীরটা রাগে জ্বালা করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহেরও পরিবর্তন হতে থাকল।

আড়তদার চেঁচিয়ে উঠল, "তুই এখানে কেন? এই মনা বিমল—"

এসব কথা বুদের কানে গেল না। আড়তদার দেখল বুদের মুখটা যেন বাঘের মুখের আকার নিচ্ছে, চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মতো জ্বলছে। বুদে চার হাত পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের মতো হুঙ্কার দিল। আড়তদার চেঁচিয়ে উঠল, "দক্ষিণ

রায়—দক্ষিণ রায়, বাঁচাও—আমারে বাঁচাও—”

বুদে চার হাত-পায়ে লাফিয়ে উঠল খাটের উপর। বিশুর বৌ আগেই খাটের থেকে নেমে, মাটিতে পড়ে থাকা তার শাড়ি ব্লাউজ তুলে নিয়েছিল। এবার কাপড়টা গায়ে জড়াতে জড়াতে বাইরে এসে চেঁচাতে থাকল, দক্ষিণ রায় আয়েছে গো-বাবা দক্ষিণ রায় আয়েছে—’

মনা ও বিমল পাড়ায় গিয়ে সংবাদ দিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে লাঠি, বল্লম, দা নিয়ে একদল মেয়ে পুরুষ আড়তের গেটের সামনে জড়ো হল। কিন্তু বৌটির কথা শুনে কেউ ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেল না। অল্প পরেই চারপায়ে রাজকীয় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল বুদে। তার সমস্ত মুখে রক্ত। গেটের পাশে এসে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার দিল। ঠিক যেন সুন্দরবনের বাঘের হুঙ্কার। সেই হুঙ্কার শুনে সবাই দূরে সরে গেল। বুদে চারপায়ে বাঘের মতো রাজকীয় ভঙ্গিতে ধীরে নদীর দিকে এগোতে থাকল। তার থেকে বেশ কিছু দূরত্ব রেখে জমা হওয়া লোকজনও এগুলো।

আড়তের ভিতরে ঢুকে মনা ও বিমল দেখল আড়তদারের দেহে কোনো জামাকাপড় নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। তার টুটি-ছেঁড়া আর পেট চিরে নাড়ি-ভুড়ি বার করা। তারা সেইকথা ছুটে এসে জানালো রাস্তার উপরের লোকজনকে। নারী-পুরুষ মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, “ওরে বাবা দক্ষিণ রায় নেছে।”

দক্ষিণ রায় সামনে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার পরনে হলুদ হাফ প্যান্ট আর লাল হাফ হাতা মোটা গেঞ্জি। কেউ কেউ বলল, “দেখ, মানষির মধ্যি বাঘ, মানষির মধ্যি দক্ষিণ রায়।” কয়েকজন আবার বলল, “এই দক্ষিণ দেশ তেনার রাজ্যি। তাঁরে কি শুধু বনে থাকতি হবে?”

দক্ষিণ রায় এগিয়ে গিয়ে নদীতে নেমে পড়ল। সাঁতরে জঙ্গলের পারে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে জল ঝাড়ল। এবার অপরপারে নদীর চরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে ফিরে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার দিল। শীতের শেষ বিকালের মৃদু আলোয় অনেকেই স্পষ্ট দেখল, কোনো মানুষ নয়, দাঁড়িয়ে বৃহৎ এক বাঘের শরীর। মেয়েরা উলুধ্বনি দিল, শাঁখ বাজালো। বেশ কয়েকজন ভক্তিভরে করজোড়ে গেয়ে উঠল—

“সাগরসঙ্গম সুন্দরকায় শার্দুলবাহন দক্ষিণ রায়।

পঞ্চবকত্র সাবিত্রী হস্তে সংকটতারণ দেব নমহস্তুতে।।”

স ন্ধ্যা দা স

ভূষণের পারাপার

"দাদা আর কতক্ষণ নৌকা বাইবি? এবার কোথাও দাঁড়া। খেয়ে নে দু'মুঠো। সেই ভোরের আগে বেরিয়েছিস।" সুরভী নৌকার ভিতর থেকে বলে।

ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের শেষ। নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে নোঙর করে নৌকার খোলে চলে এলো ভূষণ।

"ঠিক বলেছিস। আর আমাদের নাগাল পাবে না। এ হলো ভূষণের নৌকা। একে টেক্কা দেওয়া সহজ নয়। চটপট দে দেখি কাঁচা পেঁয়াজ আর পান্তা। তুইও নিয়ে আয়। একসঙ্গে খাই।"

দুই ভাই বোনে তৃপ্তি করে খায়। সুরভী বলে, "একটু এবার জিরিয়ে নে দাদা, তারপর আবার নৌকা বাইবি।"

ভূষণ ঘাড় নাড়ে। বলে, "না, জিরোবার সময় নেই। বেলা প্রায় এগারোটা। এতক্ষণে বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে আমাদের না দেখতে পেয়ে। ওরা যদি তিন চারজন নৌকা নিয়ে আসে ধরে ফেলবে। অবশ্যি আগে তো বুঝবে বিষয়টা!! ততক্ষণে আমরা পগার পার!"

সুরভীর চোখে জল এসে যায়। "বাবা তো এবার আর তোর মুখ দেখবে না। আমার ভয় করছে রে!"

ভূষণ বলে "তোকে অত পাকামো করতে হবে না। রহিম চাচার সঙ্গে সব বলা আছে। সোনারপুর থেকে একেবারে কলেজের হোস্টেলে। কেউ টের পাবে না। আপাতত রহিম চাচা তোর পড়ার খরচ সামলে দেবে। পরে আমি সব ব্যবস্থা করব।"

আর একটু পরেই নৌকা মাতলা ধরে ক্যানিং ঘাটে এসে গেল। রহিম চাচা ঘাটেই ছিল। সুরভীকে কাকার হাতে দিয়ে নৌকা ঘোরালো ভূষণ লাহিড়ীপুরের দিকে। ওখানেই ওদের ঘর। মা-মরা ভাই বোন, বাবা জ্যাঠারা থাকে। জমি কিছু ছিল নিজস্ব। ভালোই চলছিল। ভূষণ বাবার সঙ্গে জমির কাজকর্ম করত। ওকেই তো এসব দেখতে হবে। তাই মাধ্যমিকের পর আর ভর্তি হয়নি স্কুলে। বোনটার লেখাপড়ায় মাথা ভালো। হু হু করে গ্রামের স্কুলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এক চান্সে পাশ করল। বাবা—জ্যাঠারা বলল, "আর পড়তে হবে না। গ্রামে তো কলেজ নেই। বাড়ির কাজকর্ম শিখুক। সামনে বছর বিয়ে দিয়ে দেব।"

সুরভীর পড়ার খুব ইচ্ছা। ওর কান্না দেখে ভূষণ বলল, "কাঁদিস না, আমি দেখি প্রধান কাকা রহিম চাচাকে ধরে কী করতে পারি।"

ওর ভাগের সম্পত্তি রহিম চাচাকে লিখে দেবে এই মর্মে সই করে সে এই ব্যবস্থা করেছিল।

ভূষণ যখন বাড়ি ফিরল দেখল বাড়ির সবাই মিটিং বসিয়েছে। ও বড়দের বিরুদ্ধে গেছে। ওকে পৃথক করে দিল ওর বাবা সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে। মা নেই। এক বিধবা কাকিমা বলল, 'আমার কাছে খাবি তুই।' সেই থেকে বাবার সঙ্গে পৃথক হয়ে পরের জমিতে কাজ করে দিন যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কলকাতা এসে বোনকে দেখে যেত। সুরভী ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ছে। আর কিছু দিন বাকি।

এদিকে এ বছর মারাত্মক ঝড়ে খুব ক্ষয়ক্ষতি হলো। নদীর বাঁধ ভাঙলো। চাষ ডুবল। পরের জমিতেও কাজ নেই। কতদিন আর এভাবে চলবে! পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সাথে কেরালায় যাবে ঠিক করল। কিন্তু বোনকে বলল না।

রাত আটটায় ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে বসে খুব মন খারাপ করছিল। তন্দ্রা এসে গেছিল। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো "ট্রেন দিচ্ছে।" ঘোরের মধ্যে ভূষণও ওদের সাথে চোদ্দো নম্বরের দিকে পা বাড়াতেই টান পড়ল জামায়। ভুল ভাঙলো টানটা চেয়ারের কোণায় জামাটা আটকানো দেখে। করমন্ডল এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল। যদি একবার বোনটাকে দেখতে পেত!

খবরটা রহিম চাচা ঠিক সময়ে সুরভীকে দিয়েছিলো! কিন্তু রেজাল্ট বেরোলো ও চাকরিটা তখনও পায়নি। তাই স্টেশনে আসেনি সুরভী।

ততদিনে ও কয়েকটা টিউশন পেয়ে গেছে। কোচিং নিয়ে পেয়ে গেল চাকরি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিয়ে। নবান্নে পোস্টিং। রহিম চাচার মাধ্যমে জোগাড় করল ভূষণের ঠিকানা।

মাস চারেক হয়েছে। ভূষণ এখন মুন্নারের চা বাগানে কাজ করে। একদিন বিকেলে ম্যানেজার ডাকল। ভূষণ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখতে পেল সুরভীকে। বিস্ময়ে বলল, "বোন তুই ?" কি করে এলি ? একা নাকি রহিম চাচা এসেছে? সুরভী বলল "নারে দাদা, একাই এসেছি তোকে নিয়ে যেতে। এই দেখ আমার চাকরির চিঠি। ফিরে চল।" আমরা এখন থেকে একসাথে থাকবো আমাদের শহরে। বাবাও থাকবে আমাদের সঙ্গে।

ম্যানেজারের সামনে ভূষণ বোনকে জড়িয়ে কেঁদেই ফেলল আনন্দে।

নি র ঞ্জ ন ম ণ্ড ল
ঘেরপাড়ার তারা দাসের কথকতা

আজ সকাল থেকে রোদের তেজটা বাড়ছে। বেলায় আরও বাড়বে। ভরা চৈত্র মাস। তারামুচি ছোটো নৌকো নিয়ে ঘেরপাড়া থেকে নদীতে গাঙবাতাড়িতে বেরিয়েছে। ডিঙি নিয়ে নদীতে ঘুরে, ভেসে যাওয়া গরু ছাগলের মৃতদেহ সংগ্রহ করে। এরপর ঘেরপাড়ায় নদীর চরে গর্ত করে মড়া গরু ছাগলের হাড়গোড় জমিয়ে রাখে। কয়েকমাস পরে মরা পশুর হাড়গোড় নিয়ে কলকাতায় বিক্রী করে আসে। তারা রামনগর গ্রামে বিদ্যার চর ঘিরে বসবাসের জায়গা করে নিয়েছে। ও জাতিতে মুচি, ছোট জাত। ওদের পদবি, কেউ 'ঋষি', কেউ 'দাস' লেখে। ওরা জাতগুষ্ঠিদের নিয়ে এই ঘেরপাড়ায় ছোটো ছোট নাড়ার ঘর বেঁধে বাস করে। ওদের মধ্যে যারা বিয়ের পালকি বয়, তারা কাওরা, যারা বাঁশ, বেতের কাজ করে তারা ডোম।

আজ নৌকোয় তারা ছেলে খোকনকে সঙ্গে নিয়ে রামনগরের ছোট দোয়ানি বেয়ে বিদ্যার গাঙে নৌকো নিয়ে সোজা বড়মোল্লাখালির দিকে যাবে। সবে জোয়ার লেগেছে, সামনে কচুখালি, রাধানগর, বড় মোল্লাখালির তিন গাঙের মুখ। এখানে খেয়ার পাটনি পেতমের নৌকোর সামনে হরেনের নৌকো এসে গেল। তারা বলে, 'কেরাম আছ পেতম, ত্রিমুনির খ্যায় আয় উন্নতি হচ্ছে? আমি তো ছাবাল নে গাঙবাতাড়ি বারুইচি। দেখি গরু, মোষের মড়া-টরা কপালে জোটে কিনা।'

'ঠিক বুলেছ তারাদা, আমাগ সবার ফুটো কপাল, তায় আবার ছোট জাত। বাজারঘাটে সব জিনিসির দাম বাড়ে। আমাগো খ্যার আর পয়সা বাড়ে না। পার্ঠির মেম্বারগো বুলে বুলে হয়রান হচ্ছি। কেউ কুনও কথা শোনে—থাইকে লোকে ট্যাক্টর, পাওয়ার টিলার দে জমি চষে। গরু মোষ পুষলি অনেক খরচা। মাইনের লোক শীত বর্ষায় মাইনে দে চাষ করতি হয়। ধানের দাম এত বাড়ছে তবু ওতে ওগো কুলায় না। ফসল উঠলি পাটনির পাওনা ধান চাইতি গিলি ওরা অপারক হয়।

পেতমের কথায় হরেন বলে, 'ঠিক বুলেছ, নৌকো বাওয়া, চামড়া কাটা, লোকের পুজোপার্বণ, বের আনুষ্ঠানে বাজাতি যাওয়া, পালকি বওয়া, সব ছোটলোকের কাজ। এ সব কাজ কুরে নাম নি। শুধু কথায় কথায় মান অপমান করা। আর বছর বছর বুড়ি বন্যে, ঝড়ে লোকের ক্ষতি হুয়ে, আর গরু, ছাগল পোষা কুমিয়ে দেছে। তাই গাঙবাতাড়ি গে আর সে রকম মড়া-টরা কপালে জোটে না। বাড়ি বুসে না থাইকে, প্যাটের জ্বালায় বাপ বেটায় নৌকো নে বারুইছি।'

পেতম নৌকো নে রাধানগরের পারে যায়। তারার নৌকো তারানগরের দিকে এগিয়ে যায়। বিদ্যার দু পারে গেমো গরানের সবুজ জঙ্গল। কোন পাড়ে ভয়ানক নদীর ভাঙন। গাছপালা সমেত পাড় ভেঙে রায়তি জমি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। তারপর ধানজমি ঘিরে রিং বাঁধ ওঠে। এভাবে কত লোকের জমি জমা চলে গিয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কোনো পারে বিশাল চর জেগে ওঠে। জোয়ার ভাটায় পলি পড়ে সেই চর উচু হয়, গেমো, বাইন গাছ গজিয়ে ওঠে, ধানিঘাসে চর ভরে যায়। বাটাং, বক, বালিহাঁস ওড়া- উড়ি করে। এভাবে এ কুল ভেঙে ওকুল গড়ে, নদী তার প্রবাহমান ধারায় এগিয়ে চলে।

নৌকোয় খোকন ওর বাবাকে দূরে হাত দিয়ে দেখায়, 'দেখ, ওই বাঁদিকি ভাঙন কুলে, জলে গাছের ডালপালার গায় এক মড়া মনে হয় বাঁইধে আছে। নৌকো বাঁদিকি ঘোরাও,উকেনে গে দেখি, মড়াটা গরু না ছাগল?'

তারা নৌকো নিয়ে মড়াটার কাছে যায়। দেখা যায়, একটা মরা গরু আটকে আছে। এবার ছেলেকে নিয়ে গরুর ঠাং ধরে টেনে তোলে। তারা নৌকোটা গাছের গায় বাঁধে। ছেলেকে বলে, 'গরুটা চিত কুরে নৌকোর মধ্যে ধুরে রাখ। আমি ছুরি দে গরুর চামড়া কাটি। চামড়া কাটতি গে এট্টু এদিক ওদিক হলি, চামড়ায় খুঁত হবে, আর দাম কুমে যাবে।' তারা অভিজ্ঞ হাতে ছুরি চালিয়ে চামড়া নিখুত ভাবে কাটে। এর পর চামড়া ভাজ করে নৌকোর এক পাশে রাখে। ছাল ছাড়ানো গরুর হাড় সমেত মাংস নৌকোয় থাকে। মাংসের লোভে দু-একটা কাক নৌকোয় বসে। মাথার উপর অনেকগুলি শকুন উড়তে দেখা যায়। ওদের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল। দূর থেকে মড়ার গন্ধ পায়। ওরা নৌকো নে আরও কিছু দূর গিয়ে মড়া ছাগল, মরা বাছুর ও পায়।

তারার ছেলে বলে, 'বাবা এবার ফিরতে হবে। এই চামড়া লবন দে রোদি শুকাতি হবে। চলো এই ভাটিতে ফিরে যাই।

তারা এবার নৌকো বাড়ির দিকে ঘোরায়। শকুনগুলো ওদের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এগিয়ে যায়। নৌকো চরে লাগিয়ে মড়াগুলো দুজন মিলে টেনে নদীর চরে ফেলে দেয়। ভাঁজ করা চামড়াগুলো নৌকো থেকে নামিয়ে ঘের পাড়ায় নিয়ে আসে। শকুনগুলো আকাশ থেকে নীচে নেমে ছাল ছাড়ানো মড়া গরু, ছাগল থেকে মাংস ওদের ধারাল ঠোট দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে খায়। মুচিপাড়ার একদল কুকুর ও মাংসের লোভে মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শকুন-কুকুরগুলো মাংস খাওয়া হয়ে গেলে খোকন লাঠি হাতে তাড়িয়ে দেয়। কারণ কুকুর হাড় মুখে করে পালাতে চায়। এবার পড়ে থাকা হাড়গোড় চরের গর্তে ফেলে দেয়। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে তারা চামড়াগুলো উঠোনে মেলে দেয়। এর উপর লবন ও চামড়া ট্যান করা নানা রকম গুঁড়ো ছড়ায়। এখন রোদের যা তেজ, দুদিনে চামড়া ট্যান হয়ে যাবে। এরপর কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য পাঠাবে। এভাবে চামড়া, মরা জীবজন্তুর হাড়গোড় বেচে তারা দাস সংসার চালায়।

তারা যাত্রার দলের ব্যন্ডপার্টিতে ভাল ফুলেট বাঁশি বাজায়। রাত্রে শেখায় আর ছেলেকে বলে, 'এই সব বাজনা শিখে রাখলি প্যাটের ভাতের অভাব হবে না। আমাগো তো জমি জাগা নি। গাঙের চরে বাস। তাই চিন্তা বারোমাস। বৈশাখ, জষ্ঠি মাসে লোকের বাড়ি বের মরশুমে বাজাতি গিলি দুটো পয়সা হাতে আসে।' খোকন বাবার কাছ থেকে মন দিয়ে এই ফুলেট বাঁশি বাজানো শিখে নেয়।

তারার দিনকাল আর ভালো কাটে না। গাঙবাতাড়ি গিয়ে আর নদীতে মরা গরুছাগল মেলে না। অন্য পাড়ার মুচিরা আগের থেকে তুলে নেয়। আজ তারা নদীর রাস্তা ধরে পাড়া ঘুরে মড়া খুঁজতে বেরিয়েছে। রাস্তায় পুবপাড়ার নিমাই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল।

'ঠাকুরমশাই কোনে যাচ্ছ?'

'আমি এট্টু যজমানের বাড়ি পুজোয় যাচ্ছি। শুভ কাজে যাবার সময় তোর সঙ্গে দেখা হল। সব অমঙ্গলের লক্ষণ। তোরা ছোট জাত। তোদের ছায়া মাড়ানো ও পাপ। বাঁদিক দে যা, কায়েত বামনের সামনে এট্টু সমীহ কুরে চলবি তো?'

ঠাকুরের কথায় তারা বলে,' ঠাকুরদা আমি কি দোষ করলাম? মানুষ হুয়ে তোমরা আমাগো মানষির মত মনে করো না। দ্যাশটা তো আগিয়ে যাচ্ছে। এখনও কি জাতপাত, ছোঁয়াছুয়ি নে কথা শোনাবে?

নিমাই ঠাকুর আর কথা বলে না। হন হন করে পশ্চিম পাড়ার দিকে চলে যায়। তারা নদীর চর ধরে মরা গরু-ছাগল দেখতে দেখতে সামনে এগিয়ে যায়।

তারার নজরে আসে, সামনের বাড়ির গোয়াল থেকে একটা মরা দামড়া গরু চার পায়ে বেঁধে, তার মধ্যে লম্বা বাঁশ ঢুকিয়ে চারজন লোক বয়ে নদীর ধারে নিয়ে আসছে। তারা জানে এটা দত্তদের বাড়ি। ওদের গোয়ালে অনেক গরু ছিল। আয়লায় অনেকগুলো মরে গেছে। গরু বয়ে নিয়ে যাওয়া লোকের মধ্যে তারার পরিচিত নিতাই হেঁকে বলে,

'বাবু, ওই তো তারা মুচি এদিকে আসটেছে। আপনার দুটো চাষের দামড়া মুরলো। ওই তারারে জিজ্ঞেস করো। সব জানতি পারবা। ওরা তো চামড়া হাড়গোড়ের লোভে এসব কর্ম করে। গইলি সন্‌ধে বেলা ঢুকে কলার পাতে কুরে বিষ নে গরুরে খাবায়। আর গরু গাঙে ফেলার সময় হাজির হয়। ওরে ধুরে এট্টু ধোলাই দাও। সব কথা বারিয়ে পড়বে।'

তারা এসব কথা শুনে ভয়ে কুঁকুড়ে যায়। নগেন দত্ত ওই রাস্তায় ছিল। খপ করে তারার হাতটা ধরে বলে, 'বেটা মুচি, ছোট জাত। গরুগুনোর বিষ খাবিয়ে আবার এ পাড়ায় চামড়া নেবার জন্যি আসলি? তোরে মজা দেখাব।'

এসব কথা বলে দত্ত দুম করে তারার পিঠি চড় কষায়, আর বলে, 'দলে আর কেরা কেরা ছিলি বল, না হলি ইকেনে পিটিয়ে মারব। বল তারা, যদি বাচতি চায। সব কথা খুলে বল।'

তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপোটে হাতযোড় করে বলে, 'বাবূ আমি এ সব কিছু করিনি, বেশ্বাস কর। বিষ দে গরু মাইরে

মানষির ক্ষতি করবো, এ সব কোথা কুন দিন ভাবিনি। আমি ছাইলে নে গাঙবাতাড়ি যাই। গাঙের ভেসে যাবা মড়া নৌকোয় তুলি। বাবূ এ সব কাজ আমি করিনি।'

দত্তবাবুর হাঁকডাকে গ্রামের আরো অনেক লোক হাজির হয়। দলের কয়েকজন গরুর দড়ি দিয়ে তারার হাত পিঠ মোড়া করে গোয়ালের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে, আর ওরা চড়থাপ্পড় মারতে থাকে। পাড়ার লোকেরা ওকে নানা রকম উল্‌টোপাল্টা প্রশ্ন করে।

এই সময় ওই পাড়া দিয়ে পুব পাড়ার গরুর ডাক্তার প্রফুল্ল যাচ্ছিল। সমস্থ ঘটনা শুনে প্রফুল্ল ডাক্তার বলে, 'দত্তবাবু, গ্রামে গরুর একটা মারাত্বক সংক্রামক 'এসো' রোগ দেখা দেছে। গরু মাঠে চরতি গে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তেছে। কদিন আগে পশ্চিমপাড়ার রতন মোড়লের একটা গরু মুরেছে। এ জন্যি তারা মুচির দোষ দে আর লাভ নি। ওরে ছাইড়ে দাও। ওরা তো মরা গরু কাটবে। এটা উগো পেশা। ওরা ওইসব কুরে খায়। তবে গরু আর মাঠে চরতি দ্যাবা না।'

ডাক্তারের কথায়, দত্ত দড়ি খুলে তারাকে ছেড়ে দেয়, আর বলে, 'তোরা ছোটলোক। তোগো কথায় কেরা বিশ্বাস করে। শুধু ডাক্তার বলল বুলে, না হলি থানা পুলিস কুরে তোরে জেল খাটাতাম।'

তারা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বাবু কাওরা-মুচি বুলে এরাম অত্যাচার করতি পারলে! তবে মনে রাখবা, চিরডা কাল এরাম থাকপে না, চাকা কিন্তু উলটো দিকি ঘোরবে। তখন এ সব অন্যায় অবিচারের শোধ ন্যাব।' তারা দ্রত পায়ে বাড়ির দিকে এগোয়।

র বী ন ব সু

লজ্জা

আজ রবিবার। ছুটির দিন। না আছে স্কুল, না আছে টিউশন। একটু বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে পলাশ। চা খেয়ে বাজারে যায়। সপ্তাহের মাঝে টুকিটাকি আনলেও এই রবিবার সে সময় নিয়ে সারা সপ্তাহের শাকসবজি, মাছ-মাংস, মুদিখানা দোকানের সব বাজার সেরে নেয়। তাই ফিরতে বেশ দেরি হয়। তার উপর পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়। নির্দিষ্ট একটি চায়ের দোকানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা মারে। আদা-এলাচ দেওয়া দুধ চা-ও খায়। বেশ ভালো বানায়। চ্যাটার্জিদা নামে একজন বেশ মজার মজার জোকস বলেন। হাসিতে পেটে খিল ধরে যায়। সারা সপ্তাহের অবসাদ ক্লান্তি সব হাওয়া। আজ আড্ডা হল না। চায়ের দোকানটা বন্ধ। সামনের রাস্তা খুঁড়ে কর্পোরেশন জলের পাইপ বসাচ্ছে। পলাশ তাই তাড়াতাড়ি বাজার থেকে ফিরল। ব্যাগগুলো ডাইনিংয়ের এক কোণে রেখে ওয়াশরুমে গেল। হাত-পা ধুয়ে সোফাতে এসে বসে। খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে স্ত্রী অপর্ণার উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে বলে, 'এক কাপ চা পেতে পারি?'

কিছুক্ষণ পর অপর্ণা কিচেন থেকে চায়ের কাপ হাতে ঘরে আসে। পলাশের সামনের টি-টেবিলে জোরে ঠক শব্দ করে রেখে বলে, 'নাও, তোমার চা-আ।'

গলার স্বরে বেশ গরম হাওয়া বুঝতে পারে পলাশ। আসলে ক'দিন ধরে তেতে আছে অপর্ণা। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর তার কাজ বেশ বেড়ে গেছে। একটা বাসন মাজার ঠিকে ঝি ছাড়া রান্নার জন্য কোনো মেয়ে রাখতে পারেনি সে। বাইক আর ফ্ল্যাটের ইএমআইয়ে কেটে যায় মোটা অঙ্কের টাকা। এরপর মাসকে বাজার, ইলেকট্রিক বিল, খবরের কাগজ, মেয়ে তুতুলের স্কুলের মাইনে, টিউশন, নাচের স্কুল, গানের মাস্টার, মোবাইল রিচার্জ, বাইকের তেল—সব দিয়ে থুয়ে হাতে থাকে না কিছু। বাধ্য হয়ে পলাশ স্কুল ছুটির পর দুটো টিউশন নিয়েছে। তাই বাড়ি ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যায়। মেয়ের পড়াশোনার সব দায়িত্ব অপর্ণার কাঁধে। তার হোমওয়ার্ক দেখা, স্কুলে দিয়ে আসা, আনা। তার উপর দু'বেলা রান্না। অপর্ণার রাগ তাই সঙ্গত। সে স্ত্রীকে শান্ত করতে নরম গলায় বলে, 'রাগ করছো কেন! ঠাণ্ডা হয়ে বসো।' পলাশ অপর্ণার হাত ধরে টেনে সোফাতে বসায়।

'নাটক করো না। আমার এখন বসার সময় নেই। হাতে গুচ্চের কাজ। তুতুলের স্কুলের প্রজেক্টের কাজ দেখিয়ে দেব, না রান্না করব, না বাজার ধুয়ে ফ্রিজে রাখব। কোনটা করব? আমি আর পাচ্ছি না।'

'পারতে হবে কেন? আমি তো বলেছি, একটা রান্নার মেয়ে দেখো। ঠিক চালিয়ে নেব।'

'ঠিক বলছো! তাহলে মেয়ে দেখি?'

'হ্যাঁ, দেখো।'

ও ঘর থেকে মেয়ের গলা ভেসে আসে। 'ও মা, দেখে যাও না। কেমন করলাম।'

অপর্ণা হাসিমুখে উঠে যায়।

সপ্তাহের মাঝখানে একদিন রাতের খাবার খেতে দিয়ে অপর্ণা বলল, 'জানো, একটা মেয়ের খবর পেয়েছি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের তৃষাদির ঘরে যে কাজ করে, সেই খবরটা এনেছে। তার গাঁয়ের একজনের চেনা মেয়ে। কাজের খুব দরকার।' তারপর অপর্ণা যা বলল, তার সারমর্ম মেয়েটি কলেজে পড়ত, কিন্তু হঠাৎ বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে বাধ্য হয়ে ট্রেনে হকারি শুরু করে। দুই মেয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। হঠাৎ একদিন চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে চাকার তলায় চলে গেল বাবা। বড় মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখে। ছোট বোন আর মাকে নিয়ে অথৈ জলে। ভাবার অবকাশ ছিল না। সংসার বাঁচাতে, বোনকে মানুষ করতে সে চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নিল। বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ। ওরা শহরতলিতে থাকে। ওখানে মাইনে কম। ও তাই একবেলা শহরে কাজ করতে চায়। ট্রেন ধরে আসবে যাবে। খুব নরম প্রকৃতির মেয়ে। রান্নার হাতও ভালো। অপর্ণা চায় এই মেয়েটাকে রান্নার জন্য রাখবে।

'কিন্তু, ট্রেনের পথ। টাইম মতো আসতে পারবে তো? সকালে স্কুলে বেরুবো। ট্রেন তো প্রায়ই লেট করে। অবরোধ হয়।' পলাশ কিছুটা চিন্তিত।

'না, তেমন হলে ও বাসে আসবে। ওদের ওখান থেকে বাসও আছে।' পলাশকে আশ্বস্ত করে অপর্ণা।

'বেশ। আসতে বলো।'

'তাহলে ওকে এই রবিবার আসতে বলছি। তুমি থেকো। তোমার সামনে মাইনের ব্যাপারে কথা হবে।'

পলাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে খাবারে মন দেয়।

রবিবার এসে গেল। সকালে দেশের বাড়ি থেকে ছোটভাই ফোন করেছিল। দেশে যে সামান্য চাষের জমি তাদের ছিল, পাশের একজন তার কিছুটা দখল করার তালে আছে। সীমানা ঠেলে তাদের জমির মধ্যে ঢুকছে। ভাই বাধা দিয়েছে। কিন্তু পলাশকে একবার যেতে হবে। ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার মধ্যেই কলিং বেল বাজল। অপর্ণা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখে বাসনা। তৃষাদির বাড়ির কাজের মেয়ে।

'বৌদি, এই যে এনেছি ওকে। আপনারা কথা বলে নিন। আমার হাতে খুব কাজ।'

অপর্ণা দেখল ছিপছিপে রোগা মাঝারি উচ্চতার একটি মেয়ে। তার বয়সী হবে। গায়ের রংটাও তার মতো প্রায়। কিন্তু চোখদুটো বেশ কালো উজ্জ্বল আর গভীর। বিষণ্ণও বটে। প্রথম দেখাতে মেয়েটিকে ভালো লেগে গেল অপর্ণার। জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম তোমার, ভাই?'

মেয়েটি উত্তর দেয়, 'স্বাতী।'

অপর্ণা হাত চেপে ধরল। 'এসো, ভিতরে এসো।'

পলাশ মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করছিল। অপর্ণা এসে সামনে দাঁড়াল।

'এই দেখো। ও এসেছে। কথা বলো।'

পলাশ মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকায়। তার পৃথিবী ভূমিকম্প ছাড়াই টলে যায়। কাকে দেখছে সে চোখের সামনে! এও কি সম্ভব! স্বাতী! তার ফেলে আসা কৈশোর-যৌবনের স্পর্শময় এক স্মৃতি। যে স্মৃতি সে ভুলতে চায় বা ভুলে গেছে। তার দুঃখময় প্রথম প্রেম।

একই গ্রামের এপাড়া ওপাড়া। একসাথে বড় হয়ে ওঠা। খেলা, মেলায় ঘোরা, সিনেমা দেখা, সাঁতার কাটা। আমচুরি করে দুপুর রোদে নুন-লঙ্কা মেখে গাছের ডালে বসে খাওয়া। তারপর এক সরস্বতী পুজোর দিন কাছাকাছি আসা। একে অপরকে চিঠি দেওয়া। তখন মোবাইল হাতে পায়নি। ওদের গ্রাম জীবনে তখন ভ্যালেনটাইন ডে ছিল না। তবু একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে পলাশ স্বাতীকে জানিয়ে ছিল তার ভালবাসার কথা। সরল ডাগর চোখের মেয়েটি লজ্জা পেয়েও হাসি মুখে জানিয়ে ছিল, সেও ভালবাসে।

তারপর কৈশোর চলে গেল। এল যৌবন। সে প্রেম পরিণত হল এক সময়। দু' বাড়ির সবাই জানল তাদের প্রেমের কথা। মেনেও নিল। দু'টি তরুণ মন তখন আশা আর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। এমন সময় ছন্দপতন। পলাশের বাবার ক্যানসার ধরা পড়ল। চিকিৎসার খরচ প্রচুর। অপারেশন করাতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক সুবিমল হালদারের সামান্য পেনশনে সংসার চলে। টিউশন করে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে পলাশ। মাস্টার্স করার কথা মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়ে চাকরির পরীক্ষায় বসে। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় সে এসএসসি পাশ করে। কিন্তু ইন্টারভিউয়ে ডাক আর পায় না। বড়লোক বন্ধু বিমল অনেক কম নম্বর পেয়েও ডাক পায় এবং প্যানেলের বেশ উপরের দিকে নাম ওঠে। সেই বন্ধু একদিন ফোনে আরব্য রজনীর সেই আশ্চর্য জিনের কথা জানাল। সব মুশকিল আসান করে দিতে পারে। তবে এই জিনকে টাকা দিতে হবে। পাঁচ লাখ। যার এখনও কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, যার বাবা দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে সে টাকা পাবে কোথায়! তাই চাকরি নামক আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধান পাওয়া যখন অসম্ভব ধরে নিয়েছিল পলাশ, তখনই তার দূর সম্পর্কের এক পিসেমশাই রূপকথার জিনের সন্ধান দিয়েছিল। মা একদিন তার ঘরে এসে বলল, 'তোর চাকরির টাকা ওরা দেবে। শুধু একটাই শর্ত, ওদের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।'

ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বাতীর নিরীহ আর শীর্ণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মাকে বলে, 'আচ্ছা, আমাকে ভাবতে দাও।'

মা অনুনয় ভরা চোখ নিয়ে ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে শুধু বলে, 'সংসারটার কথা, তোর বাবার অপারেশনের কথা একটু ভাবিস, চাকরিটা হলে!'

ভাবার বেশি অবকাশ ছিল না পলাশের কাছে। অসহায় সে। চাকরিটা খুব দরকার। সংসার বাঁচাতে। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে। নিজস্ব সুখ অনুভূতি, প্রেম ও কথা দেওয়ার কথা সে ভুলে গেল। ভুলে গেল পাশ করেও এভাবে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার বিবেক দংশন। সে শর্ত মেনে নিল। কিংবা বলা যায় মানা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না তার কাছে।

পলাশের চাকরি হয়ে গেল। বাস্তু বাড়ির একটা অংশ বিক্রি করে বাবার অপারেশন করাল। ভালো দিন দেখে বিয়েও হয়ে গেল। ভিড়ের ভিতর থেকে একবার মাত্র সে অভিমানিনী মেয়েটার মুখ দেখেছিল। তারপর এই আজ। বাবা বাঁচেননি বেশি দিন। মা আর ছোটভাই দেশের বাড়িতে থাকে। পলাশ ট্রান্সফার নিয়ে এক রকম পালিয়ে এসেছিল শহরে। কিছুদিন ভাড়া বাড়িতে থেকে এখন ব্যাঙ্কলোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে। মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছে। জীবন এখন সুখ স্বস্তিতে পূর্ণ। তবু এক অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খায়। ভিতরে ভিতরে সে যন্ত্রণায় ছটফট করে। একটা অতীত, একটা অসহায় আহত মুখ তার চোখের সামনে দোল খায়। ঘণ্টা নাড়ার মতো কী যেন নড়ে ক্রমাগত। আপাত শান্ত পরিতৃপ্তির ঘুম থেকে সে মাঝরাতে জেগে উঠে বিছানায় বসে থাকে। নিজেকে কাওয়ার্ড, বিশ্বাসঘাতক মনে হয়। আত্মগ্লানির থিকথিকে পাঁকে তার সারা শরীর নিমজ্জিত।

আজ এতদিন পর সেই মুখ তার সামনে। যখন গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, একবার ভাবেনি আবার দেখা হবে। কোনও খোঁজই রাখেনি স্বাতীর। আর আজ সেই অতীত যখন তার সামনে, স্বার্থপর কাপুরুষ হয়ে সে মুখ নিচু করল।

স্বাতীর অবস্থাও তথৈবচ। তবে প্রেক্ষিত ভিন্ন। এতদিন পর জীবনের এতবড় ঘূর্ণিপাকে যে পড়বে বুঝে উঠতে পারেনি সে। যাকে প্রাণপণ ভুলতে চেয়েছে, দুঃখ পেলেও যার উপর আজ আর কোনও রাগ নেই, বাঁচার রসদ সংগ্রহে তার দ্বারে উপস্থিত! নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলে যেন ভালো হতো। এখন সে কী করবে! নৈঃশব্দ্য দূর করল অপর্ণা।

'স্বাতী, তুমি বল কত মাইনে নেবে?'

মুখ নিচু করে পায়ের আঙুল মার্বেল মেঝেতে ঘসছিল স্বাতী। অপর্ণার কথায় চমক ভাঙে। সে সহজ হবার ভান করে। 'আপনারা যা ভালো বোঝেন, তাই দেবেন। আমি তো কোনো দিন শহরে কাজ করিনি।'

পলাশের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বলে, 'কিগো, কিছু বলো?'

পলাশ তখন অপরিসীম লজ্জায় অস্থির। মুখ না তুলে উত্তর দেয়, 'আমি কী বলব? তুমি যা ভালো বোঝ।' পলাশ সোফা থেকে উঠে দ্রুত বেডরুমে চলে যায়।

'ঠিক আছে স্বাতী, একবেলা আসলে হবে। তবে খুব সকালে আসতে হবে। দাদাবাবু স্কুলে যাবে খেয়ে। মেয়েও যাবে। তাই সকালের জলখাবার, দু'বেলার মতো তরকারি ভাত রান্না করবে। রাতের জন্য আটটা রুটি বানিয়ে হটপটে রেখে যাবে। আমি তুতুলকে ইস্কুলে দিয়ে ফিরলে তোমার ছুটি। আমি তোমাকে ছ'হাজার টাকা মাইনে দেব। আর টিফিন পাবে। তুমি রাজি তো?'

স্বাতী ঘাড় নাড়ে।

'তাহলে কাল থেকেই চলে এসো।'

'আচ্ছা।'

পালাতে পারলে যেন বাঁচে স্বাতী। আজ এই সংসার আলো করে যার থাকার কথা, সে কিনা রান্নার মেয়ে হয়ে আসবে। নিজের ভাগ্যের প্রতি প্রতিকারহীন এক আক্রোশ জমা হয়। মাথাটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। তাড়াতাড়ি চটিটা পায়ে গলিয়ে এক রকম ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে নিচে।

রাস্তায় তখন জানুয়ারি মাসের নিষ্প্রভ রোদ। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে, সে লজ্জা আড়াল করতে ওড়না দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে নেয়। স্বাতী বুঝতে পারে না উপরে তিন তলার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে তখন লজ্জিত দুটি চোখ তাকে দেখছে। আর অনুতাপে পুড়ছে।

পরের দিন সকালে অপর্ণার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় পলাশের। সে বাইরে এসে দেখে অপর্ণা বাসনার সঙ্গে বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। তাকে দেখে গলা আরও চড়ে। 'দেখো, কী কাণ্ড। ভেবেছিলাম মেয়েটি ভালো। গতকাল রাজি হল। মাইনে ঠিক হল। আর আজ খবর পাঠিয়েছে সে কাজ করবে না। কী বাজে মেয়ে! ছিঃ!'

পলাশের বলতে ইচ্ছে করল, ছিঃ ওকে বলো না, পর্ণা। ছিঃ আমাকে বল। ঘৃণা আমাকে করো।

হা সি ব সু
যমুনা ও ঝুমকোলতা

ঝড়খালির বড় মাঠের ওপাশে মধুর বাপের ক'বিঘে ধানি জমি ছিল। ওই জমি চাষ করেই ওর বছরের চাল উঠতো। চাষের কাজ ছাড়া বাকি সময়টায় কখনো বসে থাকেনি মধু, বাড়ির ছোট্ট উঠোনে পালংশাক দু'চারটে কপি লাগিয়েছে, একটা লাউয়ের ডগা তুলে দিয়েছে টালির চালে। ওই গাছগুলোর যত্নআত্তি করা, অন্যের বাগানে বেড়া ঠিক করে দেয়া, কারোর শ্যালো পাম্পের জল ঠিকমতো জমিতে যাচ্ছে কিনা দেখা—এইসব টুকটাক কাজ নিয়ে থাকতো। ক্ষেতে যখন চাষের কাজ চলতো তখন যমুনাও যেত স্বামীর সঙ্গে, ধান রোয়া থেকে আরম্ভ করে ধান কাটা পর্যন্ত সব কাজেই বেশ কিছুটা সাহায্য করতো মধুকে। সেই সময় বাচ্চাদের দেখে রাখতো মধুর মা।

সেবার আমফানের ঝড়ে নোনা জল জমিতে ঢুকে সব চাষের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়, গ্রামের বহু কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিশাহারা অবস্থায় কিছুদিনের জন্য মধু'র পরিবার এবং অন্যান্য চাষি পরিবারের বেশ কিছু লোক দোতলা ইস্কুল বাড়িতে উঠেছিল। ওদের খাবার ব্যাবস্থাও করেছিল পাড়ার ভলান্টিয়াররা। ইস্কুলের মাঠে সেদিন মেরাপ বাঁধা হয়েছে, মন্ত্রী আমলারা আসবেন বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে। যমুনা আর মধুও ছুটলো সেই মিটিং শুনতে, অনেক রকম সাহায্যের কথা ঘোষণা হলো, কিন্তু তাতে ওদের কোনো লাভ হল না, ওরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল।

মধু ভাবে পাঁচ জনের সংসার চলবে কীভাবে? বছরের ধান-ই যদি না ওঠে, সবাই খাবে কী? মধু'র মনে হয় এভাবে আর গ্রামে থাকা চলবে না, শহরে গিয়ে কিছু একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে। যেমন করেই হোক সবার মুখে দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের যোগাড় করতে হবে। জমানো টাকা যে'কটা ছিল যমুনার হাতে দিয়ে বললো, "ক'টা দিন সামলে নে যমুনা, কাজ যোগাড় করে তোদের নিয়ে যাব শহরে।" পরের দিন মধু বেরিয়ে যায় শহরের উদ্দেশ্যে।

একেকটা দিন যেন একেকটা বছর মনে হয় যমুনার। শহর থেকে লোক মারফত মধু জানায় কাজের কথা পাকা হয়ে গেছে, সকালে খবরের কাগজ বিলি করা, বেলা দশটা থেকে শপিং মল পরিস্কার রাখার কাজ। যমুনা আশার আলো দেখলেও আরো একটা মাস কীভাবে সংসার চালাবে সেই দুশ্চিন্তায় ওর রাতের ঘুম চলে যায়।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের বাস গ্রামের মাঝখানে, বন্যায় তাদের কোন ক্ষতি হয়নি, তাদের উঁচু জমিতে দোতলা বাড়ি। যমুনা সেদিন সহদেব হালদারের বাড়ি গিয়ে হালদার গিন্নীর হাতে পায়ে ধরলো একটা কাজের জন্য। বললো, "আমাকে যেকোনো কাজ দাও মা, আমি করতে পারবো।"

হালদার গিন্নীর মায়ার শরীর, ওকে বললো, "কাল থেকেই কাজে লেগে যা, পাতকো থেকে জল তুলবি, উঠোন ঝাড়ু দিবি আর গোয়ালে গিয়ে গরুগুলোকে দু'বার যাবনা দিবি। রোজ দু পালি করে চাল আর দশটা টাকা নিয়ে যাস। রোজ দুবেলা সব্বাই পেট ভরে খেতে পাবে এই আনন্দে যমুনার চোখে জল আসে।

আজ বেশ মেঘ জমেছে আকাশে, কেমন একটা গুমোট ভাব, কাজ সেরে যমুনা বাড়ির পথে হেঁটে চলেছে অন্যমনস্ক ভাবে। বাঁ পাশে নাবাল জমিতে অজস্র শামুক খোল একপা দু'পা করে হাঁটছে, খাবার খুজছে হয়তো, একেকটা আবার উড়ে গিয়ে বসছে সামনের পাকুড় গাছটার মাথায়। সবারই পেটের চিন্তা, সে পাখিই হোক বা মানুষ। আজ যমুনার মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে আছে। হালদার গিন্নী আজ দু'পালি চালের সঙ্গে একটা পাঙ্গাস মাছও দিয়েছে। মাছটা নদীর না পুকুরের কে জানে— তা জানার দরকারও নেই, বেশ ঝাল ঝাল করে রান্না করবে বাড়ি গিয়ে। বাচ্চা দু'টোকে আগে খাইয়ে তারপর শাশুড়ি আর নিজে খেয়ে নেবে। কাল ভোর থাকতে উঠে ঘরের কাজ করে হলদার বাড়িতে ছুটতে হবে, সামনের সপ্তাহে ওদের গৃহ দেবতার পুজো আছে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, "কিরে যমুনা মাছটা কে দিলো? বৌঠান?" যমুনা চমকে উঠে পর মুহূর্তেই বুঝতে পারে ওটা সহদেব হালদারের মাতাল অপগন্ড ভাইটা। নকুলকে গ্রামের সবাই চেনে মাতাল হিসেবে, ওর কোন কাজ নেই মদ খেয়ে এখানে ওখানে পড়ে থাকা ছাড়া।

কয়েক পুরুষ আগে এই হালদার পরিবারের দশ জন লোক কলেরায় মারা গিয়েছিল। একমাত্র সহদেব হালদারের

দাদামশাই এবং তার সদ্য বিয়ে করা বউ জগন্নাথ দর্শনে পুরি গিয়েছিল, সেই সময়েই এই বিপর্যয় নেমে আসে ওদের গ্রামে। তারপর থেকেই এই পরিবারে প্রতিষ্ঠা হয় ওলাইচন্ডী দেবীর এবং প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় এই পুজো।

মধু প্রতি মাসে নিয়ম করে হারানকে দিয়ে দেশে টাকা পাঠিয়েছে, কোন মাসে পাঁচশো, সাতশো বা হাজার টাকা। হারান কলকাতায় গভর্নমেন্টের বাস গুমটিতে কাজ করে। প্রতি মাসে ও বাড়ি যায় এবং মধুর পাঠান টাকা নিয়ম করে যমুনার হাতে দিয়ে আসে। এই ছ'মাস রোজ মধুর মন কাঁদে বউ বাচ্চা আর মায়ের জন্য। এতোদিনে ও এক সপ্তাহ ছুটি পেয়েছে, বাড়ি যাবার আগে ও সবার জন্য কিছু কিছু জিনিস কিনল। যমুনার খুব সখ একটা লাল ডুরে শাড়ির, ও তাই কিনল সঙ্গে এক ডজন লাল কাঁচের চুড়ি। কতদিন পরে বাড়ির চৌকাঠে পা দেবে মধু, মন আনচান করে, মনে মনে ভাবে গিয়ে যমুনাকে বলবে, "ও যমু আজ এট্টু সাজগোজ করি নে, সেই যেমনটি বিয়ের পরে কত্তিস, পায়ে আলতা কপালে একটা বড় টিপ—তোর চাঁদপানা মুখে আগের মতো একসঙ্গে একশোটা চুমু খাব।" কালই সকালে ভুতুলে চড়ে দেশে যাবে মধু। ভূতল পরিবহন নিগমের বাসকে ওরা ভুতুল বলে।

এদিকে যমুনা বড়োই ব্যস্ত, মধু আসবে আজ বিকেলে, ও যা যা খেতে ভালবাসে সব রান্না করলো, তারপর চান করে পরিস্কার কাপড় পড়ে চললো সহদেব হালদারের বাড়ির দিকে। ওখানে আজ বিস্তর কাজ। যাবার সময় কলাপাতায় করে গাছের কয়েকটা কলা, রান্না করা একটু পায়েস আর একশো একটা রক্ত জবা নিল ওলাইচন্ডী মায়ের জন্য। পথে যেতে যেতে দেখে পুঁটিকাকির উঠোনে একটা বেড়ার ওপর এক ঝাঁক ঝুমকোলতা ফুল ফুটে আছে, কী সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল, যেন আলো হয়ে আছে উঠোনটা। মনে ভাবে এই ফুল কি পুজোয় লাগে? যাকগে, জানা যখন নেই তুলে কাজ নেই, বরং ফেরার পথে ক'টা চেয়ে নিয়ে আসবো, খোঁপায় লাগিয়ে মধুর সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

আজ হালদার গিন্নী ওকে দিয়ে পুজোর জোগাড় করালো, বাইরের কাজে আর ওকে পাঠাল না। একশো একটা জবা ঠাকুরের পায়ে সাজিয়ে দিল দুজনে। গ্রামের বহু মানুষ নিমন্ত্রিত এখানে, তারা সবাই একে একে এলো, পুরোহিত পুজো সেরে পাঁচালী পড়লেন। পুজো শেষ হলে এবার প্রসাদ বিতরণের পালা। গিন্নী মা আর যমুনা মিলে প্রসাদ দিল সবাইকে, ফল মিষ্টি, লুচি মোহনভোগ আরো কতো কী। তখন বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে, যমুনার মন উচাটন হচ্ছে কতক্ষণে বাড়ি যাবে, ভাবে এতক্ষণে মধু নিশ্চই বাড়ি এসে গেছে। এবার সাহস করে বলে যমুনা, "মা এখন বাড়ি যাই? বাকিটা কাল এসে সব মাজা ঘষা করে দেবো।" গিন্নী মা বলে, "দাঁড়া তোর জন্য প্রসাদ বেড়ে দিই, বাড়ি গিয়ে সবাই মিলে খাবি আর শান্তির জল তোর বাড়িতেও ছিটিয়ে দিবি।" একটা বড় চকচকে কাঁসার রেকাবিতে গিন্নী মা সাজিয়ে দিলেন সবকিছু। যমুনা বলে, "মা এতো দিলে?" " হ্যাঁ, এই রেকাবিটাও তোর, তুই আমার ঘরের মেয়ে, তুই না এলে আমার পুজো অসম্পূর্ণ থাকতো, যা এবার বাড়ি যা।"

যমুনার চোখ ছলছল করে, মা মরে যাওয়ার পর এতো ভালবাসা সত্যি পায়নি ও, পরের জন্মে যেন এই মানুষটা ওর মা হয়, ভাবে যমুনা। রাস্তায় বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালায় যমুনা, পুঁটিকাকির বাড়ির সামনে এসে বাঁ হাতে কয়েকটা ঝুমকোলতা ফুল তুলে খোঁপায় লাগায়, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মধুকে দেখাবে ওর রংবাহারী খোঁপার সাজ।

হঠাৎ একটা সাপের মতো ঠান্ডা স্পর্শ পিঠে অনুভব করলো যমুনা, সঙ্গে সঙ্গে ওর শাড়ি ব্লাউজ এক টানে খুলে ফেলে সরীসৃপের মতো হিস হিস করতে করতে মাতাল নকুলটা ঝাঁপিয়ে পড়ে যমুনার ওপর। যমুনা কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যায়। তারপর যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কাঁসার চকচকে রেকাবি দিয়ে সজোরে মাথায় মেরে চিৎকার করে ওঠে জয় মা ওলাইচন্ডী, নকুল লুটিয়ে পড়ে রক্ত গঙ্গায়। যমুনার চিৎকারে গ্রামের সব লোক জড়ো হয় কিছু সময়ের মধ্যেই, মধু ছুটে এসে দেখে যমুনার অনাবৃত শরীর রক্তে মাখামাখি।

দু'একটা ঝুমকোলতা ফুল তখনও তিরতির করে কাঁপছে যমুনার খোঁপায়।

পঞ্চ কবির পঞ্চ স্বর:

সু শী ল ম ণ্ডল

অনুক্ষণ ঈশ্বর

ছায়া ছড়িয়ে থাকা মাঠে এক্ষুণি
বৃষ্টি নামবে। অন্তত মেঘরোদ্দুর
তাই বলছে।
নদীর দিকের পৃথিবীটার কোলে
লোকগান বাসা বেঁধেছে পরম নিশ্চিন্তে।

আমি তোমার দিকে
ঘড়ি তাক করে বসে আছি, অনেকটা মিতবাক হয়ে
তোমার শ্রাবণ এসে যদি মনের মধ্যে
একটা থৈ থৈ এনে দেয়।

এখন আমার একটা নিমগ্নতা চাই
যেখানে ঈশ্বরকে লুকিয়ে রাখতে পারি
আমার সকল পথের অনুক্ষণ ঈশ্বর।

বেগম আখতার

ফুটিফাটা মাঠে ঘড়ির কাঁটার রাস্তা ধরে
বর্ষা এসেছে। উঠোনে জল চাঁদে জল
হিজলে জল। পৃথিবীটা এখন
তলপেটের মত নরম।

সারারাত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস পড়ি
বাসে দাঁড়ানো পাশের সুগন্ধি মেয়েটার মুখ
বার বার চোখের পাতায় আটকে যায়
ও আমার ঘুম কাড়ার অধিকার কোথায় পেল?

স্মৃতির কাগজ আঁকিবুঁকি কাটে
মৃত নদী বেশ জ্যান্ত হয়ে ওঠে আমার দেখতে ভুল হয় না
এত বছর পরে
ঘর জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে বেগম আখতার।

জীবনের শতবিধ সুখ

বারান্দায় মেঘ দুলছে। যেকোনো সময় জল হয়ে সহজ গল্প হয়ে উঠতে পারে।
পরীর মতো ডানা মেলা মেঘ পাহাড় থেকে নেমে সোজা আমার মাথার চুলে।

পাহাড়ী বাংলোয় বসে স্বপ্ন বুনছি। জীবনের শতবিধ সুখ
আকণ্ঠ পান করব বলে। পাহাড়ী বুনো মেয়ের চোখে ছড়িয়ে আছে বুনো প্রেম।

আমার অস্থির বাউন্ডুলে ইচ্ছেগুলো, পাহাড়ী কৃষ্ণকলির দিকে ছুটে যায়
গোপন শিশিরপাতে তাকে ভেজাতে চায়।

দৌড়

দৌড়তে শুরু করলে একটা সকাল খুঁজে পাওয়া যায়।
দৌড়ের শেষে একটা সিঁড়ি ওপরে ওঠার ধাপটা
দেখিয়ে দেয়।
ভালো দৌড় বুঝিয়ে দিতে পারে
ঈশ্বর এবং মানুষ একজন-ই।

একটা নিশ্চিত দৌড়
নিরন্ন পেটকে জানিয়ে দিতে পারে রুটির সন্ধান। একটা ভালো দৌড়ের গলায়

নীলকণ্ঠ হয়ে সততা বাস করে।
একটা দৌড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় নিয়ে একটা আস্ত মানুষ।

একটা মাঠময় দৌড়
আর কিছু না হোক হাতে ধরিয়ে দিতে পারে একটা নেলসন ম্যান্ডেলা
এবং একটা লড়াই।

ডুব

আমরা মানুষেরা একটা তল না পাওয়া বুকে
ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি।
আমাদের গাছপালা পাখি পোষা বিড়াল
সব কিছুর নিশ্চিত সলিল সমাধি
কেউ ঠেকাতে পারবে না।
অথচ শুনছি খুব তাড়াতাড়ি তিন ভাগ জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর
জনশূন্য হতে আর বেশি বাকি নেই

আমাদের ডুবে যাওয়া তাহলে কী
পাপে অবক্ষয়ে
অরণ্যের সমান ব্যপ্ত দীর্ঘ অসৎ পথচলায়?

আসলে
আমরা হারিয়ে বসতে বসেছি
"ডুব দে রে মন কালি বলে,"—এই মহামন্ত্র।

সৌ মি ত ব সু

জীবন এক আশ্চর্য দূরবীন

১
জেনেছি তোমায় আমি যেভাবে সমুদ্র চেনে তীব্র বালুকণা
একটি জীবন থেকে ঝ'রে পড়া আহত রাত্রিকে
কাঁধে করে হেঁটে চলে সন্ধ্যার নিভে আসা আলো।
সেই আলো মুক্ত হ'য়ে ফুটেছে তোমার মুখে
ওগো চেনামুখ,
আমাকে পেরিয়ে তুমি যেও না আশ্বিনে।
২
দিগন্তবিস্তৃত আলো
আমি তুলো ভেবে বালিশে জমাই।
যাতে ঘুম এলে স্বপ্নে আসে জাদুকর
হারানো বোতাম ঘিরে জেগে ওঠে
মহল্লার কালো আর খুল্লামখুল্লা ধেয়ে আসা আঁশবটি
ধাঁধার সৎকার করে জুড়ে যায়।

জীবনের সমস্ত ব্যথারা জুড়ে জুড়ে জমা হয় টুপির ভেতরে।
একদিন কেউ এসে রুমাল নাড়িয়ে টুপির ভেতর থেকে পায়রা ওড়াবে,
একদিন কেউ এসে আচম্বিতে মিশে যাবে
তোমার হলুদমাখা আয়না শরীরে।
৩
জলের ভেতর থেকে মুখ তোলে আহত হরিণ
দূরে মাঠের ভেতর দিয়ে
সম্পর্করা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যায়।
কোথা দিয়ে আসে আর কোথায় বা যায়
এসব জানতেই আমি ঝুঁকে পড়ি জলের ওপর
যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সমস্ত ব্যথা, সাদা পাতাদের
সব নিষ্কলঙ্ক ঘুম ভেসে যায় স্রোতের কার্নিশে।
আমি অসহায় মুখ তুলি তোমার ছায়ায়
আমার নিজস্ব ঘুম এখনো তোমায় ছেড়ে অনেক উঁচুতে।
৪
সব ডাকা একদিন জড়ো হবে উঠোনে তোমার
সমস্ত চিঠি জেনো একদিন উড়ে যাবে গ্রামের ওপারে
রাত্রিদের ভাইবোন নেই
সাদা চুল বিধবারা তার দুইহাত ধ'রে চলে যায় আগুনের দিকে
দরজার পাশে থাকা বন্দুকের নল তাকে ডাকে
নদীর ওপার থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ভোরের আলোয় তারা চিনে নেয় অজানা ছুরির বাঁট।
এখনো কথার ফাঁকে ধুলো ওড়ে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে যেসব জীবন,
দুহাত বাড়িয়ে ডাকি চইচই।
৫
গৃহ আছে, নিদ্রা আছে
এই অন্নে গাঁথি তোর দেহ
শরীর প্রগাঢ় হয়। যত অসমাপ্ত কথা উড়ে আসে
গেঁথে নিই চুলের ভেতর।
সমস্ত আঙ্গুল যেন গাছ হয়ে আছে, সমস্ত গাছ ঢেকে গেছে গভীর শেকড়ে,
সমস্ত শেকড় জুড়ে আত্মহনন।
আমি পাখিটির মতো তাহার কোটরে ঢুকে থাকি।
বক্সারের পতনের মতো বালি ঝরে সকাল বিকেল।
ধর্ম মুড়ে রেখে যায় ব্রিজের ওপরে।
আমি জল হয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাই আদি-মানবীর বহন করা আলো।
তুমি দেখেও দেখো না।

স্নে হাং শু বি কা শ দা স

পথিকের কথা

আমি তো মনোযোগের বাইরে থেকেছি চিরকাল। সুদূর পশ্চিমচকে ফিরে যেতে চেয়েছি। আকাশমণি পাতা ডাক পাঠায় বারবার। ঝাউপাতার শব্দে সরে গেল রঙবেরঙের ছাতার কৈশোর। আর গোধূলি পেরোলেই অবাঞ্ছিত শব্দেরা এসে দিনরাত উপহাস করছে এই মৃদুসাজ, চিহ্নহীন পড়ে থাকা।

কুয়াশার হাত ধরে সোনালী ডানায় জমেছে মায়া। পেছনে ফেলে আসা ধুলোপথ, সাইকেলবেলা, সুতো জুড়ে মাঞ্জার টান। সেইসব অপাপ কাহিনী—উন্মুক্ত ফুটে ওঠা নিয়ে নিজেকে চিনতে না পারা আমি পোড়াবাঁশিটির দেশে প'ড়ে থাকি অলস বিস্ময়ে। তবুও অসুখ লুকিয়ে রাখিনি। পাইনের দীর্ঘ ছায়ার আড়ালে ঝলসে ওঠে ঠোঁট। ভেতরের নদীটি প্রশ্রয়ে রাখে সমস্ত পাপ।

আমি তো বরং প্রতিদিনের মরে যাওয়া আড়াল করেছি। ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছি কালো তিল, সাঁতারের প্রতিশ্রুতি। তীব্র সবুজ এসে দুর্গম করেছে উদাসীন অতীতের আবহ। মাটি হয়ে লেগে আছে চড়কের গানে। অথচ ঘুম যদি জমে বিষণ্ণ পাঁচিলে, অসহায় আমি স্মৃতিকথা লিখি। উগরে দিই নীল বিষ। মেরামত করি ফেরার শব্দ। আর গান গেয়ে হারিয়ে যেতে চাই নিঃসঙ্গ পথিকের মতো।

প্রতিবিম্ব

মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে প্রতিবিম্ব। ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ে, ঘুমহীন ছুঁয়ে থাকে ঠোঁট। ধূর্তের মতো গোপন হাতে ছারখার করে দেয় নীল শাড়িটির উচাটন। মুখে তার অস্তবিকেলের গান। ভ্রূমধ্যে নোনাহ্রদ। সন্দেহকে এড়িয়ে যেতে পারে অবলীলায়, খুলে ফেলে কবরখানার আলো। কখনও কসাইখানা থেকে সে কিনে আনছে নীল ছবি, নিম্নমধ্যবিত্ত বর্ষাকাল। স্ফটিকস্বচ্ছ সিঙ্গল মল্ট-এর গ্লাসে মিশিয়ে দিচ্ছে ধমনী, গুলতি ও প্যারাসিটামলের লিঙ্গভেদহীন কথোপকথন। সেটুকুই তার স্নানঘর, বরফকুচির ক্ষত। আমি অনাথ আশ্রমের ম্লান আলোর নীচে বসে তার কথা ভাবি। আর হারিয়ে ফেলি আমার শৈশব। সেখানে যুদ্ধ নেই, নিঃসঙ্গ রাত নেই, এমনকি কবিতাসভাও নেই। অথচ আকাশমণি বনে সারা সময়জুড়ে অবহেলা লেখা হয় ডালে ডালে। ভয়ার্ত আমি দূরে তাকাই, দেখি ম্রিয়মাণ বেজে উঠছে বিবর্ণ শহর, তার হৃদয়বাঁশির মেঘাক্রান্ত ফেরিঘাট।

ঋণ

মুগ্ধ দু'আঙুলে ঘুমের গোপন বড়ি। বিষণ্ণ স্থাপত্যের যত পিছুটান সব রেখে আসি। পুরনো কাঠের গন্ধ কিছুটা সাহস চায়। তেমন প্রেমিক পেলে আস্ত জোনাকি থেকে সরিয়ে রাখতে পারে ঘুমের লাবণ্য। তার জানালার ভাঙা কাঁচে নিরীহ চায়ের দোকান, কথা বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নিল রাস্তার দিকে। নিবিড় গ্রীষ্ম জমা হয়। তোমার মুখাবয়বে মুদ্রিত পাতার অক্ষর ফুটে আছে। অল্পদামের নীল ছবি। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি দেখি হুমা কুরেশির বুক, জোয়েল গার্নারের সেলিব্রেশন।

আমাদের কালজয়ী স্মৃতি — মনের গভীরে শুয়ে থাকে নদীজলে। সামান্য টোকা দিলে গড়িয়ে পড়ে, ছায়া দেখলে আনন্দ বাড়ে অথচ ঠাণ্ডা একটা ভোর শুরু হচ্ছে চোখের সীমানায়। কিছুটা রোদের কাছে ঋণ জমা আছে, চশমার গোধূলিতে সে ঋণ বেড়ে চলে উত্তরোত্তর। ব্যথার শিশিতে রয়েছে উজ্জ্বল দিন, নতুনের ইশারা। পুকুরের জলে তোমাকে পেয়েছি অনুবাদহীন। বেজে ওঠে রঙিন ধুলোর সেতার। গানে ও অভিমানে বসন্ত শুরু হয়।

ঝিল রোড

মেঘে মেঘে বেলা যায়। আমার বেড়াতে যাওয়া হয় না। সামনের রাস্তাটা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। অথচ ওদিকে যাওয়ার কথা আমি কখনওই ভাবিনি। আজকাল পুরনো ছবিগুলোর দিকে তাকালে কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে। চোখের সামনে থেকে কুয়াশা মিলিয়ে যায়। ভাবনা ও কাজের মধ্যে সাযুজ্য থাকে না। মনে হয় অসুখের মধ্যে হারিয়ে যাবে একটি ম্রিয়মাণ কফিশপ। ধূসর স্মৃতিও বুঝে গেছে সহস্র চুম্বন পেরোলেও শরীর এখন শোকপ্রস্তাব পড়তে ব্যস্ত থাকবে। সজল মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাবে হলুদ-সবুজ শাড়ি, অভিশপ্ত চিলেকোঠা। সূর্যাস্তের দিকে অদৃশ্য পায়চারি শুরু হলে হুড়মুড় ভেঙে পড়বে সবুজ জানালা। ফসল কাটার মরশুম শুরু হবে। সেকথা জানে বিকেলের ঝিল। তাইতো সতেজ হয়ে আছে এখনও। আমি তার তল খুঁজি। পাই না। পূর্বজন্ম খুঁজি। পাই না। বুঝে যাই আস্তে আস্তে খিদে কমে আসছে। শুধুমাত্র শীতল তৃষ্ণা বেঁচে আছে। আমি হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি অন্তর্বাস। সরিয়ে দিচ্ছি টোটোওয়ালার হাসি ও খানাখন্দে ভরা ঝিল রোড। আচমকা শব্দহীন হয়ে পড়ল চারপাশ। বৃষ্টি নামবে। সেই বৃষ্টির আনন্দে ভিজে যাবে আমার ভেতরের মাঠ। বকুলগন্ধে উপচে পড়বে দূরের সরোবর।

চৌরাশিয়ার বাঁশি

এড়াতে পারি না যেভাবে ঠোঁটের দাগে কৌতূহল ভেবেছি। নিরালা রাস্তা এনেছে শোকপ্রস্তাব। ক্যালেন্ডারের প্রতিষ্ঠান বিরোধী আক্রোশ থিতু হয়ে গেল বুকে। ভেবেছি অদৃশ্য সাইকেলে সওয়ারী হব। চৌরাশিয়ার বাঁশি থেকে লুকিয়ে ফেলব স্নানদৃশ্য। নরম ভুলের ভেতরে ধুনুচি নাচ শুরু হলে আজও দেখা যায় নীল আলো থেকে সরে গেছে অস্থির ইঙ্গিত। ক্রমশ হতভম্ব দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল দীর্ঘ রাস্তাখানি। তখনই তো চিলেকোঠাজুড়ে উৎসব শুরু হয়। আদুরে বর্ণপরিচয় বড় হয়ে ওঠে। ঢুকে পড়ে সাইকেল যুবতীর রৌদ্রভরা চোখে। এও এক সত্যের অনুভব। সভ্যতার বাঁকে বাঁকে শিমুলছায়া খেলা। অসময়ে ঠিক নেমে পড়বে খড়দা স্টেশনে।

ভুল ট্রেন পেরিয়ে গেলে বুঝি যাবতীয় ঘুম ভিজে গেছে সবুজ বৃষ্টিতে। এ শহরে বাড়ি বদলের কথা ভাবি। খুলে ফেলি ট্রামের সোহাগ। ঘরে ফিরে দেখি নিজেকে চিনতে পারছি না ভেতরের কুয়াশায়। চশমার কাঁচে জমেছে অভিশাপ। আলোর দাক্ষিণ্য নিয়ে সব কিছু ক্ষয় হলে দ্রুত হাতে সাজিয়ে নিয়েছি মদের গ্লাস। এর বেশি কিছুই করার ছিল না আর। জেতাটাই অভ্যেস জানি, যোদ্ধার দুর্বলতা। কারা যেন হেঁটে গেল প্রজাপতিমুগ্ধ গোধূলি পেরিয়ে, তাদেরও আজকাল বড় আপন মনে হয়।

বে বী সা উ

সিলভিয়া প্লাখ

অলীক যন্ত্রণা দেখে মুক্ত হয়ে মেঘ নেমে আসে
তোমাকে সেখানে দেখি, পুরাতনী নার্স কোনো শুশ্রূষাজনিত
ঘরোয়া ঈশ্বর হয়ে ধুলিকণা মেপে নিচ্ছ হাতে
কীভাবে ক'জন আয়ু পায় এই শহরে আমার
হু হু করে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় ঈশানের দিকে
মানুষের ভালোবাসা মানুষের পাশে বসে আছে
যেখানে সূর্যের মতো আলোময়... কখনো আগুন
তোমাকে দেখেছি সেই তামাটে বিভায়

জমির ভেতর দিয়ে যে বীজ ফলনশীল, তার কাছে
একটি লাঙল শুয়ে আছে...

অফেলিয়া

জীবন তোমার কাছে একটি দুটি শব্দ হয়ে থাকে
আমি দেখি অন্ধকারে কে যেন আঁচড় কেটে যায়
যে পাতা ঝরেছে পথে তার নাম অফেলিয়া দিও

প্রতিটি চুম্বন জানে হত্যাকারী আসলে প্রেমিক
আমি তাকে পারি না ফেরাতে, সে আমার কাছে এসে নবজন্ম চায়

প্রদীপ দিয়েছি আমি, কুলুঙ্গিতে, মনস্কামনার
তুমি এই আলোটুকু লিখে নিও প্রথম খাতার...

লেডি ম্যাকবেথ

আমার স্বপ্নের পথে ছড়িয়ে রেখেছি অভিসার
যে পথেই যাব আমি, সে পথেই দুঃখ লেগে আছে।
কত হত্যা লিখলে তুমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে?
যে আমায় ভয় পায় আমি তার দোসর হয়েছি

যে স্বপ্নে আমার হাঁটা সেই ঘুম অনন্তচালিত
কবর খুঁড়েছে কেউ দেখি আমি চন্দ্রাহত রাতে
তুমি কি আদর নাকি বাজিয়েছে ইমন কল্যাণ?

আমার সমগ্রটুকু দেহ নয়, অভিমান ছিল...

নন্দিনী

বিপ্লবের মোহ আছে... কামনা মথিত...

ভুবনডাঙার ঘাটে বারবার সেও

অভিমানী চোখে লেখে
মৃত্যু আর জীবনের কথা

লেখে চিঠি, জমানো সংবাদ

ইতিউতি সফর দাস্তান...

তারপর পথে নামে
এলোচুলে ভরে যায় নারীজন্ম,
প্রেম
প্রত্যাখ্যান

অবশ্য এও ঠিক... বোঝে সেও

নারীর শরীর নিয়ে ততবার এই
প্রাচীর ভাঙবে
যত বার প্রেম তাকে পুনর্জন্ম দেবে

সু দী প্ত মা জি

শ্রীম

সুন্দরের ধারাভাষ্য যেন লীলাবতী জলস্রোত

আলোচনাচক্রে আসে কান্ট ও হেগেল, স্পেন্সার আসে।
বিদ্যার অলাতচক্রে জ্ঞান ঠিক কোনখানে জাগে,
জাগে জীবনের পূর্ণ জ্যোতি...
সাকার ও নিরাকার আসে...

অভিমান টপকে আসে তত্ত্বদর্শনের মুসাবিদা।
অবিদ্যার কালো মুছে যায়...

উপমা-সন্দেশ জাগে
অভিস্রুত আলো হয়ে কথামৃত জাগে...
ভাবের তরঙ্গে জাগে রামকেষ্টপুর...

সীতা

প্রেম তো কাঙাল করে...
তাও দেখো, প্রাচীন দেওয়ালে আজও
মাথা ঠোকে তামাম মানত

ওপাশে প্রবল স্রোত
রাষ্ট্র আর সমাজের পোষা নিয়ম-কানুন
সামাজিক পাপ, যোগাযোগ

আত্মঘাতী পুরুষের মন থেকে বের হয় হিসহিসে সাপ

বিশ্বাসের কাছে এসে বিশ্বাস হারায়
তারপর ভেসে যায়

প্রতিহিংসার কোলে
ডুবে যেতে যেতে সেও
আরেকবার মন চেয়ে বসে

ভিক্ষা নয়, অধিকারবলে...

রামচন্দ্র

প্রখর যুক্তির ভাষ্য নাস্তিকের,
ফালা ফালা করে দেওয়া যুক্তিজাল নিয়ে
প্রবল নৈরাশ্য থেকে একদিন
ঠাকুরের সামনে দাঁড়ালেন।

এরপর স্বপ্ন এল, ম্যাজিশিয়ানের
অল্প আলো-ছায়া মেশা খেলা এল...

এরপর সবকিছু দৈবাদিষ্ট। প্রার্থনাবিহীন
রামচন্দ্র মাস্তুলের ঠিকানা চাইলেন...

কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ মুছে দেওয়া
আলো জেগে ওঠে...

সে আলো অখিলানন্দ, সে আলো ভুবনভরা
পান্থপাদপের মধুমায়া...

হরিপ্রসন্ন

ধ্যান-ট্যান হয় না শুনে ঠাকুর জিহ্বায়
লিখলেন কিছু একটা, তারপরে
মাদারির খেলা!

নির্জন পঞ্চবটী সুন্দরের গন্ধে ম' ম' করে

হরির বিহ্বল দশা। মুচকি হেসেছেন তিনি।

জন্মাষ্টমীর রাত। গিরিশের গানে গানে উতলা বাতাস।
রাত্রি যত ঘন হয় ঠাকুরের উন্মাদনা বাড়ে।
পরশপাথর খুঁজে পাগলের মতো মা মা ডাক।

হরিপ্রসন্নের মধ্যে ভক্তের আকুতি ঢুকে পড়ে...

অন্তর্যামীর দিকে আরো একটু ঝুঁকে জাগছেন হরি
অন্তর্যামীর দিকে আরো একটু বেঁকে জাগছেন হরি
দেখতে পান নিরাকার ও সাকারের বহু ঊর্ধে
জেগে আছে ধ্রুবতারা, সপ্তঋষিদল

পৃথিবী — গল্পের এক সর্বনাম জেনে
জগৎ-ধারণা জাগে, জগতের ঊর্ধে জাগে জ্যোতি...

হরিনাম জাগে চরাচরে...

হরমোহন

কামিনীর গন্ধে দেহ বন্ধনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে

তবু ফল্গুধারা জাগে।
অনন্তের গান জাগে ঘরবাড়ি জুড়ে...

বাজারে বাজারে জাগে মহিমাকীর্তন।
ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে শ্রীরামকৃষ্ণের লিথোগ্রাফ।
গ্রন্থের মুদ্রণ আর বক্তৃতায় মেলে দেয় ঠাকুরের ডানা...

মায়ের নির্বাক স্নেহ অশোকপুষ্পের রেণু, ওড়ে

অধরলাল

ইতিহাস পুরাতত্ত্ব সব পথ ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে আসা।
ত্রিতাপদগ্ধের জন্য তাঁর কাছে বিশল্যকরণী রাখা থাকে—
প্রথম দর্শনেই পণ্ডিত অধরলাল সেকথা বুঝলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃত্তি পাওয়া ছেলে
অধরলাল একদিন অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে
ঠাকুরকে ঘরে আনলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এল।
জ্যোতি জাগে অধরের ঘরে।

অশ্বারোহণের কালে জগদম্বা জাগে।
আনন্দসাগর ডাকে শোভাবাজারের পথে।
আট দিন পরে, অধরলাল অধরা হলেন।
ঊষাকাল। বুধে পা। নয়ন অশ্রুর গানে ভরা।

গল্প

বিশ্বজিৎ সরদার

স্বপ্ননীল এক শহরের কথা

আ! ...বারুইপুরের সীমার মধ্যে ঢুকলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ন-ঘন্টা বাস জার্নি করার পর বাসটা যখন কামালগাছি নরেন্দ্রপুর রাজপুর পার হয়ে মালঞ্চ এসে পড়ে তখন শরীরের ক্লান্তিগুলো আস্তে আস্তে মুছে গিয়ে মনটা চনমনে হয়ে ওঠে। এত তো জায়গায় ঘুরলাম, এত জায়গায় থাকলাম, কিন্তু বারুইপুর বারুইপুর। ছায়াঘেরা ছোট্ট শহরের সন্ধ্যাগুলো মধুর স্মৃতিতে ভরপুর।

জন্মভূমি বলে কথা। যেখানেই তুমি যাওনা কেন যত টাকা কামাওনা কেন আর যত উঁচু ফ্ল্যাটে থাকো না কেন এর ছায়াশীতল স্নেহাঞ্চলের কোনো তুলনাই কোথাও পাবে না। গত ক'বছর ধরে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যই বোধ হয় এত বেশি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি। বাইপাসের ধারে আদি গঙ্গার পাড়ের উপর গাছপালার ছায়ার নিচে বসে বসে আবার কয় বন্ধু মিলে চুটিয়ে আড্ডা দিতে খুব ইচ্ছে হয়। বৈশাখ মাসের ঘ্যাঁসঘেঁসে গরমের সন্ধ্যায় ফুলতলার মাঠটার সবুজ ঘাসের বিছানার উপর গড়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সময় কোথায়? সত্যি, না গেলে বুঝতাম না বোধ হয় যে এই জায়গাগুলোকে এত ভালোবাসি। আর মানুষজন! সে নিয়ে আর আলাদা করে কী বলব?

এই এই! কী কর? ...পায়ের উপর চাকাটা তুলে দিলে তো। এই একটা সমস্যা আর ঘুচল না বারুইপুরের। জ্যাম অবশ্য কোথায় নেই? কিন্তু নিজের শহরের এ যন্ত্রণা যেন বড্ড কষ্টকর। এই একটা কষ্টের কোনো সুরাহা হল না বারুইপুরবাসীর। প্রি প্ল্যান্ড সিটি নয় তো। সময়ের প্রয়োজনে একটু একটু করে ছোট্ট একটা টাউন আস্তে আস্তে একটা শহরের রুপ নিচ্ছে। কিন্তু পুরোনো পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশন হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা রাস্তা। মোটে একটাই প্রধান রাস্তা। সোজা যেটা কামালগাছি থেকে ক্যানিং চলে যাচ্ছে শহরের মাঝখান থেকে। ওটাই শহরের ভরকেন্দ্র। দুধারে উঁচু উঁচু বাড়ি আর দোকানের মাঝখান থেকে সরু লিকলিকে একটা হেলে সাপের মত রাস্তাটা পড়ে আছে। বুকের উপর লক্ষ টন গাড়ির অহর্নিশি চাপ সহ্য ক'রে ক'রে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে যেন। দু'খানা বড় গাড়ি মুখোমুখি দাঁড়ালে ওর সাপে ব্যাঙ খাওয়ার মত অবস্থা। ওপারে সেই পদ্মপুকুর থেকে এদিকে পুরাতন বাজার একবার জড়িয়ে গেলে সব কাজ মাটি। অবশ্য ফ্লাইওভার আর বাইপাস চালু হওয়ার পর থেকে একটু যেন সুবিধা হয়েছে। কিন্তু একে সমাধান বলা যাবে না। ফ্লাইওভারটাতো এত সরু যে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় পাশে একটা গাড়ি এসে গেলে বুক ঢিপঢিপ করে। আর বাইপাসটা তো সম্পূর্ণই হল না এখনো। পদ্মপুকুর থেকে বংশীবটতলা পর্যন্ত একদিকের রাস্তাই নেই। আবার শাসন গেট থেকে রাস্তাটা গিয়ে কৃষ্ণমোহন এর দিকে নতুন বাইপাসে ঠেকবে তবে তো কাটবে জট। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে রাস্তাটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না। আসলে কে করবে সমাধান? সর্ষের মধ্যেই তো ভূত! কেন, নেতারা জানে না? এমএলএ—এমপির নাকের ডগায় তো সব। তারা কি কিছু বোঝে না? আসলে ওদের তো আর সমস্যা নেই। ওরা যখন যাবে তখন পুলিশ ঝেঁটিয়ে রাস্তা সাফ করে দেবে। যত অসুবিধা তোমার—আমার।

কে করবে সমাধান? সেই ছোট থেকে দেখছি। ফুলতলা থেকে পদ্মপুকুর পর্যন্ত গোটা রাস্তাটা একসঙ্গে ভালো অবস্থায় কখ্নো দেখলুম না। তার উপর খোঁড়াখুঁড়ি তো লেগেই আছে। বিডিও এসডিও কাউন্সিলর সবাই তো দেখছে রাস্তা দখল করে কীভাবে দোকানগুলো বাড়িগুলো ঘাপটি মেরে বসে আছে। মাঝে মাঝে শুধু নোটিশ পড়ে। তারপর আবার যে-কে সেই।

কে করবে সমাধান? কার অত দায়? অত আন্তরিকতা দেখানোর সময় কার আছে? বারুইপুরের যন্ত্রণা নিয়ে তাই বারুইপুর চুপ করে পড়ে আছে নিরুপায় হয়ে। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তো দেখতুম। আমি যদি মন্ত্রী হতুম তো দেখতুম কাজ হয় কিনা। দেখতুম বারুইপুরবাসীর দুঃখ ঘোঁচানো যেত কিনা। কিন্তু আমি মন্ত্রী হব কী করে? আমি তো পার্টি করি না। মন্ত্রী হতে গেলে তো পার্টি করতে হবে। ভোটে লড়তে হবে। আর মন্ত্রী হতে গেলে চাকরি করা যাবে না তো।

তবে এগিয়ে আসা উচিৎ। আমাদের মত শিক্ষিত যুবকেরা যদি এগিয়ে আসে তবেই সমস্যার সমাধান হবে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। নিজের কথা নিজের পরিবারের কথা অনেক তো ভাবলুম। জন্মভূমির জন্য কিছু করার জন্য মন চায়। আচ্ছা, আমি যদি ভোটে দাঁড়াই আমি জিতব না কি? অবশ্যই জিততে পারি। লোক ভালোমানুষ নেতা পায় না বলেই যত ক্রিমিনালগুলোকে ভোট দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া যেকোনো দলেই তো আমার মত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির উচ্চ শিক্ষিত যুবকের চাহিদা থাকবে। যখন তারা জানবে আমি ফরেন ইউনিভারসিটি থেকে পড়াশোনা করা লোক তখন আমাকে লুফে নেবে।

ফরেন শুনলেই কান দাঁড়িয়ে যাওয়া অসুখ এখনও এদেশের সারেনি। ঠিকই। চেষ্টা করে দেখলে হয়। রুলিং পার্টিতেই যাব দরকার হলে। আমার একটাই উদ্দেশ্য বারুইপুরকে সাজানো। দীর্ঘস্থায়ী রাজনীতির জন্য আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

আচ্ছা ধরো, যদি সত্যি সত্যি আমি মন্ত্রী হয়ে যাই। কি করব তখন? আচ্ছা, কী কী করা যেতে পারে? একটা খসড়া তৈরি করা যাক। বারুইপুর আগামীদিনে সকলের গন্তব্য হয়ে উঠবে। দেখবে তখন সবাই—আমি মন্ত্রী হবার পর বারুইপুর ছবির মত সেজে উঠবে। প্রথমেই রাস্তাটা নিয়ে পড়ব। বাইপাসটা যেটুকু অসম্পূর্ণ আছে সেটুকু তো হবেই। কৃষ্ণমোহন থেকে চাম্পাহাটি পর্যন্ত টু লেন রাস্তা দরকার। ফুলতলায় আর পুরাতন বাজারের কাছে হবে দুটো বড় টার্নিং। ওই যে বড় বড় শহরে যেরকম থাকে গোল গোল, চার ধার দিয়ে গাড়িগুলো ঘুরে ঘুরে যায়। মেন রাস্তাটা চওড়া হবে। যাদের দোকান বা বাড়ি ভাঙা পড়বে তাদের সব বাইপাসের ধারে জায়গা দেওয়া হবে। তাছাড়া ফুলতলা মাঠটারও সংস্কার করতে হবে। অত সুন্দর মাঠটা নষ্ট করে দিল। সব জায়গা দখল করে বসে গিয়েছে। স্টেডিয়ামটাও হল না। আমার স্বপ্ন এই মাঠটা একটা আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল গ্রাউন্ড হবে। মহামনির ইট ভাঁটার পুরো জায়গাটা তো প্রমোটারে গিলে নিয়েছে। ওই পুরো জায়গাটা উদ্ধার করা হবে। তারপর ওখানে আমার ইচ্ছা একটা বিশ্বমানের ইউনিভার্সিটি হোক। না—না-না ওই দোমড়ানো মোচড়ানো ইউনিভার্সিটি নয়। ডিপার্টমেন্ট আছে তো স্টুডেন্ট নেই। স্টুডেন্ট আছে তো ফ্যাকাল্টি নেই। ফ্যাকাল্টি আছে তো ল্যাব নেই। ওরকম হবে না। এক ডাকে যেরকম হার্ভার্ড অক্সফোর্ড কেমব্রিজ চেনে লোকে সেরকম। ওই জন্যই তো বিশ্বমানের কথাটা বললাম। নয়তো বিশ্ববিদ্যালয় তো বিশ্বমানেরই হওয়ার কথা। গোটা বারুইপুরের সামাজিক-অর্থনৈতিক চেহারাটাই পালটে যাবে। আর একটা জিনিস। হসপিটাল। নামে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। একটু কেস গড়বড় দেখলেই বাঙ্গুর কিম্বা চিত্তরঞ্জন ছোটো। এই দুর্গতি আর থাকবে না লোকের। আমি এর সমাধান করে দব। সারা ভারতবর্ষের সেরা চিকিৎসাকেন্দ্র হবে বারুইপুর হসপিটাল।

এসব কাজ কিন্তু সহজ নয় সে আমি জানি। তবে অসম্ভব কি? মানুষের কাজে মানুষের সহায়তা নিশ্চয়ই জুটে যাবে। সময় লাগবে হয়তো। তবে চেষ্টা তো করতেই হবে। কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। ধরা যাক আমিই এবার এগিয়ে এলাম। বারুইপুরকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন আছে কিন্তু। আমার জন্মভূমি। এখানেই আমি বড় হয়েছি। এখানকার মানুষজন আমাকে কত স্নেহ করেছেন। বিপদে আপদে ছুটে এসেছেন। এখানকার মানুষগুলো খুব ভালো। সকলের সাথে সকলের একটা টান যেটা বিদেশের কোথাও পাবে না। শুধু বিদেশ কেন? এই কল্যাণী কাটোয়া দুর্গাপুরই বা কি এমন? সব কেমন ছাড়া ছাড়া। কারো সাথে কারো যেন মনের মিল নেই।

যদি সত্যি এমন হয় আগামী দিনে আমার জন্মভূমিকে চোখ চেয়ে দেখবে সবাই। আ!...আ!...ও বাবাগো। মরে গেলামরে। উ! ভগবান...এত রাস্তা থাকতে আমাকেই ধাক্কা মারতে হল?

উ! লোকগুলো দেখো কীরকম হা করে দেখছে! ও দাদা একটু ধরুন না। ও ভাই একটু ধর...আমাকে তোলো। হসপিটালে নিয়ে যাও একটু। ... ও! পা-টা কীরকম নেতিয়ে পড়ে আছে দেখো। নাড়াতেই পারছিনা তো। কোমরের কাছটায় কোনো সাড়া পাচ্ছিনা। আমার হাত কই হাত? উ! একটু জল দাওনা কেউ। কি গো তোমরা কেউ একটু ধরবে না? আমি কি এভাবে পড়ে থাকবো? আমি তো কথা বলতে পারছিনা। দেখো দেখো কত লোক ভিড় করেছে। একটু হাওয়া ছাড়ো। আরে ও মশাই,... একটু ধরে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করতে পারছো না তোমরা? ভিড় করে কি দেখছো অ্যাঁ?

কেমন লোক এরা? সব দেখো কেমন উঁকি মারছে আর নাকে কাপড় দিয়ে চলে যাচ্ছে! আচ্ছা পুলিশগুলো গেল কোথায় পুলিশগুলো? কি হল রে বাবা শহরটার? একটা লোক এতগুলো মানুষের চোখের সামনে মরে যাচ্ছে কেউ একটু সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে না? ...এই দেখো, এই—এই-এই! একিরে! আমি পড়ে রয়েছি আর ছোঁড়াটা আমার মোবাইলটা বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখো—দেখো। এসব মানুষগুলো কি কানা হয়ে গেল? কিছু দেখতে পাচ্ছে না? মা গো তুমি কোথায়? সুনিতা সুনিতা...। ও দাদা কেউ অন্তত আমার বাড়িতে একটা ফোন করে দাও। আমার ব্যাগে আমার সব কাগজপত্র আছে। দেখো না গো একটু খুঁজে। না!

এজন্মে আর তোমাদের সাথে দেখা হল না সুনিতা। সোনামা...সোনামা কই আমার? সোনামা পাপা আর আসবে না সোনামা। উ! কাদের জন্য আমি ভাবছিলাম। কারো মনে একটুও দয়া মায়া কিচ্ছু নেই? সুনিতা সাবধানে থেকো। সোনামাকে সবসময় সাবধানে রেখো। তোমরা জান্তেও পারলেনা গো। আমি এত কাছে এসেও তোমাদের দেখতে পেলুম না গো। কেউ একটু তুলে দুশো মিটার দূরের হসপিটালটায় নিয়ে গেল না। আমি হয়তো বেঁচে যেতুম। কেমন হয়ে গিয়েছে শহরের লোকজন সুনিতা! তুমি সাবধানে থেকো। মাকে খবরটা সাবধানে দিও। আসি সুনিতা। ... সোনামা।

নি ত্যা ন ন্দ ম ণ্ড ল

সম্পর্ক

সকাল সকাল কাজ থেকে ফিরে কানু বৌ-কে ডেকে বলে, 'শুনছো, তেলের শিশিটা দাও তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসি। —আসছি বলে পুঁটি রান্নাঘর থেকে সর্ষের তেলের শিশিটা এনে টপাস করে রাখে কানুর সামনে। কানুর সাথে পুটির বিয়ে হয়েছে তা প্রায় দশ বছর হলো। ওদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে বড়ো। মেয়ে টেপি এখন ক্লাস ফাইভ এ পড়ে। ছেলে পল্টু দু'বছর হলো।

এখন আর পুঁটিকে ভালো লাগে না কানুর। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। মেয়ে বুঝতে পারলেও কিছু বলতে পারে না। ছেলে অনেকটাই ছোটো না বোঝারই কথা। তবে শোনা যায় কানু পাশের গ্রামের নমিতার সাথে একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরী করেছে। নমিতার বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রামে। কিন্তু তিন বছরে কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেনি ব'লে শ্বশুরবাড়ি থেকে 'বাঁজা' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এখন বাপের বাড়ি থাকে। বৃদ্ধ বাবা-মা ও নমিতা। তিন জনের সংসার। মাঝে মাঝে কানু সেখানে যাতায়াত করে। রাতের অন্ধকারে নির্জন মাঠে বসে অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনে মিলে গল্প করে। ঘন অন্ধকার রাত্রির মোহময়ী পরিবেশে দু'জন দুজনকে যেন ঠিক মতো চিনে নিতে থাকে। পাশে একটা কুকুর কখন যে এসে বসেছে কেউ টেরও পায় না। ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার পর কুকুরের উঁ—উঁ—উঁ শব্দ শুনে দুজন আলাদা হয়ে পড়ে। তার পর নমিতা 'যাও বলে দূরে সরিয়ে দেয় কানুকে।' কানু আর একটু জোরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল কিন্তু নমিতা তা হতে দেয়নি। বলে, তোমার আগের বৌ টাকে বিদায় করো।' তার পর আমার কাছে এসো।

কথাটা মনে লাগে কানুর। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতে থাকে কী করা যায়। রাতে পুঁটির পাশে শুয়ে শুয়ে নমিতার কথা ভাবতে থাকে। 'আগের বৌ টাকে বিদায় করো'— যেন পুনরাবৃত্তি হতে থাকে মনের মধ্যে। ডান হাতটা কপালের উপর দিয়ে মনে মনে ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে ঘুম ভেঙে যায় কানুর। সকালে কাজে যেতে হবে। বাবুর বাড়ি ধান ঝাড়াইয়ের কাজ। আজ শেষ হয়ে যাবে। যদি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে এই আশায়, সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়ে।

কাজ থেকে ফিরে বৌ-এর কাছে তেলের শিশি চেয়ে নেয়। বাম হাতে সর্ষের তেল নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দুই কানে ও নাকে তেল দেয়। তার পর পুঁটিকে বলে, আজ তোমাকে তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাব। তৈরি হয়ে নাও। যতো তাড়াতাড়ি পারো। সুনীল কাকার বোর্ড যাবে, তোমার বাপের বাড়ির ঐ দিকে। বলেই পুকুরে ডুব দিতে যায়।

পুঁটি তা প্রায় দুই বছর বাপের বাড়ি যায় না। ছেলে - মেয়ে মাঝে মাঝে বায়না ধরে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য, কিন্তু কানু কখনো রাজী হয় না। আসলে পুঁটির বাপের বাড়ির লোকজন কানুর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানে বলেই কানু শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না। পুঁটিরও যাওয়া হয় না। তবে আজ কানু যেভাবে এসে বললো তাতে পুঁটির প্রথমে সন্দেহ হয়ে ছিল। তবে কানুর হাসিমাখা মুখ দেখে পুঁটি রাজি হয়ে যায়। কানু আরো বলে ছেলে- মেয়েকে নিয়ে যাবো না। তোমাকে রাতের মধ্যে আবার বাড়ি নিয়ে আসবো। নেহাত সুনীল কাকাদের বোর্ড তোমার বাপের বাড়ির দিকে যাচ্ছে তাই তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি। ছেলে মেয়েকে আর কষ্ট করে নিয়ে যেতে হবে না। বিশ্বাস করে পুঁটি। ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রেখে বেরিয়ে পড়ে। মেয়ে তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি।

আজ একটা ডোরা কাটা লাল পাড়ের শাড়ি পরেছে। দু'পায়ে সুন্দর করে আলতা পরেছে। বড়ো করে একটা লাল সিঁন্দুরের টিপ পরেছে কপালে। শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় শাশুড়ি জড়িয়ে ধরে বলে, 'যাও মা ভালোয় ভালোয় ঘুরে এসো।' বেরিয়ে পড়ে পুঁটি। বিকালের সূর্যের রক্তিম আভা কপালের সিঁন্দুর বিন্দুকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। কানু একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তাড়া দিয়ে বলে, চলো তাড়াতাড়ি। তোমার জন্য বোর্ড অপেক্ষা করছে। দু'জন হাঁটতে থাকে। কানু আগে পুঁটি পিছনে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাড়া লাগায় কানু। নদীর পাড়ে বোর্ড বাঁধা। উঠে পড়ে দুজনে। বোর্ডে তিন জন। দুজনকে পুঁটি চেনে। আর এক জনকে চেনে না। পুঁটি ছেলে দুটোকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছিস তোরা?' ভালো। বলেই বোর্ড ছাড়ার জন্য তৎপর হয়। একজন কাছি খুলে দেয়, অন্য জন মেশিন স্টার্ট দিয়ে হাল-এ গিয়ে বসে।

সন্ধ্যা হবে হবে দয়াপুর খেয়াঘাট ছেড়ে গোমর নদী দিয়ে বোর্ড চলেছে সাতজেলিয়ার দিকে। এক দিকে কাঁচা জঙ্গল। অন্য দিকে মানুষের বসবাস। যে কোনো সময়ে বাঘ নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। অচেনা লোকটার সাথে কানু বসে বসে বিড়ি খায় আর গল্প করে। পুঁটি একা বোর্ডের ভিতরে বসে আছে। কালো মেঘে আকাশ ভরে গেছে। এখুনি হয়তো মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। পুঁটি একা বসে আছে দেখে একটা কোল্ড ড্রিংসের বোতল দিয়ে যায় কানু। পুঁটি ইতস্তত করে খেয়ে নেয়। কিছুক্ষণ পরে বোর্ডের ভিতর ঝিমিয়ে পড়ে।

গভীর জঙ্গলের খাড়ির ভিতর বোর্ড চালিয়ে দেয়। দু-পাশে কাঁচা জঙ্গল। জোয়ার নদীর মাঝামাঝি। জঙ্গলের ভিতর হরিণ-শিশুগুলো খেলা করছে আপনমনে। বোর্ডের শব্দে পাখিগুলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে, কিচিরমিচির শব্দ করে। নৌকার আগে পার্সে মাছগুলো লাফ কেটে দু'পাশে সরে যাচ্ছে। মিনে মাছগুলো যেন পাল্লা দিয়ে বোর্ডের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নদীর চরের লাল কাঁকড়াগুলো ভয়ে গর্তের মুখে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটু বেগতিক দেখলে তারা লুকিয়ে পড়বে। একটা হেঁতাল গাছের ঝোপ দেখে বোর্ড থেমে যায়। কানু বলে চারিদিকে ভালো করে দেখে নে 'বড়ো মামা নেই তো?' তার পর সন্তর্পণে পুঁটিকে ধরে নামায় বোর্ড থেকে। নাইলনের দড়ি দিয়ে হেঁতাল গাছের গায়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে দেয়। মুখে কাপড়ের টুকরো গুঁজে দেয় যাতে না চিৎকার করতে পারে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সকলে বোর্ডে এসে ওঠে। কানু বলে, 'যা! তোর বাপের বাড়ি, জন্মের মতো যা।'

একটু একটু করে হুঁশ ফেরে পুঁটির। কথা বলতে পারে না। শুধু বাঁধন মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করে। বোর্ড ছেড়ে দেয়। পুঁটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সামনে তাকিয়ে দেখে 'মনের আনন্দে চোখ বন্ধ করে বড়ো মামা বসে বসে জিহ্বা দিয়ে পা চাটছে'.....

কবিতা

ম ণি দী পা সা ন্যা ল
বাসন্তিকা

শেষ মাঘ পঞ্চমীর রাত
শিশিরের ভিজে হাত
চুপচাপ ছুঁয়ে যায় গাছেদের সারি
পরতে পরতে নামা বাহারের পাতা
আধফোটা ফুল, ডাল
আধোঘুম মা-পাখির আগলানো ডানা
ঝিরিপাতা নরম সবুজ
পেঁপে গাছটির পাশে অলস প্রশ্রয়ে শুয়ে থাকা
বাসন্তী রঙের জামা বাঁধন ছাড়ানো
হয়তো তখনি সারা দুনিয়া জুড়ে
ভারি তোলপাড়
আণবিক বোমা বিভীষিকা
ভালোবাসা পাখিটির শেষ ঘুম
হয়তো বা রাত শেষে চেনা মুঠি
তুলে নিয়ে যাবে ওই বাসন্তী রঙের জামা
তার আগে এক রাত
নিজেকে সাজিয়ে নেয়
শিশিরের স্নানে আর মুক্তির আরামে
অবুঝ সুষমা মাখা হলুদ জামাটি

দি লী প দে
প্রার্থনা

নীচু ক্লাসে বদ ছিলাম
উঁচুতে হয়ে উঠেছি বদমাশ,
এবার লক্ষ্য
দলবদলু খেতাব।

তবে খ্যাতির ষোলোকলা পূর্ণ হতে
অন্তত একটা গা-সওয়া স্ক্যাম
চাই-ই চাই।

সিলেকশান কমিশনার কি
আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন?

অ র্পি তা ঘো ষ পা লি ত
মেঘেদের ঘর বাড়ি

গাছেদের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো সে
মৃদু গুঞ্জন আর শালীন সুগন্ধ চারপাশে
রহস্য দুলছে বাতাসে
সুরে লেগে আছে ভ্রম
কম্পনের তীব্রতায় কেঁপে উঠেছিল বুক
তৃষ্ণার আসক্তি বুকে
জারিত হওয়ার মুখবন্দনাটুকু বাকি
ইচ্ছেবীজ অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই উপড়ে ফেলতে হয়
ব্যথা কতোটা আদর ও আলো ঝলমল বোঝেনা কেউ

চাইলেই সব শেষ হয় না
বিভ্রান্ত হয়ে কুহক লুকিয়ে থাকে
আগুন নিভলেও থেকে যায় শাশ্বত অধিকার
একদিন জেগে ওঠে স্মৃতির পুনরাবৃত্তি
দূরে একফালি মেঘ
বিষাদের পাহাড় যায় গলে, থাকেনা তৃষ্ণা
শুভ্র তুষারের মতো ভরে ওঠে বরফের আলোয়।

তী র্থ ঙ্ক র সু মি ত
মেঘ ধরতে দাও

কল্পনার মধ্যে একটা চিহ্ন আঁকা
দুটো হাত বাড়ানো আছে
সন্ধ্যাতারা জ্বললে,
কোনো আলো গল্প লেখে না
বিশ্বাসের ঘুমেরা আজ প্রাচীন দেশে
হামাগুড়ি দিতে দিতে আঁকছে আল্পনা
মেঘেরা এখনও ঘুমিয়ে
বৃষ্টি তুমি বাড়ি আছো?

রাতের আকাশ তপ্ত
আমায় মেঘ ধরতে দাও !

ই ন্দ্র নী ল ভ ট্টা চা র্য
স্রোত

স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝামাঝি
দাঁড়িয়ে রয়েছি বহুকাল।

আমি যখন সুরে গান গাই
তখন তোমার গলায় সুর থাকে না।

নদীর দুই পাড় কাছাকাছি আসে না কখনো
চলো; আমরা তবে, স্রোত হয়ে যেতে শিখি।

সু দে ষ্ণা গ ঙ্গো পা ধ্যা য়
শ্রাবণ, কুয়াশা, বৃষ্টি সব কিছুই আপেক্ষিক

খটখটে শ্রাবণে আমি হাঁসফাঁস করে তোমার ভাবনায় মশগুল
ওদিকে শহরের সমস্ত জলীয় বাষ্প চালান হয়ে যায় তোমার চারপাশে
আকণ্ঠ জলে ডুবে মেতে থাকো, ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দাও উত্তাপ
আকাশের সঙ্গেও শুনলাম রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ঠিক হয়েছে জলবণ্টন
বজ্রবিদ্যুৎ ছাড়া যতটুকু জল পাওয়া যায় সবটুকু ঝরবে, তুমি
যেখানে যেখানে পয়েন্ট করেছ সেইখানে।

অগত্যা, অশান্তি করে কে আর কবে যাক সে কথা
জলযাপন আর তোমায় ছোঁয়া এ জন্মে না হয় বাদ থাক
একটা নিরিবিলি পাহাড় দেখে এসেছি গাছঅলা, নরম সরম
কিছু বাঁশ, হোগলা জড়ো করে পাতাঘর বানিয়ে জুড়িয়ে নেব
হিমশীতল কুয়াশায় ঢেকে যাবে জ্বলন্ত শরীর, আহ আরাম!

দে বা শি স ম ল্লি ক
একটি কবিতা

সাদাপাতা, তোমাকেই উৎসর্গ করি
শীর্ণ এই লেখাগুলো
মাটির ধুলোর সঙ্গে মিশে
চলেছে আমার যাপনজুড়ে
জানি, ছন্দের ছুট হয় অহরহ
ট্যারাবাঁকা রাস্তাও বন্ধুর
অন্ধ বেহালাবাদকের
এই মরিয়া প্রয়াসের শুরু ও শেষ
তুমি জানো শুধু
গেরস্ত মানুষ সব দ্যাখে আড়চোখে
আর শব্দ-চাঁড়াল আমি, একেলা
জগৎ ভুলে পড়ে থাকি আঘাটায়।

রা জী ব ক র
গল্পের মতো

আমার হাড়-জিরজিরে বাবা শূন্যতা ধুয়ে খেত। আমাদেরও জোর করে খাওয়াত।
অনেকেই যখন মাছ-মাংস খাচ্ছে আমরা তখন শূন্যতা চিবিয়ে খেতাম।
সুযোগ ছিল, সামনে বই ছিল একাধিক পূর্ণতোয়া, ইচ্ছে করলেই ভাসতে পারত, বয়ে যেতে পারত বহুদূর,
আমাদেরও সাঁতার শেখাতে পারত, আমরা হৃষ্টপুষ্ট হতাম, বাবা হতে পারত হত্তাকত্তা।
তবু সন্তের মতো ধুনি জ্বেলে ব্যোম দেখাত ওই নীহারিকা, তারালোক...।
এই নিরালোকে আমরা তো অন্ধ তখন, মণির ভিতর বিতত আলো নেই।

শূন্যতার ফলের ভিতর ছিল অকাল-অসুখ। সেই ফল খেয়ে দুই দিদি, বাবা আর মা বেঁচে গেল।
তছনছ সংসারে মরে থাকলাম বাকি পাঁচ নীরব রুগ্নতায়।
ডারউইন সাহেব যেমনটা বলেছেন।
এই তবে উদ্বর্তন? তাহলে আমরাই যোগ্যতম?

গোলকধাঁধার শহর চুপিচুপি বয়েস বাড়ায়!
আর যেন শূন্যতা ধুয়ে খেতে না হয়, হে গলিঘুঁজি!
সুযোগ খুঁজি। সুযোগের অভাবে আপাতত নিঃস্ব হয়ে আছি।

বাইরে বেরলে মাঝেমাঝে রাস্তায় এখনো বাবার সঙ্গে দেখা হয়। দেখি, কুঁজো হয়ে হাঁটছে,
তবু লাঠির সাপোর্ট নেবে না। ফুটপাতে বসে জল দিয়ে শূন্যতা মেখে খাচ্ছে, তবু নুন নেবে না।
রাস্তার হোটেলের কোণে একপাহাড় থালা-বাসন ধুচ্ছে।
ব্যাঙের আধুলি থেকে অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছে তারই মতো কোনো শুদ্ধতাকে।

আমার হাড় কনকন করে। মাথায় আগুন। দাঁত কিড়মিড় করে বলি কী পেলে?
নির্বিকার গ্রীবা তুলে বাবা বলে "একটা অনিন্দ্য জীবন"।

র বী ন চ ক্র ব র্তী
শ্বাশত মানব মিছিল

একটা শরীর দু'টো হাত।
একটা শরীর আর একখানা মাথা।
দু"টো হাত থেকে হয় দশ খানা হাত,
দশ হাত থেকে হয় বিশ খানা হাত।
এক মাথা থেকে হয় পাঁচ জোড়া মাথা।
সে কোনও দানব চেহারা না ঈশ্বরের রূপ,
বরাভয়, পরাক্রম না কি ক্ষমতার ভাষা।
না কি অর্থহীন যুক্তিহীন কল্প বিলাসিতা।

আমি এক ছা'পোষা মধ্যবিত্ত। রজ্জু দেখে সর্পভয়ে ভীত,
দশহাত, বিশহাত চেহারা দেখে সন্ত্রস্ত, ভীত, মাথানত।
হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমারই মাথার পাশে
জড়ো হয় দশ মাথা, বিশ মাথা, হাজার হাজার মাথা,
সারি সারি মাথা। আমারই শরীরে আচম্বিতে
জুড়ে গেছে এক হাজার দশ হাজার হাত।

ক্ষমতার হাত নয়, দম্ভের মাথা নয়, দুঃখ কান্না কিংবা
ক্রোধ হিংসা নয়, অত্যাচার কিংবা প্রতিবাদি হাত নয়
এক সাথে জড়ো হওয়া ছা'পোষা মানুষ মাথা, মানুষের হাত।
হাজার হাজার করতল। করতলে সাজানো প্রদীপ শিখা।

প্রজ্বলিত মানুষের আলো। ঝলমল মানব মিছিল।
উন্নত মস্তক, ঋজু শিরদাঁড়া। ওরা সোজাসুজি কথা বলে,
মন খুলে গান করে, কবিতা গল্প লেখে, মানুষকে ভালবাসে,
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে টান টান হেঁটে চলে।
শ্বাশত সম্ভ্রমে সহস্র শতাব্দী কাল শান্তির বেহালা বাজায়।

অ রু ণি মা চ ট্টো পা ধ্যা য়
সেই গান বাজে

বাগানের কোণ ঘেঁষে দুঃখ ফুটে থাকে
জ্যোৎস্না ঘিরে থাকে নরম কুয়াশার মতো
টুপটুপ গল্প ঝরে নীল ঘাসে একটানা
চাঁদের বাঁকা তোবড়ানো কাঁসিতে কান্না জমে
জুঁইফুলী বাস ছড়ায় রাত যত গাঢ় হয়
রাতচরা পাখি ডাকে নদীর ওপার থেকে
তারারা নাকফুল পরে রাত পাড়ি দেয়
মোহনার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়ায়
চোখ বন্ধ করে চিবুক তুলে ধরে
তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হারিয়ে যায়
মেঘ-রঙ আলোর সাগরে ...
মন কেমন করে শ্যামলা ছেলেটার
বাঁশি বাজে না হাসি সাজে না
আজও রাজকন্যার মন জানা হলো না
শুধু বুকের মাঝে শোনা যায়
দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, তবু
বাগানের কোণ ঘেঁষে দুঃখ ফুটে থাকে
মেঘরঙ আলোয় দুঃখ ফুটে থাকে

ছোট উপন্যাস

তাপস রায়

ডাকাতিয়া বাঁশি

এ বজরা জমিদার প্রসন্নকুমারের। মীন শোভিত নাটোরের পতাকা পতপত করে উড়ছে। বজরা চলেছে কালিক্ষেত্রের দিকে। বজরায় অনেক লোকজন। সবাই পুণ্যার্থী। কয়েকজন মাত্র বিধবা মহিলা, আর সবাই পুরুষ। বজরা ভৈরব হয়ে ইছামতী ধরে ভাগীরথীতে পড়বে। দিনের বেলায় বজরা চলে, রাতে চলাচল নিষেধ। রাতে চললে যেমন দস্যুদের ভয়, তেমনি জল পুলিশেরও ভয়। জমিদারের পতাকা অন্ধকারে না দেখে পুলিশ বজরায় হামলা চালাতে পারে। মাঝিদের তাই নির্দেশ দেয়া আছে সন্ধ্যার আগেই কোনো লোকালয়ের পাশে ঘাটে বজরা বাঁধতে হবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি তখন। বজরা ভাগীরথীর বুকে বিকেলের অমলিন সৌন্দর্য আর সুমিষ্ট হাওয়া মেখে খুব ধীরে চলছিল। মহেশ বাগদি একদম জমিদার বেশে সজ্জিত হয়ে বজরার ছইয়ের বাইরে এসে একখানা চেয়ারে বসে বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করার ভঙ্গি দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে স্বয়ং জমিদার চলছে এই বজরায়। তা জানান দেবার জন্য আলবোলার নল মুখে নিয়ে প্রতিদিনের মতো বসেছে সে। তখনও বজরা ভেড়াবার সময় হয়নি। কিন্তু খুব উচ্চ ধ্বনিতে ঢাক-ঢোল কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ সহ জয়োধ্বনি শুনে মাঝিদের ইঙ্গিত করল নদীর পাড়ের দিকে নিয়ে যেতে। তার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে।

মহেশ বাগদি সহ বজরার বাইরে যারা হাল ধরে ছিল আর দাঁড় বাইছিল ,তারা দেখল নদীর দিকটা খোলা রেখে পাড়ে বেশ জমায়েত। এমনকি নদীর পাশের উঁচু রাস্তার উপরে লোকজনের ভিড়। নোঙ্গর না ফেলে স্রোতের ভেতর বজরা দাঁড় করিয়ে রাখা কম কসরতের কাজ নয়। স্রোতের উল্টো দিকে অল্প অল্প করে বৈঠা মারতে হয়। ডাকাতি করতে গেলে এই বিদ্যেটা খুব দরকার। ছিপ নৌকো নিয়ে দ্রুত জলের বুকে মিলিয়ে যেতে তারা কখনো ঘাটে নোঙর ফেলে না।

মহেশ বাগদি তার নিজের বিস্ফারিত চোখের ভেতর ঘটনার ঘনঘটা ঢুকে আসা টের পেল। সে হাঁ করে দেখতে থাকল হাত দুয়েক চওড়া আর হাত তিনেক লম্বা কাঠের বেদি তা উঁচুও করা হয়েছে ওরকম হাত তিনেক। সে বেদির উপরে আর কাঠের ভেতরে সাদা সাদা পাটকাঠি চোখে পড়ছে। নামাবলি গায়ে একজন তার উপরে এক গামলা ঘি এনে কুশিতে করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হল ইনি পুরোহিত হবেন। তারপর সেই পুরোহিত ঘুরে ঘুরে ধুনোও ছড়াল।

তাহলে এটা শ্মশানঘাট। মহেশ বাগদি নিজের মনেই বিড়বিড় করল, খুব বড় লোকের স্বর্গারোহনের ব্যবস্থা চলছে তাহলে। রাজা প্রসন্নকুমারের কাজে না এলে আজ রাতেই বড়লোকগিরি ছুটিয়ে দিত। ওই বাড়ির ধনরত্ন সব এই বজরায় ঢুকে পড়ত। কিন্তু জমিদারবাবু পইপই করে বলে দিয়েছেন, কোনো খারাপ কাজে জড়ান যাবে না। ধরা পড়লে প্রসন্নকুমারের নাম খারাপ হবে। তাছাড়া কলকাতায় জল-পুলিশ খুবই সক্রিয়।

মহেশ বাগদি দেখল, সমবেত ভিড়ের ভেতর থেকে এক রমণী আলুথালু বেশে এল। তারপর সব বয়স্ক মানুষদের গড় হয়ে প্রণাম করতে থাকল।

ওরকম কেন করছে মেয়েলোকটা! সতী হবে নাকি! ছোটবেলায় দেখা এক সতী হবার দৃশ্য তাকে ঘর থেকে বের করে এনে ডাকাত করেছিল। খুব মনে আসছে সেদিন কীভাবে বাচ্চা মেয়েটিকে, যে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইছিল, ধরে এনে মাথায় বাঁশের লাঠি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার আত্মীয়রা জ্বলন্ত চিতার উপর তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে মহেশ বাগদির। তার দেড় হাত চওড়া বুকের উপর থেকে মখমলের কাপড় খসে পড়েছে। উঁচু নিচু হচ্ছে বুক। ছোটবেলার মতো রাগ পুষে রেখে দিন দু'য়েক টাইম দেবে না। একবার ওই রমণী আর্তনাদ করলেই এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা নেবে। এখন তার বজরায় রয়েছে মাস্কেট বন্দুক। ভল্ল, তরবারি, খাঁড়া রয়েছে। আর তেলে চোবানো লাঠির বনবন ঘুরে ওঠার ভেতর কয়েকখানা মাথা ফাটলেই ওসব অস্ত্র ব্যবহার করতেই হবে না। ডাকাত সর্দার উঠে

দাঁড়িয়েছে ডেকের উপরে থাকা চেয়ার থেকে। তখন একজন লুঙ্গি পরা, কামালুদ্দিন হবে হয়ত, যে তামাক সাজে, কাছাকাছি থাকে সর্দারের, পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় আদেশের স্বরে বলল, " বইসা পড়েন। উত্তেজিত হওন কোনো কামে আহে না। আগে দ্যাহেন।"

সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়েছে ডাকাত সর্দার। কিন্তু কামালের কথায় বসে পড়ে আবার চেয়ারে। কাঠের পাটাতনের উপর থেকে তুলে নেয় গায়ের আবরণ, আবার শরীরে জড়ায়।

মহেশ বাগদি দেখল সেই রমণী প্রণাম শেষ করে চলে এল সেই প্রস্তুত করে রাখা চিতার পাশে। এক বালক খুব কাঁদছিল। তার মাথায় চুম্বন করল সেই রমণী। গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে কিছু দিল পুরোহিতের হাতে আর একটা একটা করে দিতে থাকল উপস্থিত মেয়ে লোকদের ভেতর — গলার হার, কানের দুল, বাউটি, কোমরের বিছে হার, হাতের আংটি, চুড়ি, নাকের নথ—সব কিছু। তারপর চিতার পাশে উপস্থিত হয়ে সে তার গায়ের কাপড় খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল।

"অপূর্ব রমণী। নিখুঁত সুন্দরী!" মহেশ বাগদির মুখ থেকে বেরিয়ে এল স্বর।

সেই রমণী চিতাবেদী পরিক্রমা করল তিনবার। সে যে স্বামীর বাসরে প্রবেশ করবে এবার। তাই তো নির্ভার হয়ে নিয়েছে। সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। সেই রমণী চিতায় উঠে আগে থেকে রাখা মৃতদেহর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আলিঙ্গন করল। তখনই হরিধ্বনি আর বাদ্যভাণ্ড। সতীর নামেও উঠল জয়োধ্বনি।

"এখনও সময় আছে কামাল। ওই সৌন্দর্য প্রতিমা প্রাণকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে আসি।"

" রাজাবাবুর কতা ভুলে মারছেন না কি! কুনো ঝামেলায় না জড়াইতে কইছেন। যে কাজে আইছেন, হেইডা গুপনে হাসিল কইর‍্যা ফেরতে অইব। তাছাড়া ওই মেয়েমানুষ তো নিজের ইচ্ছেয় চিতায় উঠল!"

কামালের যুক্তি ফেলে দেবার নয়। মহেশ বাগদি দেখল সেসময় ভারি ভারি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে চিতার চারপাশ আর উপর ঢেকে দিচ্ছে লোকজন। দড়ি দিয়ে জীবিত ও মৃতকে আগেই বেঁধে ফেলেছে। এরপর খড়ের রাশি বিছিয়ে দিয়েছে চিতার উপর। সেসময় প্রবল বাদ্যধ্বনির ভেতর সেই ক্রন্দনরত বালক একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে কাঠের ফাঁক থেকে মৃত পিতার মুখাগ্নি করলে চণ্ডাল এসে অন্যান্য কাঠে আর খড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ঘি আর ধুনোর দাহ্যতা নিয়ে আগুন হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল চিতায়।

ডাকাত সর্দার ব্যথাতুর হয়েও তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ। সে দেখল চিতার ভেতর থেকে সেই রমণীর একটি হাত বেরিয়ে এসে আন্দোলিত হচ্ছে, আর খুব তীক্ষ্ণকণ্ঠের একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল, "চিন্তাহরণ, চিন্তাহরণ, তোমার জয় হোক।"

এই কথা ক'টির জন্য বুঝি বাদ্যযন্ত্র আর জয়ধ্বনি কিছুটা থেমে ছিল। সমবেত বাদ্য এর পর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধ্বনি উঠল, "জয় সতীমায়ের জয়। জয় মহাশ্মশান নিমতলাঘাটের জয়।"

কামাল বলল, "হুনছেন সর্দার, জয়োধ্বনিতে কী উচ্চারণ হল!"

"না না আমি শুনতে চাই না। আমি আর সইতে পারছি না। আমি বজরার ভেতরে যাব। আমার হাত ধরো কামাল।"

ডাকাত সর্দার মহেশ বাগদি, যার নামে জমিদার, বৃটিশ সব কাঁপতে থাকে, সেই মহেশ ডাকাত কাঁপতে কাঁপতে কামালের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে বজরার ভেতর ঢুকে পড়তে পড়তে বলল, "কামাল, মাঝিদের বলো বজরা ভাসিয়ে দিতে।"

" কুথায় ভাসাইব! আমাগো কাজের জায়গায় তো আইস্যা পড়ছি। হুনলেন না ধ্বনি দেল নিমতলা শ্মশানঘাটের নামে। রাজাবাবু তো আমাদের এই ঘাটেই থানা দিতে কইছেন।"

দুই

খবর আগেই পেয়েছিল কামালুদ্দিন। সে বাওনের বেশে কাশী মিত্র ঘাটে চান করতে গিয়েছিল। ঘাটের পাশেই

শ্মশান। সকাল সকাল মড়া পড়েছে অনেকগুলো। শব অনুগমন করে এসেছে এমন একদল লোকের ভেতর চাপা কথা হচ্ছিল। কামালুদ্দিনের কান খুবই খাড়া। ডাকাতদের চোখ-কান খুব খোলা রাখতে হয়। পালা করে কামালুদ্দিনরা পাউডার মিল ঘাট থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত রোজ সকালবেলায় ঘোরাঘুরি করে। কামালুদ্দিনই খবরটা তুলল। 'কাতলা মারা' যে ডাকাতি তা তো কামালুদ্দিনরা জানে। এই খবরের জন্যই তো এতদিন দমধরে বসেছিল। মাঘি অমাবশ্যার রাতে কাতলা মারবে মিত্তির বাড়িতে চিতের দল। আগে চিত্তেশ্বরীর পুজো দেবে ওরা, তারপর হানা।

রাজশাহীর জমিদার প্রসন্নকুমারের কাজ নিয়ে এসেছে মহেশ বাগদি। কাজ শেষ না করে ফিরতে পারছে না। জমিদার যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়েছেন। ওদের বজরা কয়েক মাস ধরে থানা দিয়ে বসে আছে নিমতলাঘাট আর জোড়াবাগান ঘাটের মাঝখানে। চারটে ছিপ নৌকোয় নদীতে ঘাটের কাছাকাছি জায়গায় ঘোরাঘুরি করে রোজ। কামালুদ্দিন খবর আনল।

অমাবশ্যার রাত। রাত দুটো হবে। কানাই মণ্ডল, মদন মাঝি, কামালুদ্দিন, রামলাল ওঝা, কলিমুদ্দি—সবাই মুখে, বুকে এমন কালি মেখেছে যে নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারছে না। মিত্তির বাড়ির উঁচু পাচিল টপকে আগেই ওরা জায়গার দখল নিয়ে নিয়েছে। চিতে ডাকাতের দল যে চিত্তেশ্বরীতে পুজো দিয়ে আসবে, তা শুনে নিয়েছিল। ফলে রাত গভীর হবার কথা। মহেশ বাগদি দলের নেতা, সে জানে কীভাবে ডাকাতরা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢোকে। পাঁচিলের পাশে গাছপালা থাকলে সুবিধা। সেই গাছ বেয়ে উঠে ভেতরে ঝাঁপাতে পারে। কামালুদ্দিন তিনজনকে নিয়ে সেই গাছের পাশে জায়গা নিল। তার লাঠি হাওয়ার আগে ছোটে। টুঁ শব্দ করতে দেয় না শত্রুদের। মহেশের গোটা দল এসেছে। এমনকি বজরার মাঝিও। নির্দেশ, কোনো শক্তি ক্ষয় করা যাবে না। চিতে ডাকাতদের আহত করে টেনে নিয়ে ওই মন্দিরের পাশেই ফেলবে। সকাল হলে যাতে ওরা চিকিৎসা পায়। আর দু'জনকে ধরে নিয়ে যাবে রাজশাহীতে। জমিদার প্রসন্নকুমারকে প্রমাণ দেখাতে হবে না!

২১মাঘ 'চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত একটা খবরে নড়েচড়ে বসল গোটা কলকাতার বাবুরা! রবিবারের সকালে নিজেদের বৈঠকখানায় বসে অনেকেই অস্থির। খবরে প্রকাশ হয়েছে চিত্তেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলের ত্রাস, অগ্রগণ্য ডাকাত দল, চিতে ডাকাতেরা সব ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। মাঘি অমাবশ্যার রাতে নিজেদের ভেতর ডাকাতির বখরা নিয়ে মারামারি করে মন্দিরের কাছে অনেকেই আহত হয়ে পড়েছিল। পরদিন পুলিশ সবকটিকে গ্রেফতার করেছে। তবে দলের সর্দার চিতে ডাকাতকে পাওয়া যায়নি।

মহেশ বাগদি গঙ্গার বুকে বজরার ডেকে বসে ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস সেবন করছিল একা একা। রাতের শেষ তারাটি তখনো মিটমিট করছে আকাশে। সেই তারাটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মহেশ ফিসফিস করল, " তুমি যেই হও না কেন, চলে যেও না। আমি তোমাকে প্রণাম করে দিন শুরু করি। শোনো গো তারা-বৌ। আমি জানি তুমি সে-ই। সেই সেদিন স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠে তুমি আর্ত চিৎকার করছিলে। তুমি আমাকে ডাকছিলে। বলছিলে, বাঁচাও, আমাকে বাঁচতে দাও। আমি পারিনি গো। পরদিন থেকে রোজ ভোরবেলায় তুমি ঠিক শ্মশানের উপরে ফুটে আছ। আমি বুঝেছি সে তুমি তুমিই। আমার প্রসন্নবাবুর কাজ শেষ করেছি, এবার তোমার কাজ। তোমাকে যারা মেরেছে, তাদের জ্যান্ত না পুড়িয়ে আমি ছাড়ব না। আমি মহেশ ডাকাত।"

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল মহেশ। নিজের বুকের যন্ত্রণা হালকা করতে রোজ সকালে সে এমন করে কাঁদে। মাঝ নদীতে তখন বজরায় অন্য ডাকাতেরা ঘুমোচ্ছে। তখন কামালুদ্দিনরা পাশে নেই। মহেশ নিজেকে ধৌত করে নেয় ওই কান্নায়। সে রাতে ঘুমোতে পারে না। ওই জ্বলন্ত সুন্দরী মেয়ে তার ঘুমের ভেতর এসে হি হি করে হাসে। সে ব্যাঙ্গ করে। তুমি মহেশ ডাকাত! বুক চাপড়ে লোককে ভয় দেখাও! আসলে তুমি ভীরু, কাপুরুষ। তোমার চোখের সামনে গোটাকয় সাধারণ লোক অবলা মেয়েমানুষ জ্যান্ত পুড়িয়ে দেয়, তুমি কিছু করতে পারো না!

মহেশের চোখের উপর সেদিনের দেখা শ্মশানের দৃশ্য ফুটে ওঠে। ধড়মড় করে মহেশ বিছানায় উঠে বসে। আর সে ঘুমোতে যায় না। সে জেগে থাকে। বজরার জানালায় আলো-অন্ধকার দেখা দিলে, আর জলের বুকে ঘাই উঠলে ভোর

হওয়া টের পায়। ভোরবেলায় যে জোয়ার আসে। মহেশ বজরার ঘর থেকে বেরিয়ে ডেকের উপরে থাকা চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দেয়।

কামালুদ্দিন কাঠকয়লার ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে এসে বলে, "কত্তা, আবারও রাতে ঘুমোন নাই। শরীরে চাপ পড়বেনে যে! আমাদের কাম শেষ। চিতে ডাকাতের বাহিনীকে তো শায়েস্তা করা হয়ে গেছে, এবার আমরা ফিরি। তুমি নোঙর তোলার আদেশ দাও।"

"তোরা খুবই স্বার্থপররে কামাল। তোদের কাজ হয়ে গেল, অমনি পাততাড়ি গুটোনোর কথা কচ্ছিস। কিন্তু আমার নিজেরও তো কোনো কাজ থাকতে পারে!"

লজ্জা পায় কামালুদ্দিন। সে মুখের কাঠ-কয়লা শব্দ করে নদীর বুকে ফেলে বলে, " অন্যায় হইছে কত্তা। বলো, তোমার কি কাজ। আমরা জান দিয়ে তোমার কাজ তুলে দেব।"

একটা চাপা হিসহিসে কণ্ঠ বের করল মহেশ বাগদি। বলল, "এক মাস আগে এখানে নিমতলা শ্মশানে এক বাচ্চা মেয়েকে জ্যান্ত পোড়ানো আমরা দেখেছিলাম, মনে আছে?"

" হ্যাঁ কত্তা। থাকবে না কেন। তুমি সেদিন মেয়েটারে বাঁচাতি চায়েছিলে। আমিই বাঁধা দিয়েছিলাম।"

"সেজন্যই তো রোজ রাতে আমি নিজেরে ঘেন্না করি। ঘুমোতে পারি না। নিজের পরাজয় রোজ চোখের উপর উঠে আসে। আমি ওই মেয়েকে কেন বাঁচাতে ঝাঁপালাম না! বুকে করাঘাত করি।"

কামালুদ্দিন বলল, "দোষ নেবেন না কত্তা। তখন নিজেদের জানান দিলে আমরা চিতে ডাকাতদের এত নিখুঁত করে শায়েস্তা করতে পারতাম না। তাছাড়া জমিদার প্রসন্ন রায়ের কাজে আমরা আইছি। আমরা মিছেমিছি শক্তি ক্ষয় করতে যাব কেন! আমাদের যা কাজ, সেটা করেই ফিরে যাব।"

"চোপ! চোপ!"

কেঁপে ওঠে কামালুদ্দিন ওই বাঘের মতো গর্জনে। তার হাত এমনি এমনি প্রণাম-ভঙ্গি হয়ে আসে। তার কানে যায় ডাকাত মহেশ বাগদির ক্রুদ্ধ স্বর।

"সেদিন আমারে নিরস্ত করে যে পাপ তুই করিছিস, তার শাস্তি তোরে পেতেই হবে।"

" কত্তা এবারের মতো মাপ করি দেন।" গলা কাঁপছে কামালুদ্দিনের।

" মাফ টাফ আমি বুঝি না। আমি দু'দিনের ভেতর ওই যারা সেদিন মেয়েটারে জ্বালিয়ে মেরেছিল, তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর চাই। আমি প্রতিশোধ না নিয়ে এখান থেকে এক পাও নড়ব না। আর জমিদার প্রসন্ন রায়কে কোনো খবর পাঠানোর দরকার নাই। আমরা একেবারে ফিরে গিয়েই চিতে ডাকাত নিকেষের কাহিনি শোনাব।"

কাশি মিত্র ঘাটে গিয়ে চিতে ডাকাতদের খবর তুলতে বাওনের বেশ নিয়েছিল কামালুদ্দিন। এবার আর একই কায়দা না। সর্দার সময়ও বেঁধে দিয়েছে। যদি দুদিনের ভেতর সে নিজে খবর তুলতে না পারে! ডাকাত দলের সাফল্য আসে ঠিকঠাক খবর সংগ্রহ আর সেই খবর অনুযায়ী নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে। কামালুদ্দিন নিজেদের দলের চারজনকে পালকির বেহারা বানিয়ে কাছাকাছি পালকি আড্ডায় ছেড়ে দিল। তাদের বজরায় একটি সুদৃশ্য পালকি সবসময় থাকে। গ্রামের ভেতর দিনের বেলায় যাতায়াত করার জন্য জমিদার বেশে মহেশ বাগদি সেই পালকিখানা ব্যবহার করে। পালকির আড্ডায় গিয়ে দাঁড়াবে ওরা। আর কামালুদ্দিন নিজে নিল ফিরিওয়ালার পোশাক। সঙ্গে একজন ঝাঁকামুটে।

কামালুদ্দিন মহেশ ডাকাতের খাস চাকর এমনি এমনি হয়নি। সে খুব নিখুঁত করে পরিবেশ বিচার করতে পারে। সেদিন যে জ্যান্ত মেয়েটিকে পোড়াচ্ছিল ওরা তাতে দুটি কথা খুব মনে রেখেছে কামালুদ্দিন। এক নিমতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে জয়োধ্বনি উঠেছিল। আর জ্বলন্ত চিতা থেকে জ্যান্ত পুড়তে থাকা সেই নারী হাত নাড়তে নাড়তে বলেছিল, চিন্তাহরণ, তোমার জয় হোক।

"ক্ষেত্তুরে বাসন চাই গো। ক্ষেত্তুরে বাসন।"

বড় বড় কাঁসার জামবাটি, থালা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কামালুদ্দিন। সে নিজের মাথায় নিজে ছাতা ধরেছে। আর ঝাঁকামুটের মাথায় বাসন। নিমতলা ঘাট স্ট্রিট হয়ে নিমতলা লেন-এ ঢুকে হাঁক পাড়তে পাড়তে সে চলেছে।

"বাসন রাখবে মা বাসন। ক্ষেত্তুরে বাসন।"

কামালুদ্দিন ফেরিওয়ালার সাজ নেবার আগে সব যাচাই করে নিয়েছে। অন্যান্য ফেরিওয়ালারা কেমন করে হাঁকে। লোকে কোনটা বেশি নেয়। বর্ধিষ্ণু পরিবারের লোকেরা মাটির বাসন নয়, কাঁসার বাসন নিতে চায়। আর ক্ষেত্তুরে হলে তো কথাই নেই। ফ্রিতে ধম্মও করা হলো। মানে শ্রীক্ষেত্র পুরীর বাসনের চাহিদা আছে ধর্মপ্রাণ মানুষদের ভেতর।

বাসন বিক্রী করা কামালুদ্দিনের উদ্দেশ্য নয়। কামালুদ্দিন গৃহস্থ্য বাড়ির দাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে জানবে কোন বাড়ির লোকেরা এই মাসখানেকের ভেতর সতী মায়ের কাজ জাঁকজমক করে করেছে নিমতলা শ্মশানে। কামালুদ্দিন একজন শাকরেদের মাথায় বাসনের ঝুড়ি চাপিয়ে দিয়ে নিজে ছোট একটা লাঠি দিয়ে কাঁসর বাজাতে বাজাতে হেঁকে যেতে লাগল, " বাসন নেবে গো। ক্ষেত্তুরে বাসন।"

"হৈ আরে হোঃ হৈ আরে হোঃ"

এদিকে সমবেত এই গান ভাজতে ভাজতে নকল বেহারারা জোড়াসাঁকোর একটা পালকি আড্ডার দিকে চলেছে। সামনে সামনে যে নকল সর্দার বেহারা চলেছে সে ব্যাপারটাকে আসল করার জন্য বেহারাদের চলতি গান ধরে। দুলে দুলে সে যা বলে পেছনের চারজন পালকির বাহকও সুরে সুরে তাই বলতে থাকে। জোড়াসঁকোর প্রায় সব ক'টি আড্ডায় উড়িয়া বেহার। তাদের ভাষা আর সুরের সঙ্গে তো যাচ্ছে না ওই ভাষা! দূর থেকে একটা বেশ বড় ঝালেদার পালকী সঙ্গে বেহারা সর্দারের গান কানে আসতেই একজন উঠে দাঁড়ায়। কান পেতে শোনে —

"সামনে মাঠ, হৈ আরে; মাঠ রে ভাই, হৈ আরে; ওই যে গ্রাম, হৈ আরে; পুকুর ঘাট, হৈ আরে; খাল পেরুবি, হৈ আরে।"

ডাকাত বেহারারা একটু বেশি হই হই করছিল যে জন্য, মানে এই পালকী আড্ডা থেকে খবর তোলার জন্য উড়ে বেহারাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল তারা। শোভাবাজার বটতলায় তারা পালকী নামানোর আগেই উড়িয়া বেহারাদের একটা দল তাদের ঘিরে ধরেছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় আর সামান্য ক্রোধও। একজন বলে উঠল, " কি করন্তু?"

তাদের ভাষা বুঝতে যদি না পারে, উড়ে বেহারারা বাংলায় থাকতে থাকতে বাংলা ভাষা ঠিকঠাক মুখে নিয়ে নিয়েছে। একজন ষণ্ডা উড়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল, "এই তোমরা কারা?"

উত্তর দিল ডাকাত দলের সর্দার বেহারা, "দেখতেই তো পাচ্ছ। আমরা পালকী চালাই। আজ থেকে আমরা এই আড্ডায় বসব।"

রে রে করে উঠল উড়িয়ারা। "তোমরা বসবে মানে? আমরা কি এখানে উড়ে এসেছি! আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন স্বয়ং বড়বাবু।"

ডাকাত দলের বেহারা সর্দার মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলল, "তোমাদের যে বড়বাবুই আনুক না কেন, আমাদের এখানে বসতে বলেছেন স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজারের রাজামশাই।"

" তিনিই তো আমাদের এখানে বসতে দিয়েছেন, আবার তোমাদের...।" উড়ে বেহারারা খানিকটা দমে যায়।

ডাকাত দলের সর্দার বেহারা বলল, " আমরা মিল-মিশ করে এখানে কাটিয়ে দেব। জানোই তো সামনে নিমতলা মহা শ্মশানে সতী হবার সময়ে বড়লোক বাড়ির মেয়েরাও পুণ্য করার জন্য শ্মশানে যেতে চায়। কিন্তু পরপুরুষের সামনে বের হওয়া তো বারণ। তাই তারা পালকিতে ঢাকাচাপা থেকেই শ্মশানে যাবে। এখানে অনেক পালকি দরকার হবে সামনের সতী হবার যোগে। তোমরা ভয় পেয়ো না।"

একজন উড়িয়া বেহারা বলল, "তোমরা তো দুলে, বাগদি। তোমাদের পালকিতে মেয়ে মানুষেরা উঠবে না। তাতে জাত যাবার ভয় আছে।"

"হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবুও আশা নিমতলার শ্মশানে সতী হওয়া দেখতে মেয়েরা যখন বেশি বেশি যেতে চাইবে, তখন এত বাছ-বিচার করবে না।"

"করবে না মানে? বিলকুল করবে! এই তো মাস খানেক আগে একজন ফকিরচন্দ্র বসু, ওই সিমলার দিকে বাড়ি, ওলাওঠা রোগে দেহান্ত হলে সে বাড়ি থেকে দু'জন সধবা মেয়েছেলে নিয়ে যেতে আমাদের ডাক পড়েছিল। এমনিতে সারা দিনের ভাড়া ১টাকা, কিন্তু বসুবাড়ির কর্তা আমাদের ওই দেড় টাকা ভাড়া আর দাহ শেষে ফলার করিয়েছিল।"

ডাকাতদলেরর বেহারা সর্দারের যেন মনে হলো এখানে খবর উঠতে পারে। সে বলল, "দেখো তোমরা আমাদের এই আড্ডায় জায়গা দিলে আমরাও তোমাদের প্রতিদান দিতে কসুর করব না। ১টাকার উপর কোনো বখশিস বা মজুরি পেলে আমরা সেই অর্থ তোমাদের অর্পণ করব। মোদ্দা কথা আমরা মিলেমিশে থাকব এখানে।"

উড়ে বেহারা সর্দার রাজি হয়ে যায়। শুনেছে এদের নাকি পাঠিয়েছে খোদ রাধাকান্ত দেব। তার হাতায় বসে তার বিরোধিতা করাটা ঠিক হবে না। ওই আট আনা পয়সার কড়ারে রাজি হয়ে যাওয়া ভালো। বেশি কচলালে যদি আম ও ছালা দুটোই হাতছাড়া হয়!"

উড়ে বেহারাদের সর্দার কয়েকহাত দূরে বটগাছের তলায় একটা জায়গা নির্দেশ করে, সেখানে ওদের বসতে বলল। ডাকাত দলের সর্দার এক প্রকার গদ্গদ ভঙ্গিতে সেকথা শিরোধার্য করে পালকি খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে এসে উড়ে সর্দারের সঙ্গে গল্প করতে এলো। "আচ্ছা ওই বোস বাড়িতে আর কেউ বয়স্ক মানুষ নেই যে মারা যেতে পারে?"

"না না। বাড়ির প্রধান ফকিরচন্দ্র বসুই তো মারা গেলেন। এখন সেখানে আছে চাড্ডি জ্ঞাতিগুষ্ঠি আর ওই বাচ্চা ছেলে চিন্তাহরণ।"

নামটা শুনতেই কেঁপে উঠল ডাকাত দলের বেহারা সর্দার। এই চিন্তাহরণ নামটা যেন চেনা লাগছে। এই নামটাই কি বলে দিয়েছিল কামালুদ্দিন! দলের অন্যদের জিজ্ঞাসা করতে হয়। তারা যদি বলে তো কাম ফতে! ডাকাত দলের সর্দার বেহারা শুধোল, "তা সতী করার অনুষ্ঠানের তো ম্যালা কাজ। সেসব পুরুষ মানুষ নালি কি সামলানো যায়! কত আচার, অনুষ্ঠান!"

"তা আর বলতে! চন্দনকাঠের চিতা সাজাতে হবে। পুরোহিতের পুজোর আসন দিতে হবে। শূন্যার্ঘ দেবার আয়োজন করতে হবে। বাজনাদাররা থাকবে। চিতায় সহমরণে যাওয়া সতীকে বেঁধে ফেলতে হবে। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ক'জনা শক্ত-সমর্থ পুরুষ চাই-ই চাই।"

ডাকাত দলের বেহারা সর্দার উড়ে পালকি বাহকদের সর্দারের মুখের উপর একখানা অনুগত চোখ মেলে বসে থেকে মাথা নেড়ে সঙ্গত করছিল। উড়ে সর্দার বলল, "বসু বাড়ির ছোট কর্তা সব কাজ গুছিয়ে করেন। তিনিই সব এখন ওই বাড়ির। ও বাড়ি তো জমিদারের বাড়ি, আবার নাকি তিনি সাহেব কোম্পানির বেনিয়ানগিরিও করেন। চার হাতে তার ঘরে টাকা ঢোকে।"

ডাকাত দলের সর্দার শুধোল, " তা ছোট-কর্তা বুঝি খুব রাশভারী লোক? তেনার নাম কী?"

"লোকে তো গদাইবাবু বলে ডাক-খোঁজ করে। আমরা হলেম রাস্তার ফালতু পালকি বেহারা, আমরা এর বেশি আর জানব কী করে!"

যা জানার জানা হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যে পর্যন্ত ঝিম মেরে এখানে বসে থাকা। বাড়িটা ঠিক কোনখানে তাও জেনে নেয়া গেছে।

তিন

ডাকাত সর্দার মহেশ বাগদির চোখ দপদপ করে জ্বলছিল। সেই চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আষাঢ় মাসের অমাবশ্যার রাত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বোস বাড়ির পাহারাদাররা নিজেদের ঘরে বসে আফিং খেয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে কোলের উপর বল্লম রেখে আয়েস করছে। চকমিলান দ্বিতল অট্টালিকার উঁচু পাঁচিল নিঃশব্দেই টপকে এসেছে মহেশ

বাগদির দল। তাদের কাছে খবর এসেছে খিদিরপুরের জাহাজ ঘাটায় যে নতুন জাহাজখানি এসেছে, সেটি এই বোস বাড়ির পাটের বেল নিয়ে বেরিয়ে ইউরোপের ঘাটে ঘাটে সব বেচে দিয়েছে। অনেক টাকার আমদানি হয়েছে। কামালুদ্দিনের দায়িত্ব সেই টাকার সবটাই তোলা। গয়না আর বাসন —কোসনের বাক্স-প্যাটরাও তুলতে হবে। কামালুদ্দিন সর্দার মহেশ বাগদির সঙ্গে একজন ডাকাতকে রেখে বাকিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়েছে।

দ্বাররক্ষকদের কব্জা করে, মূল ফটক খুলে রেখে ফটক পাহারা দিচ্ছে একদল। যাতে কেউ বাইরে থেকে এসে সাহায্য করতে না পারে। মহেশ বাগদির নির্দেশ ছিল, মেয়েলোক বাদ দিয়ে বাড়ির সব পুরুষ লোকের মাথা ফাটিয়ে দেবে। তবে বাচ্ছা ছেলে চিন্তাহরণের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

দোতলার নিজের ঘরে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ভেজা নরম হাওয়ার জন্য না পাটের বেল ভালো দামে বিক্রি হয়েছে, সেই সংবাদ কানে নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন গদাই বোস। মহেশ বাগদিরা ডাকাতি করার সময় বিশেষ আওয়াজ করা পছন্দ করে না। গ্রামবাসীদের জাগিয়ে লুঠতরাজ করা তার পছন্দ নয়। সে সব সময় চায় মসৃণভাবে কার্য সিদ্ধি করে কেটে পড়তে। কোনো অযথা রক্তপাত করতে চায় না।

দোতলায় জমিদারের ঘরের সামনে গিয়ে মশাল জ্বালাতে বলল অনুগামীকে। তারপর দরোজায় এক লাথি। দরোজা যতই শক্ত-পোক্ত হোক না কেন মহেশের পদাঘাতে তা যে ভাঙবেই তা ডাকাতদলের সবাই জানে। দরোজা ভাঙার শব্দ আর মশালের আলোয় ঘুম ভেঙ্গে যায় ছোট জমিদারের।

বিছানায় উঠে বসা জমিদার গদাই বোসের গলায় খাঁড়া ঠেকিয়ে বজ্র গম্ভীর আদেশ হলো, " সিন্দুকের চাবি দে।"

রাতের শেষ প্রহর। নিমতলা শ্মশানে চলে এসেছে ডাকাত দল। পাশে নদীতে তাদের বজরা। বজরায় ডাকাতির সব কিছু নামিয়ে রেখে কামালুদ্দিন চলে এসেছে শ্মশানে। শ্মশানে একটা চিতা সাজানো আছে, গোটা শ্মশান মশালের আলোয় আলোকিত। সেখানে পুরোহিত কাঁপতে কাঁপতে শূন্যার্ঘের মন্ত্র পড়ছে। ডাকাতেরা সিঙা ফুঁকছে মাঝে মাঝে। বোস বাড়ির ছোট জমিদারকে একটা মেয়েদের শাড়ি পরিয়ে ঘোমটা দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে সামনে। ডাকাতের বল্লমের খোঁচা অনবরত সে খাচ্ছে।

হঠাৎ মহেশ বাগদির জলদ গম্ভীর স্বর বাজল, " কি মিন মিন করে মন্ত্র পড়ছ বাওন। তাড়াতাড়ি শেষ করে সতীকে চিতায় চড়াও।"

বাওন কাঁদতে কাঁদতে বলল, " সতী কোথায় পাব যে মন্ত্র পড়াব?"

" কেন তোমার সামনে যে শাড়ি পরা বসে আছে সেই তো সতী হবে।"

" ও তো আমাদের ছোট জমিদার। পুরুষ মানুষ। "

" পুরুষ না মেয়ে, তা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি গয়না পেয়েছ না পাও নাই।!"

" আজ্ঞে, তা তো পেয়েছি।"

কাঁপতে কাঁপতে চক্কোত্তি বাওন ক্ষীণ কণ্ঠে আবার একটু প্রতিরোধ তুলল, " সতী সহমরণে যেতে গেলে একজন পতি তো দরকার। সেই মৃত পতি কোথায়?"

মহেশ বাগদির গলা থেকে বাজ পড়ল। "এত সব বিবেচনা সব সময় করা হয়? এই বাড়ির বাচ্চা বৌকে এক মাস আগে যখন সতী করেছিলে তখন তো কোনো প্রশ্ন করোনি। এখন একটা মৃতদেহ চাইলে তোমার গলাতেই খাঁড়া হাঁকিয়ে মৃতদেহ দিয়ে দিতে পারি।"

" না না করছি করছি।"

"ভোরের আলো ফোটার আগেই যেন সব কাজ শেষ হয়।"

বোস বাড়ির ছোট জমিদার তেমন করে যে কিছু বুঝতে পারছে তা নয়। রাতে খাবার পর একটু বেশি আফিম সেবন করা হয়েছিল। ফলে সে ঝিম মেরে বসে ছিল শ্মশানে। বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপর চিতায় উঠিয়ে যখন তাকে

শুইয়ে দিয়েছিল তার স্বস্তি হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু চিতায় আগুন দেবার পর আগুনের ছ্যাঁকায় সে ধড়ফড় করে উঠে বসতে গিয়ে দেখে উঠতে পারছে না। দড়ি দিয়ে বাঁধা হাত-পা। গায়ের উপর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি। সে আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছে, বাঁচাও বাঁচাও। কিন্তু তখনই ডাকাতেরা চারিদিক থেকে সিঙ্গা ফুকেছে। চণ্ডাল বাঁশের বাড়ি মেরেছে জলন্ত চিতা থেকে উঠে আসার জন্য আকুল দুখানি হাতের উপর।

কামালুদ্দিন তামাক সেজে বজরার বাইরে বসে গঙ্গার হাওয়া সেবন করতে থাকা জমিদারবেশী মহেশ বাগদির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বজরায় রান্নার লোক ছাড়া আর কেউ নেই। তিরিশ জনের উপরে দল। অনেক রান্না করতে হয়। তিনজন রাঁধুনি মিলে দ্বিপ্রহরের আগে কাজ তুলে ফেলাটা রোজ রোজই চ্যালেঞ্জের। দলপতি মহেশ বাগদি একাই একটা গোটা পাঁঠার মাংস খেয়ে নেয়। তার পাতে আলাদা থালায় দেয়া হয় সেই রান্না করা পাঁঠার গোটা মাথাটিও। সেটিকেও সুন্দর করে মশলা মাখিয়ে ডুবন্ত ঘিয়ের ভেতর ভেজে তুলতে হয়। রং হবে সোনার মতো। একচুল এদিক-ওদিক হলে সর্দার মুখে তুলবে না। রাঁধুনিদের কাছে এর চেয়ে খুব সহজ রাতের বেলায় ডাকাতি করতে গিয়ে জমিদারের পাইক, সেপাইদের মুণ্ডু কাঁটা। মহেশ বাগদির নিয়ম ডাকাতির সময় দলের সবাই এক সাথে শত্রুর উপর ঝাঁপানো। দলে যত লোক বাড়বে তত বিরোধীরা কমজোরী হবে।

কামালুদ্দিন সর্দারের হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়ে দিয়ে ফরশিটিকে একটা কাঠের টুলের উপর রেখে একবার টিকের আগুনে ফুঁ দিয়ে দেখে নিল, আগুন ঠিকঠাক জ্বলছে কিনা। ওদিক থেকে নলের ভেতরে কুলকুল শব্দ হওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হল। নিমতলা ঘাটে মাসখানেক থানা দেবার সময় তারা ছানবিল করে দেখেছে চিৎপুরে ভালো সুগন্ধী তামাক আর চিটেগুড় পাওয়া যায়। যে তামাক কিনা বারাণসীর সমতুল। বেশ খানিকটা তারা কিনেছে।

সর্দার নল থেকে এক নাগাড়ে গোটা চারেক টান দিয়ে বুকের ভেতর সুগন্ধী ধোঁয়া চালান করে দিয়ে বলল, " বলো কামালুদ্দিন, কী বলবে বলো। তুমি তো এমনি এমনি আর অসময়ে তামাক সেজে আনোনি! এখন আমাদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের সময়। আমার দলের লোকেরা চলে এলেই ভোজন শুরু হবে। আমি একটা, দুটো ছিপ নৌকো ছোটাছুটি করতে দেখেছি। ওরা এসময় আমার বজরার চারপাশে একবার টহল দিয়ে নেয়। নিশ্চিত করে নেয় কোনো বিপদের গন্ধ নেই। তা তুমি বলো।"

" কত্তা, ম্যালা দিন তো হলো। আমাগে সব কম্মই তো মিটছে। চিতে ডাকাত শায়েস্তা হইছে। তারপর সেই সতীকরা সিমলের জমিদারের বাড়ি লুঠ করে তারেও তো চিতেয় তোলা হলো। আর কি! এবার আমাগে ফিরে গেলি হয় না?"

মহেশ বাগদি মুখ থেকে ধীরে গড়গড়ার নল নামিয়ে কামালুদ্দিনের মুখের দিকে তাকায়। হ্যাঁ জমিদার প্রসন্নকুমারের দেয়া কাজ শেষ হয়ে গেছে। তারপরেও মাসাধিককাল ভাগীরথীর বুকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিমতলা শ্মশানে একটা বাচ্চা বিধবা বৌকে সতী নাম দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলতে দেখে তার বুকের ভেতর যে দহন তৈরি হয়েছে তা যেন নিভতে চাইছে না। সেই মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির লোকদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। তাদের বাড়ি লুঠ করে সব তুলে নিয়ে এসেছে। এমনকি পরণের কাপড়টুকু ছাড়া কিচ্ছুটি ফেলে রাখেনি বাড়িতে। সব তুলে এনে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। বাড়ির মেয়েদের আর বাচ্চাদের বাদ দিয়ে প্রত্যেক পুরুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কোমরে বাড়ি মেরে কোমর ভেঙে দিয়েছে। ওই পরিবারের কেউ-ই যেন আর উঁচু হয়ে দাঁড়াতে না পারে। আর সেই চিন্তাহরণ, সতী হতে যাওয়া মেয়েটির সতীনপুত্র, তাকে নিয়ে এসেছে মহেশ বাগদি। তার উদ্দেশ্য আছে। মহেশ বাগদি চিন্তাহরণকে বড় করবে। বাংলার বুক থেকে সতীদাহ নিকেষ করার জন্য তাকে তৈরি করে রেখে যাবে।

" তোমার মন এত চঞ্চল হয়েছে কেন কামাল! ডাকাতি করা ধন-রত্ন, টাকাকড়ির ভাগ পাওনি নাকি?"

" না না কত্তা, সেসব পাইছি।"

" তাহলে? ভৈরবের বুকে গিণি নৌকো লুঠ করে এত অর্থ পেতে নাকি!"

" তা তো পাতাম না। কিন্তু ..."।

" কিন্তু কি?"

" কত্তা, যদি কোনোভাবে আমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাই, তবে তো জমিদার প্রসন্নকুমারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে পুলিশ এই বজরার মালিকের খোঁজ করে। ভদ্র মানুষ প্রসন্নকুমার রায়ের তখন তো বিপদ ঘনিয়ে আসবে।"

মহেশ বাগদি হাত বাড়িয়ে গড়গড়ার নল কামালুদ্দিনকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, " তা তো তুই ঠিক বলেছিস। কিন্তু কামাল, এই হুগলি নদীতে যে সোনা ছড়ান আছে। এখানে একটা দুটো কেন, কয়েকশ' ডাকাতি করেও সোনার ভাণ্ডার শেষ করা যাবে না। এখানে সাতগাঁ দিয়ে ব্যাপারীরা সমুদ্রে যায় বাণিজ্য করতে সিংহলে। সেখান থেকে একেবারে নৌকো ভর্তি ক'রে সোনা নিয়ে ফেরে। কয়েকটা লুঠ করলেই তো জীবনের মতো বসে খাওয়া যায়। তুই এক কাজ কর, বজরার মাঝিকে বল, এই বজরা নিয়ে প্রসন্নবাবুর হাতে তুলে দিতে। আমরা এখানে আজ রাতেই নদী থেকে একটা বজরা তুলে নিচ্ছি।"

দুটো ছিপ নৌকো আর কয়েকখানি পানসি নৌকো মহেশের দলের ছিলই। বজরা পাঠিয়ে দিয়ে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বটে, কিন্তু এক বেলার ভেতরেই তা মানিয়ে নিয়েছে মহেশ। দিন দুই আগে বিপদের দিন গেছে। কোম্পানির জল পুলিশ কিছু একটা সন্দেহ করে তাদের নৌকো তাড়া করেছিল। কিন্তু পারবে কেন! ওদের ছিপ নৌকো বন্দুকের গুলির মতো ছোটে। সমসের আর কাজল দুজন বৈঠা টানে বিদ্যুতের গতিতে। পানসি নৌকোগুলি নদীর ব্যবসায়ী নৌকোর আড়ালে আড়ালে আস্তে চলছিল। দ্রুত গতির ছিপ নৌকোকেই পুলিশ সন্দেহ করে তাড়া করেছিল। এই ছিপ নৌকোর একটিতে মহেশ বাগদি ছিল। ছিপ নৌকোর মহেশের শাগরেদরা তো প্রাণ বাজি রেখে তাদের সর্দারকে বাঁচাবে।

মূল নদী থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে কাটোয়ার কাছে একটা খালের ভেতর তাদের ছিপ নৌকো দুটি নিয়ে ঢুকে খানিকটা যেতেই খাল সরু হয়ে গ্রামের ভেতর বিলে ঢুকে গেছে। ওই সরু অংশ দিয়ে পুলিশের বড় নৌকো ঢুকতে পারে না। তারা সোজা বিলের একদিকে ঝোপের আড়ালে গিয়ে নৌকো থামাল। সমসের বলল, "কত্তা, আর ভয় নাই আমাগো। এবার পুলিশের ভয়। এখানে পুলিশ ঢোকে না। এ হলোগে ডাকাতের খাল।"

"তা আমরা এখন কোথায় এসেছি সমসের?"

"এটা বর্ধমান জেলা। কাটোয়ার কাছে। হবে।"

"তা রাতের বেলায়, আমরা কি এখানে এই ছিপ নৌকোতেই কাটাব? চারদিক থেকে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে তো কান ঝালাপালা হচ্ছে। তার উপর মশার উপদ্রব। খাওয়া-দাওয়ারও তো কোনো বন্দোবস্ত এই ছিপ নৌকোয় নেই। আমাদের বড় নৌকোয় ফিরে না গেলে তো সমুহ বিপদ।"

মহেশ বাগদি-কে চিন্তিত দেখাল। পূর্ববঙ্গের সব নদী, খাল, খাঁড়ি, বিল তার হাতের তালুর মতো মুখস্থ। এখানে এই ভাগীরথীর বুকে ডাকাতের নৌকো নিয়ে সে এসেছে সমশেরের উপর ভরসা করে। তার একান্ত কাছের আর খুবই উপস্থিত বুদ্ধি ধরে কামালুদ্দিন, বড় নৌকোয় রয়েছে। ওরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ল কিনা জানে না। চিন্তা হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে জমিদার প্রসন্নকুমারের কাজটা করে মানে মানে রাজশাহী ফিরে গেলে ভালো হত। কিন্তু কী করবে সে! পুরনো স্মৃতি যে দগদগে ঘায়ের মতো রয়েছে। ওই বাচ্চা মেয়েদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারে কোনো সাধারণ মানুষ! যারা মারে তারা ডাকাতদের থেকেও নিষ্ঠুর। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে মন থেকে তো নিস্তার পাচ্ছে না সে।

কলকাতার সিমলের বসু পরিবারকে শায়েস্তা করে সে বাড়ির ছোট পুত্র নয় বছরের চিন্তাহরণকে তুলে এনেছে। সে বড় নৌকোয় আছে। সেখানে কামালুদ্দিন না থাকলে চিন্তা হত। কামালুদ্দিন চিন্তাহরণের গায়ে কোনো বিপদের আঁচ লাগতে দেবে না। কিন্তু মহেশ বাগদির নিজের মনে হচ্ছে ক্রমে নতুন নতুন ডাকাতি আর সতী করানো লোকজনের শাস্তি দিতে দিতে এমন একটা চক্রের ভেতর ঢুকে পড়ছে, সেখান থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। শুধু নিমাইতীর্থ আর ত্রিবেণীর ঘাটের সতী করিয়েদের উপর হামলা চালিয়েই সোনার গয়না সংগ্রহের নেশা হয়ে গেছে দলের। সহমরণের যাত্রী বৌটির হাত দিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণ, পুরোহিত আর বাড়ির নিকটজনকে স্বর্ণ অলঙ্কার দান করার রেওয়াজ। শ্মশানঘাটেই হরে রে ক'রে আওয়াজ তুলে মশাল জ্বেলে ঘিরে ধরলেই সব অলঙ্কার ডাকাত দলের বস্তায় এসে জমা হচ্ছে। যে কয়েকজন

স্ত্রীলোককে বাঁচাতে পেরেছে, তাদের নিয়ে মহেশ বাগদি বিব্রতও। নিজের পরিবারে আর ওরা ফিরে যেতে পারবে না। ওদের কতদিন নদীপথে নিয়ে ঘুরবে?

সমশের বলল, "চিন্তা করতি হবে না কত্তা। এখানে আট্টু রাত হলি, জ্যোৎস্না ছড়ালে কাছেই মঙ্গল চণ্ডীর মন্দির আছে। সেখানে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেবানে। ওর পুরোহিত আমার চেনা। তার দুখানি খাটিয়া আছে। সেখানে শুয়ে পড়তে পারবেন। আর খানার ব্যবস্থাও হবে। ডাকাতেরা এসময় আসে না। অমাবশ্যায় ডাকাতি করতে যাবার সময় মাঝ রাতে অনেক ডাকাত আসে। তারাই এই মন্দিরে টাকা-পয়সা, খাবার দাবার রেখে যায়। এই মন্দিরেই শুনেছি তারা টাকা পয়সা জড়ো করে। তারপর পুজোর শেষে ভোর হলে কাছের পলসোনা গাঁয়ের দরিদ্র মানুষের ভেতর ধনরাশি বিলোয়ে দিয়ে যায়।"

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের জটাজুটধারী কপালে লাল গোল টিপ আঁকা বিশালদেহী পুরোহিত বুঝি সমশেরের পরিচিত। সে ধুনির আগুনে আগেই খানিক মাংস পোড়াতে বসিয়ে দিয়েছিল। পোড়া মাংস আর মদে রাতের আহার করে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে সমশের আর মহেশ বাগদি। অচেনা জায়গায় মহেশ বাগদির ঘুম আসছে না। মাঝ রাতে হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর কু কু কু ধ্বনি শুনল। একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোও যেন এগিয়ে আসছে। পুরোহিত ছুটে এসেছে। সে ফিসফিস করে বলল, "তোমরা মন্দিরের পেছনে তেঁতুলগাছের কোটরে গুটিসুটি মেরে বসে থাক। হঠাৎ করে চলে এসেছে মনে হয়। কোনো বড় ডাকাতি করেছে। তাই এখানে এসে উপস্থিত। কাল সকালে গ্রামে দান-ধ্যান করবে। কিন্তু তোমাদের দেখলে মেরে ফেলবে ও।"

মহেশ বাগদি জিজ্ঞাসা করল, " ডাকাতের নাম কী?"

"হারাণ বাগদি। খুবই ভয়ঙ্কর ডাকাত। যাও, তোমরা লুকিয়ে পড়ো।"

মহেশ বাগদির বাধো বাধো লাগছে। সে পুব বাংলার এক নম্বর ডাকাত, চিতে ডাকাতকে শায়েস্তা করতে এ বঙ্গে এসেছে, সে লুকিয়ে পড়বে! রাগ হচ্ছিল খুব। কিন্তু বাস্তব জ্ঞানও চলে যায়নি তার। এই হারাণ বাগদির সঙ্গে কতজন জাকাত আছে সে জানে না। দিনের আলোয় লাঠি হাতে দশ-বিশ জনের মহড়া সে একা নিতে পারে। কিন্তু এদের হাতে কীরকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে জানে না। তাছাড়া নতুন জায়গা। কে কোন গাছের আড়াল থেকে এসে মাথায় বাড়ি দেবে অন্ধকারে বুঝে ফেলতে পারবে না। পুরোহিতের কথামতো সমশেরকে নিয়ে মহেশ বাগদি মন্দিরের পেছনে চলে গেল।

এ মন্দিরের বিশেষত্ব মহিষমর্দিনী মূর্তি এখানে। কালী এখানে মঙ্গলচণ্ডী রূপেই পূজিতা। মূর্তির সামনে ভয়ঙ্কর এক যূপকাষ্ঠ। রক্তের কালচে দাগের উপর লাল সিঁদুর লেপা। নিচের মাটি রক্ত পড়ে পড়ে কাদার আকার নিয়েছে। মহেশ বাগদিরা এসব দেখে অভ্যস্থ। তারাও বড় আর বিশেষ ডাকাতি করার আগে মা কালিকার কাছে পুজো দিয়ে কপালে রুধির তিলক কেটে, সুরা নির্মিত চরণামৃত পান করে তবে বের হয়। মহেশ বাগদিরা জানে মা-কে সন্তুষ্ট করে গেলে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির ভয় কম।

ত্যারচা করে বসে আছে। ঠিক ভাঙা মন্দিরের পেছনে নয়, বাঁদিকের কোণ ঘেঁষে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ। সে গাছ অন্ধকারে দেখলেই ভয় করে। মহেশ বাগদি আর সমশের যেখানে আছে, সেখান থেকে মন্দিরেরএকটা ভাঙা দেয়ালের অংশ থেকে সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছে সব। লোকটার মাথায় লাল ফেটি বাঁধা। চোখে মনে হয় কাজল লাগিয়েছে ধ্যাবড়া করে। ওরাও লাগায়। এতে মুখে চোখে একটা খুনে হিংস্রতা যোগ হয়। বিরোধী লোকজনকে অনায়াসে ভয় পাইয়ে দেয়া যায়।

মহেশ বাগদি কালিপুজোর সব মন্ত্র জানে। কিন্তু তার তো মন্ত্র মুখস্থ থাকে না। এই ডাকাত বজ্র গম্ভীর স্বরে হাতের খড়গ দোলাতে দোলাতে উচ্চারণ করছে, "ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ।"

মহেশ বাগদির এবার মনে পড়েছে। এখন খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তাই করল ওই বিশাল দর্শন ডাকাত। প্রদীপের অল্প আলোয় ডাকাতের মুখের অভিব্যক্তি এতটা দূর থেকে চোখে ধরা পড়ছে না। তবে মহেশ বাগদি জানে পশুমস্তক এক কোপে ছিন্ন করার আগে শরীরে অদ্ভূত ঘোর জাগে। সমস্ত শরীর ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। মুখের পেশীগুলো

কাঁপতে থাকে, চোখ বড় হতে হতে মনে হয় ফেটে পড়বে। সে জানে না, কেন এমন হয়। খড়্গ হাতে নিলে তা খড়্গ মাহাত্মে, না মন্ত্রের জোর জানে না এই মহেশ ডাকাত। সে শুনল, পুরোহিতের অল্প আওয়াজ ছাপিয়ে হারাণ সর্দারের রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান করে দেয়া উচ্চারণ, "ওঁ হ্রুং হ্রুং কালি কালি বিকট-দংষ্ট্রে, স্ফেং স্ফেং ফেৎকারিণি, খাদয়, চ্ছেদয় সর্বানদুষ্টানমারয় মারয়, লুলাপকং খড়গেন ছিন্ধি ছিন্ধ, কিল কিল চিক-চিকি; পিব-পিব রুধিরং স্ফেং স্ফেং কিরি-কিরি কালিকায়ৈ নমঃ।"

মহেশ বাগদি জানে এরপর সামনে যূপকাষ্ঠে ঘাড় গোঁজা মহিশের ঘাড়ে খড়্গ স্পর্শ করিয়ে এক কোপে কেটে ফেলবে তার মাথা। তাই ই করল। মহিশের কাটা কাঁধ থেকে ঝর্নার মতো করে রক্ত লাফিয়ে উঠলে পুরোহিত সে রক্ত ধারণ করল একটা বড় তামার কলসে। সেসময় কাসর-ঘন্টার ধ্বনি।

মন্দিরের আশ-পাশ থেকে এ সময় জনা পঞ্চাশেক ডাকাত, মুখে কালি-ঝুলি মাখা বেরিয়ে এসে পুরোহিত আর ডাকাত সর্দারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরোহিত ওই টাটকা রক্ত দিয়ে প্রত্যেকের কপালে গোল গোল সূর্য এঁকে দিতে লাগল। আর কিছু সময়ের ভেতরেই বনের ভেতরের চাপ চাপ অন্ধকার সরে যেয়ে হালকা আলো ফুটে উঠল।

ডাকাত সর্দার তখন চেঁচিয়ে বলল, "ভাইসব তাড়াতাড়ি করে নিজেদের পরিস্কার করে নাও। নদীর জলে চান করে চলে এসো পলসোনা গাঁয়ের বাজারে। সেখানে আমরা ডাকাতি করা সব ধন গরীব মানুষদের ভেতর বিলি করব। মনে রাখবে তোমাদের শরীরে যেন কোথাও ডাকাতের ছাপ না থাকে। একেবারে গ্রামের মানুষের মতো হয়ে তাদের সঙ্গে আমরা মিশে যাব।"

মহেশের ব্যাপারটা খুব মনে ধরল। এই ডাকাত তো তারই মতো জনগণের দুঃখে ব্যথিত। সে সেই মুহূর্তে ঠিক করল, এই ডাকাত হারাণ সর্দারের সঙ্গে সে ভাব করবে। সমশেরকে বলল, সাধারণ গাঁয়ের মানুষের মতো হাঁটুর উপরে ধুতি পরতে। নিজেদের বিশাল বুক খোলা অবস্থায় দেখলে ধরা পড়ে যেতে পারে। মহেশ বাগদি বলল, "সমশের আমার জামা-কাপড়ের পুটুলি নিয়ে এসো নৌকোর খোল থেকে।

গ্রামবাসীরা সবাই টাকা পয়সা, জামা-কাপড় নিয়ে চলে গেলেও হারাণ ডাকাত দেখল, দুজন সব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, "আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমার কাছে আর বিশেষ কিছু পড়ে নেই আপনাদের দেবার মতো।"

মহেশ বাগদি বলল, "আপনার সঙ্গে একান্তে যদি একটু কথা বলতে পারতাম।"

এরকম আবদার এর আগে কখনো ডাকাত সর্দার হারাণ বাগদি শোনেনি। এসময় তো সে নিঃস্ব হয়ে দান করে। নিজের ভেতরে থাকা ডাকাত সত্ত্বাও থাকে না। সে খানিক বিস্মিত হলো বটে, কিন্তু না করল না। মহেশ বাগদি, সমশের আর হারাণ বাগদি নদীর পাড়ের একটা বড় হিজল গাছের তলায় বাঁধান মাটির গোলাকার বসার জায়গায় গিয়ে বসল। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। পাখির ডাকের আওয়াজ আসছে। হারান বাগদির নির্দেশে তার দলের কেউই সঙ্গে আসেনি।

" আপনার সমস্ত আচরণে আমি মুগ্ধ। আমি আপনার বশ হয়ে আছি। আপনি একজন দাপুটে ডাকাত সর্দার হয়ে মানুষের জন্য এমন কাজ করছেন, দেখে আমি চমকিত।"

আগন্তুকের মুখে নিজেকে ডাকাত সর্দার পরিচয়ে চমকে উঠেছে হারান বাগদি। ঝপ করে দাঁড়িয়ে সে খানিকটা চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "এই কে তুই?"

মহেশ বাগদি জানে এই ডাকাতের চণ্ডাল সত্ত্বা, যা চাপা দেয়া আছে, তা জেগে ওঠার আগেই নিজের ইচ্ছা তাকে জানাতে হবে। মহেশ বলল, " আমি মহেশ বাগদি। আমিও ডাকাত।"

আরও খানিকটা তেতে উঠে বলল হারান, " আমার কাছে কী চাই?"

খুব মোলায়েম গলা মহেশের। "আজ্ঞে, আমি তেমন কিছুই চাই না। আমি আপনার সমর্থন চাই।"

হারান বাগদি গলায় ঝাঁঝ বজায় রেখে বলল, " আমি কোনো ডাকাতের হয়ে ভাড়া খাটি না। আমি স্বাধীন ডাকাত। নিজের ইচ্ছেয়, নিজের দল নিয়ে ডাকাতি করি। কারো হুকুম আমি বরদাস্ত করি না।"

মহেশ বাগদি হারাণ বাগদিকে বুঝিয়ে বলল, সে হারান বাগদির মতো সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য একটা কাজ করে। কিন্তু একা সবটা করে ফেলা যাচ্ছে না। নিত্য নতুন সতীদাহের খবর কানে আসে। আজ নিমাইতীর্থের ঘাটে হলে কাল ত্রিবেণীর ঘাটে। পরশুদিন কলকাতার বিখ্যাত শ্মশান নিমতলা মহাশ্মশানে। একা সবটা করে ওঠা যাচ্ছে না। জনা পনেরো সতীকে সে বাঁচিয়েছে। কিন্তু তার জানার আগেই অন্য কোনো ঘাটে সতী হয়ে যাচ্ছে। হারান সর্দার যদি এই কাজে সাহায্য করে, মানে সে হুগলি নদীর একটা দিক দেখবে, মহেশ বাগদি অন্য দিকটা, তবে হয়ত অনেক নির্দোষ প্রাণ বেঁচে যাবে।

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল হারান বাগদি। এই বাচ্চা বাচ্চা বৌদের অনেককেই চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখেছে স্বামীর চিতায়। তেমন করে ভাবেনি হারাণ বাগদি। কিন্তু মহেশ ডাকাতের কথায় ভাবনায় পড়ে গেল। হ্যাঁ মানুষের বাচ্চা হয়ে মানুষের বিপদে যদি সাহায্য করতে না পারে তবে তো ব্যর্থ জীবন। কিন্তু কী করা যায়! চকিতে সে ভেবে নিয়েছে, নিজে দলবল নিয়ে শ্মশানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকটা সতীকে হয়ত বাঁচাতে পারে। কিন্তু তাতে দল চালানো তো উঠে যাবে। রোজ যদি শ্মশানঘাটে ওত পেতে বসে থাকে তবে তো ডাকাতি পেশাই বন্ধ করে দিতে হয়। দলের লোকজন নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তার উপরে রয়েছে পুলিশের ভয়। কোথা থেকে কে পুলিশকে খবর দিয়ে রাখবে। জলে তাদের ধরা মুশকিল। কিন্তু যেই শ্মশানে, মানে ডাঙায় যাবে পুলিশ তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু মহেশ ডাকাতের কথাও তো ঠেলে ফেলার মতো নয়। শুধু সতীদের বাঁচাতে সে ভৈরব নদীর নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে হুগলি নদীতে ভেসে আছে মাসাধিক কাল। তার কাজ ফেলে দেবার মতো নয়।

হারান বাগদির মাথায় একটা ভাবনা বিদ্যুতের মতো ঢুকে এলো। " আচ্ছা হবে। ব্যবস্থা একটা হবে।"

মহেশ ডাকাত বললো, "কেমন, কেমন?"

" আচ্ছা, আমরা যদি সতীদের মধ্যে, আর যারা সতীদাহ করায় তাদের মনের ভেতর ভয় সূচক একটা খবর ছড়াতে পারি, তাহলে জোর করে বা ইচ্ছা করেও সতীরা পুড়ে মরতে আসবে না।"

মহেশ বলল, "এটা মন্দ প্রস্তাব নয়। সতীদের যদি ভয় দেয়া যায় শ্মশানঘাটে সতী হতে এলেই তাদের ডাকাতের হাতে পড়তে হবে, আর তাদের পরিবারের সব ধন লুঠ করা হবে, তাতে কাজ হতে পারে।"

মহেশ আবার বলল, " তালে আমরা আজই ঢ্যাঁড়া পেটানোর আয়োজন করতে পারি। নদীর পাড়ের শ্মশানঘাটে ঢোল-সহরত করিয়ে দিই।"

হারান সর্দার চিন্তিত মুখে বলল, "না হবে না। সতী যারা করায়, তারা জেনে যাবে। পুলিশ নিয়ে শ্মশানে আসবে। পাইক বরকন্দাজ বেশি বেশি নিয়ে আসবে।"

" তাহলে কীভাবে কী হবে?"

" উপায় একটা বের করতে হবে বন্ধু। মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দিতে হবে গোপনে।"

"কীভাবে?"

" আমার একটা মতলব মাথায় এসেছে। যদি কাগজে একটা কিছু ছেপে তা বড় বড় বাড়ি, জমিদারের প্রাসাদে লুকিয়ে রেখে আসা যায়!"

"হ্যাঁ এটাই হবে। চলো আজই শুরু করব। আমার এক বর্ধমানের চেনা লোক আছে। মানে আমার বর্ধমানের গাঁয়ের লোক। এখন সে শ্রীরামপুরে সাহেবদের সঙ্গে কাজ করে। তাকেই ধরব গুছিয়ে এই সতীদাহর বিরুদ্ধে ভয় দেখানো কাগজ ছেপে দিতে। তারপর তা বিলি করতে আর কি! ভয় পাবে না ! পাবে বিলক্ষণ পাবে। আমাদের হুগলি নদীর সব ডাকাতদের নিয়ে আমি মিটিং করব। যেভাবে জমিদার বা বিত্তশালীদের বাড়িতে চিঠি দিয়ে জানিয়ে অনেকসময় আমরা ভয় দেখাই, ডাকাতি করি। তেমন করে ভয় দেখাব। বলব, ওই বাড়ির কেউ সতী হলে গোটা বাড়ির কাউকে বাঁচাব না।"

চার

"এসো এসো হারান। মহারাজ তেজচাঁদ আবার তোমাকে পাঠালেন যে!"

শ্রীরামপুর খ্রীষ্টান মিশন প্রেসের সামনে প্রশস্ত আঙিনা। সেখানে লালমাটির বুকে বিভিন্ন ফুল আর ফলের বাগিচা। বাগিচায় গোলাপ আর আমের গাছই বেশি। বাগানের মাঝখান দিয়ে সুদৃশ্য মোরাম পথ। লোহার গেট খোলার আওয়াজেই চোখ তুলে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য দেখলেন সামনের রাস্তা দিয়ে দু'জন লম্বা-চওড়া লোক প্রেসের দিকেই আসছে। প্রথম প্রথম কড়াকড়ি ছিল। উইলিয়াম ওয়ার্ড সাহেব যখন শ্রীরামপুর মিশনের মার্শম্যান আর কেরি সাহেবের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে এই প্রেসের কাজকর্ম নিজের কাছে নিয়ে নিলেন, তখন থেকে খোলা হাওয়া। নিজের পয়সায় চালাতে হয় এই প্রেস। বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদ চেয়েছিলেন এই প্রেসের স্বাস্থ্য রক্ষায় তাঁর খাজাঞ্চি প্রতি মাসে এই শ্রীরামপুর মিশনকে কিছু টাকা দিন। কিন্তু মার্শম্যান, কেরী বা ওয়ার্ড সাহেব —কেউই মহারাজের দান নিতে সম্মত হন না। প্রভু যিশুর সেবা তাঁরা নিজেদের উপার্জিত অর্থে করবেন।

মহারাজা তেজচাঁদ যিশু ভক্তদের ওই অভিমান বোঝেন। কিন্তু তিনি নিস্পৃহও থাকতে পারেন না। তাঁর রাজ্যের এলাকায় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বিদেশীরা চেষ্টা করছে, এটা শুধু প্রশংসার নয়, নিজের চৌহদ্দি বা রাজপরিবারের সুনামের সঙ্গেও যুক্ত। এই প্রেস থেকে বেশ কয়েকটা বই বেরিয়ে গেছে। তাঁর রাজবাড়ির প্রায় প্রত্যেক ঘরেই তো একখান করে কৃত্তিবাস ওঝা-র রামায়ণ আছে। হলদে হলদে পাতার কাগজের উপর ভাঙ্গা ভাঙা অক্ষরে লেখা রাম নাম দেখেই তো সবাই কুপোকাত। সকালে সন্ধ্যায় একটিবার কপালে বুকে ঠেকিয়ে আবার লাল শালু দিয়ে যত্ন করে মুড়ে রাখা নিত্যকার কাজের মধ্যে পরে রাজবাড়ির মহিষীদের। তেজচাঁদ অনেক রামায়ণ নিয়েছেন এই ওয়ার্ড সাহেবের প্রেস থেকে।

গঙ্গাকিশোর লম্বা গরাদ দেয়া জানালার সামনে বসে অক্ষর গাঁথেন। কিন্তু আজকাল তাঁর আর মন নেই। তাঁর মন উঠে গেছে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। চারপাতার কম্পোজ করলে পান ১টাকা। এই আয় থেকে দেশ গাঁয়ে পরিবারের জন্য টাকা পাঠাতে হয়। এই চারপাতা কম্পোজ করতে অনেক সময় লাগে। বেশি অক্ষর কাটা নেই। মাঝে মাঝে 'ম' কম পড়লে 'য' দিয়ে চালান। 'ভ' এর জায়গায় 'ত'। কিন্তু তাতে নিজের অপযশ হয়। সাহেবরা কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোরের দিকে আঙুল তুলে দায় ঝেড়ে ফেলেন।

গঙ্গাকিশোরের মন চলে গেছে কলকাতায়। তাঁর চোখে খুব বড় স্বপ্নের ঝিলিক। ওয়ার্ড সাহেবের বন্ধু মার্শম্যান সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে চুপি চুপি তিনি একখানা বই ছেপে ফেলেছেন কলকাতায় বৌবাজারের 'করিম অ্যান্ড কোম্পানি'র প্রেস থেকে। বইখানি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। যা ভেবেছিলেন তার থেকেও বেশি সাড়া ফেলেছে। দুই বছরের মধ্যে মার্শম্যান সাহেবের কাছ থেকে নেয়া ধার শোধ করে দিয়েছেন। গঙ্গাকিশোর স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলায় তিনি লক্ষ্মী আর সরস্বতী এই দুই বোনের ভেতর সই পাতিয়ে দেবেন। সে স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে।

শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে এখন আর তিনি নিয়মিত কম্পোজিটর নন। তিনি এসেছেন মার্শম্যান সাহেবের অনুরোধে। গঙ্গাকিশোরের যা হাতের কাজ, তা দিয়ে তুলে দিতে হবে প্রথম বাংলাভাষার পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' এর কাজ।

'সমাচার দর্পণ' কম্পোজ করতে করতে গঙ্গাকিশোরের চোখে নতুন স্বপ্ন। তিনিও পত্রিকা করবেন। তবে এই সাহেবদের ধর্ম প্রচারের মতো কাগজ নয়, সমাজের খবরাখবর চালাচালির জন্য একখানি পত্রিকা জরুরি। সেই কথা ভাবতে ভাবতেই জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখনই চোখে পড়ল দু'জন মানুষ ধুতি আর ফতুয়া গায়ে আসছে এইদিকে। এখানে কোট প্যান্ট হ্যাট পরা কয়েকজন ছাড়া তো তেমন বাইরের লোক বিশেষ ঢোকে না!

ওয়ার্ড সাহেবের ঘর আলাদা। এটা অফিস ঘর। লম্বায় একশ' সত্তর ফুট। ওয়ার্ড সাহেব সব অনুবাদকদের বসিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্র অনুবাদ করতে। কেউ কেউ প্রুফ সংশোধন করছে। খোপে খোপে হরফ। কেউ সংশোধন করছে, কেউ হরফ সাজাচ্ছে। কেউ আবার কাজ হয়ে যাওয়া হরফ খোপের ভেতর নামিয়ে রাখছে। অফিসের অন্যদিকে টাইপ তৈরির

কারিগররা। তাদের মাথা ত্রিবেণীর পঞ্চানন কর্মকার-এর জামাই মনোহর হরফ তৈরির কাজ খুঁটিয়ে দেখছেন। তাদের পাশেই একদল মানুষ কালি তৈরি করছে। আর রয়েছে সেই উইলিয়াম কেরীর স্বপ্নের কাঠের ছাপাখানা। খিদিরপুর ডক থেকে নিলামে নীলকর উডনি সাহেবের কাছ থেকে কিনেছেন ছেচল্লিশ পাউন্ডে। এই সব কেনাকাটির খবর ওয়ার্ড সাহেব বারবার গল্প করেন। গঙ্গাকিশোরও অবাক হয়ে শোনেন।

জানালার কাছাকাছি হতেই চিনতে পারলেন একজনকে। নিজের গাঁয়ের লোক। অনেকদিন কলকাতা শ্রীরামপুর করতে করতে গাঁয়ে যাওয়া হয় না। গঙ্গাকিশোর মাটিতে আসন করে বসে অক্ষর গাঁথেন। তাঁর দুদিকে ছোট ছোট চৌকো বাক্সের ভেতর থাকে অক্ষর। এখন উঠে দাঁড়িয়ে কোমরটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। দেশের মানুষ এসেছে, তার কাছে গাঁয়ের ভাল-মন্দের একটু খোঁজ নেবে। গঙ্গাকিশোর জানেন বর্ধমানরাজার সেপাই সোজা বইঘরে চলে যাবে। সেখান থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যকারণ ঘাড়ে করে নিয়ে রাজবাড়িতে পৌঁছে দেবে।

দরোজার মুখে এসেই তাই আগেভাগেই হাঁক পেড়েছেন, " এসো এসো হারাণ। কেমন আছ? গাঁ-গ্রামের খবর বলো। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর কি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন! আর বেশ বই কিনছেন তো! আগের মাসেই তো গোটা পঞ্চাশ রামায়ণ নিয়েছেন বর্ধমান রাজ।"

" আজ্ঞে কর্তা আজ আমি মহারাজের পাইক হিসেবে আসি নাই। আমার কাজ আপনার সঙ্গে, আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতেই এসেছি।"

" আমার সঙ্গে? গোপনে?"

" হ্যাঁ। একটা ভারি ভাবনার ভেতর পড়েছি। আপনি কত্তা এট্টুস তরায় দেন।"

"কেন? কী এমন দরকার পড়ল আমাকে? তুমি রাজা তেজচাঁদের সেপাই। তিনি থাকতে আমি কি এমন মানুষ!"

" না না সে কাজ সামলানো রাজাবাবুর কম্ম নয়। ওই কাজে আপনিই একেবারে ঠিক মানুষ।"

" তা বলে ফেলো হারাণ। চটপট বলে ফেলো। আমার আবার কাজের তাড়া আছে। এই এখানের কম্ম শেষ করে আমারে যেতি হবে কলকাতায়। সেখানে ভারি কাজ।"

" বলছিলাম না কত্তা, একটু একান্তে বলতে হবে। এখানে তো কত কত লোক চলছে ফিরছে। ভিড়ের ভেতর হবে না।"

গঙ্গাকিশোর মাথা চুলকোলেন। এদিক ওদিক তাকালেন। কোথায় নিরিবিলি বসা যায়! বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু হারাণ গঙ্গাকিশোরের হাবভাব দেখে বুঝে ফেলেছে। সে বলে, " কত্তা চিন্তা করার কিছু নাই। আসবার সময় পথে দেখিছি এক বাঁশের মাচান বাঁধা আছে পাকুড় গাছের তলায়। সেখানে গিয়ে বসিগে। বসে বসে নদীর রূপ দেখি আর কথা কই।"

" তালে তোমার সঙ্গের মানুষটি এখানে শানের পরে বসে জল-বাতাসা খাক, আমরা কথা-টথা বলি গিয়ে।"

হারান বাগদি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, " না না, তার দরকার হবে না। ওর নাম মহেশ বাগদি, আমরা একই জাত ভাই। আমাদের সঙ্গে থাকুক সে।"

গঙ্গাকিশোর হারান বাগদির কথায় বারেবারে চমকেছে। রাজার পাইক যে ডাকাতি করে তা জানত না। হারান বলেছে সব জমিদাররাই ডাকাত পোষে। ডাকাত দিয়ে তারা যেমন অবাধ্য প্রজাদের সায়েস্তা করে আর খাজনা আদায় করে তেমনি অন্য জমিদারের এলাকায় গিয়ে ডাকাতি করে টাকা, ধনরত্ন লুঠ করিয়ে এনে নিজেদের রাজকোষ তাজা রাখে।

এইসব কথা শুনে সামলে উঠলেও গঙ্গাকিশোর হারান বাগদির পরের কথায় ধাক্কা খেয়েছেন। তাঁর এখন অনেক কাজ, অনেক স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে আছেন। এখন ডাকাত দলের সঙ্গে সরাসরি ঢুকে নিজের নাম খারাপ করা বা পুলিশের গুলিতে মরা, কোনোটাই চান না। আবার তিনি হারান ডাকাতের আবেদন ফেরাতে পারছেন না। হারানের আবেদন যে নিজের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জন্য। ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছেন, হারান পাইক হিসেবে বর্ধমান রাজের কাছ থেকে যা বেতন পায়, তাই দিয়েই সংসার চালায়। মহারাজ তেজচাঁদের কথায় যদি অন্য কোনো জমিদারিতে গিয়ে

ডাকাতি করে তো সেই ডাকাতির সব টাকা-পয়সা ধনরত্ন পুটুলি বেঁধে মহারাজের পায়ের কাছে রাখে। মহারাজ নিজের খুশিতে যা উপহার দেয়, তা দলের ভেতর বিতরণ করে। শাগরেদ ডাকাতদেরও তো সংসারধর্ম্ম করতে হয়, তাদের তো খরচাপাতি আছে! তবে হারান বাগদি নিজের জন্য কোনো ডাকাতির অর্থ গ্রহণ করে না।

গঙ্গাকিশোর শুনলেন হারানের বন্ধু মহেশ বাগদি, যার গায়ের রং একেবারে সোনার রঙ্গা, দেখলে অভিজাত ব্যক্তি বলে মনে হয়, সে নাকি চোখের উপর এক বাচ্চা মেয়েকে স্বামীর চিতায় পুড়ে যেতে দেখে ঠিক থাকতে না পেরে ক্ষেপে উঠেছে। রোজই সতীদাহকারীদের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের গুষ্ঠির ষষ্ঠীপুজো করে দিচ্ছে। কিন্তু একা হাতে কত করবে! আজ ত্রিবেণীতে সতী হওয়ার খবর পায় তো কাল কালিঘাটে। তার ছিপ নৌকো তাঁতের মাকুর মতো ছোটাছুটি করে উত্তরপাড়া, চন্দননগর, ত্রিবেণী, নদিয়া, ডুমুরদহ, গুপ্তিপাড়া — মানে গঙ্গার ঘাটেঘাটে। কিন্তু এই ছোটাছুটিতে কাজের কাজ তো কিচ্ছু হচ্ছে না। সে পৌঁছানোর আগেই অনেক অনেক জায়গায় মেয়েরা গনগনে চিতায় উঠে পুড়ে যাচ্ছে। শ্মশানে হানা দিয়ে সতীদাহের লোকজনদের পেটানো আর টাকা-পয়সা, অলঙ্কার, দানসামগ্রী কেড়ে নেয়া ছাড়া কাজের কাজ তো এতে কিচ্ছু হচ্ছে না। যে মেয়েকে ওরা সতী করছে, সে তো মারা যাচ্ছে।

মেয়েদের প্রাণ বাঁচাতে তো পারছে না।

গঙ্গাকিশোর শুধোলেন, " তা ধরো আমি তোমাদের সঙ্গ দিলাম। আমাকে ঠিক কী করতে হবে বলো তো বাপু! ভেবেছিলাম তোমাদের কিছু টাকাকড়ি দিলে ব্যপারটা মিটে যাবে, তা তো দেখছি নয়।"

গঙ্গাকিশোর চোখ পালটে পালটে একবার হারাণের দিকে, একবার মহেশের দিকে তাকালেন। চোখের তারায় জিজ্ঞাসা। মুখের উপর একটু ঘাম জমেছে। ঘাড়ে রাখা গামছা দিয়ে মুখ মুছে নিলেন। গায়ের ফতুয়ার বুকের দড়ি খুলে দিলেন। তাঁর বুঝি বিস্তর গরম লাগছে। নদীর উপরে সত্যি সত্যি বাতাস থমকে আছে। কোনো শীতলতা নেই। এমন হবার কথা নয়।

"মতলবটা মহেশ বাগদির গো কত্তা। সে ভৈরব আর পদ্মা নদী শাসন করে। সে ওপার বাংলার বড় বড় জমিদার বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করে। কেউ তারে রুখতে পারে না।"

গঙ্গাকিশোর একবার তাকিয়ে নিলেন সৌম্য দর্শন ছ-ফুটের জোয়ান মহেশ বাগদির দিকে। সত্যি তাকে দেখে ডাকাত মনে হয় না। সে কোনো জমিদার বাড়িতে ব্যবসায়ীর বেশে, কী বাওনের বেশে, কী জমিদারের বেশেও ঢুকে পড়তে পারে। কোনোভাবেই ডাকাত বলে সন্দেহ করতে পারবে না কেউ। গঙ্গাকিশোর শুনেছেন এই শান্তিপুরের দেবী ঘোষ, নবীন ঘোষ-রা চ্যালেঞ্জ দিয়ে ডাকাতি করে। কোম্পানির পুলিশ এনেও বড় বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের বাঁচাতে পারে না। কোথাও অতিথির বেশে ঢুকে, কোথাও সন্ন্যাসীর বেশে ঢুকে ধনী ব্যক্তির যথাসর্বস্ব লুঠ করে।

গঙ্গাকিশোর বলল, "সে চিঠিপত্র দিয়ে ডাকাতি না হয় করা যায়। সশস্ত্র ডাকাতেরা সামনে যাকে পায়, তার মুণ্ডু কেটে ফেলে, এই ভয়ে অনেকেই ডাকাত পড়লে দরোজা আগলায় না। ভাবে যাক ধন সম্পদের উপর দিয়ে যাক। প্রাণটা তো বাঁচুক। এখানে তো অন্য। কে কখন মরবে আর সতী হবে, তা তোমরা জানবেই বা কী করে! আর জেনে গেলেও দিনে-দুপুরে গাঁয়ে-গঞ্জে অনেক মানুষের মাঝখানে চড়াও হবে কী করে!"

মহেশ বাগদি মুখ খুলল, "কত্তাবাবা, আমরা চাতিছি লোকে আমাদের ভয়ে যেন বাড়ির বৌকে সতী করতে না নিয়ে যায় শ্মশানে। আমরা ডাকাতির কায়দায় সব বড়ো বড়ো বাড়িতে কাগজ ফেলে আসবানে। দিনের বেলায় ছদ্মবেশে। আমাদের নির্দেশ অমান্য করে সেই বাড়ির কেউ সতী হলি, পরের দিনই আক্রমণ হবে। এমনি দু-একটা বাড়িতে তছনছ করে সম্পত্তি ও জীবনহানি ঘটালে সমাজে সাড়া পরে যাবে। তখন সতীকাজ কমে আসতে পারে। বাড়ির পুরুষ মানুষদের তো আমরা পিটিয়ে তুলোর বস্তা করে দিই। তারপর তারা মরে গেলেও লাভ, বাঁচলেও লাভ। আমাদের কাজ ভয় ছড়িয়ে দেয়া। পুরুষদের মেরে মেয়েদের মৃত্যু ঠেকানো।"

ভাবনাটা যে ছোট ভাবনা নয়, তা গঙ্গাকিশোর বুঝলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে সতী করার কাজ ঠেকানো যায়নি। তার মিশনের কেরি সাহেব চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। গঙ্গাকিশোর তো নিজেই কম্পোজ করেছেন ওয়ার্ড সাহেবের জার্নাল।

সেখানে ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, ডাক্তার টমাস নামে এক মিশনারী বালিতে ৫০ বছরের এক মহিলাকে অনুমরণ থেকে অনেক অনুরোধ করেও বাঁচাতে পারেননি। ওয়ার্ড সাহেব নিজে শ্রীরামপুরে গঙ্গার ঘাটের শ্মশানে একটা বাচ্চা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ সংশয় করে ফেলেছিলেন। তারপর নিজের কোমরে বাঁধা মাসকট বন্দুক থেকে আকাশে গুলি ছুঁড়ে ভিড় হটিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নিজেদের ডেরায়।

গঙ্গাকিশোরের এই প্রেসের সর্বেসর্বা ওয়ার্ড সাহেব সেদিন মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ডায়েরির পাতায় তুলে রেখেছেন। তাইই এখন জার্নাল আকারে বের হয়। গঙ্গাকিশোর তো কম্পোজ করতে করতেই কত না অজানা বিষয় জেনে যায়। যেমন কীভাবে ডেনিস মিশনারীদের হাত থেকে এই শ্রীরামপুরের কর্তৃত্ব বৃটিশদের দিকে ঢলে গেছে ১৮০০ সালের পরে, তা। কীভাবে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের ছাপাখানা বসে শ্রীরামপুরের হাত থেকে কাজ চলে যাচ্ছে। ওয়ার্ড সাহেবের ডায়েরি থেকে সরাসরি গঙ্গাকিশোর কম্পোজ করেন। একটা ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন শ্রীরামপুর থেকে তিন মাইল পূর্বে সুখচরে ১৭৯৯ সালে একটা অদ্ভূত সতীদাহ হয়।

মারা গেছেন যে কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁর ৪০ জন স্ত্রী ছিল। আর সেই ৪০ জনের ভেতর ১৮ জন তখন জীবিত। সেই ১৮ জনই মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। এই ঘটনা ওয়ার্ড সাহেবের নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

আজ গঙ্গার পাড়ে দুই ডাকাতের মাঝখানে এই পাকুড়তলায় বসে মুহুর্মুহু ওয়ার্ড সাহেবের জার্নাল মনে পড়ছে। এতদিন তো তিনি ব্যাপারটা জেনেছেন। কম্পোজ করে গেছেন ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনাকে ভাবনায় প্রবেশাধিকার দেননি। দেয়ার কথাও নয়। বুড়ো পঞ্চানন কর্মকারের হাতে ধরে কাজ শেখা ছাত্র। সে পইপই করে শিখিয়েছে, তোমার কাজ হলো গে কোন বাক্সে কী আছে, আর তা ঠিক ভাবে নিয়ে কাগজে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বেঁধে ফেলতে পারলে কিনা। অক্ষর দেখবে, শব্দ নয়, বাক্য নয়। তা দেখা তোমার কাজ নয়।

আবার মনে পড়ল, ওয়ার্ড সাহেবের নিজের চোখে দেখা ঘটনা নয়, কিন্তু তিনি শুনেছিলেন, হুগলি জেলার বাশনাপাড়ায় এক কুলীন ব্রাহ্মণের ১০০ স্ত্রী ছিল। সেই কুলীনের মৃত্যু হলে ৩৭ জন সহমৃতা হয়েছিলেন। একটানা তিন দিন ধরে চিতার আগুন জ্বলেছিল।

গঙ্গাকিশোর মুখ খুললেন, " মানে তোমরা বলছ, একটা সাবধান বাণী ছোট ছোট কাগজে ছাপাবে। তারপর তোমরা তা বাড়িতে বাড়িতে এমন কী হাটে-বাজারে ছড়িয়ে দেবে, যেমন করে হাটে, ঘাটে ঢোল শহরত হয় ঢোল পিটিয়ে, তোমরা নীরবে, গোপনে সেই একই কাজ করতে চাও, প্রচার।"

হারান সর্দার বলল, " হ্যাঁ গো কত্তা। আমরা লিখে দিতে চাই এই নির্দেশ অমান্য করলে, ধনে প্রাণে আমরা নিকেষ করে দেব।"

গঙ্গাকিশোর বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। একটা জটিলতা যে তাঁকে ঘিরে ধরছে বেশ টের পেলেন। এই সময় তাঁর একমাত্র ভাবনা কীভাবে বই ছেপে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেয়া যায়, তা। অন্নদামঙ্গল বিক্রি করে মার্শম্যান সাহেবের থেকে নেয়া টাকা শোধ হয়ে গেছে। এখন একটু একটু করে কলকাতার দিকে মন দিতে হবে। করিম অ্যান্ড কোম্পানিতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছেপে তাঁর খানিকটা খ্যাতি হয়েছে। করিম অ্যান্ড কোম্পানি ইউরোপীয় প্রেস। তারা সাফল্যের গন্ধ পেয়েছে। তারা গঙ্গাকিশোরের কাছে আরো কাজ চায়। আরো কাজ মানে আরো বই ছাপতে হবে। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের মতো অমন কাব্য কোথায় পাবেন গঙ্গাকিশোর। গ্রামেগঞ্জের মেলায় ঘুরে ঘুরে 'অন্নদামঙ্গল' বিক্রি করতে করতে খোঁজ-খবর করেন, কোথায়, কার বাড়িতে ভালো পুঁথি আছে।

গায়ে পড়ে আসা দায়টা এড়িয়ে যেতে একটা মরিয়া চেষ্টা চালালেন গঙ্গাকিশোর। আগে রাজার পাইক হিসেবে চিনতেন হারান বাগদিকে। কিন্তু এখন যখন জানলেন সে ডাকাত দলের সর্দার, একটা ভয় মনের ভেতর কাজ করা স্বাভাবিক। ডাকাতের চণ্ডাল রাগ থাকে। গঙ্গাকিশোর যদি সরাসরি না বলে দেন, তাতে ডাকাত হারান যদি কুপিত হয়। না না সেটা করা যাবে না। গঙ্গাকিশোর মুখের ঘাম মুছে বাঁশের মাচার উপরে তার থেকে হাত খানেক দূরে দূরে বসা দুই দিক

ঘুরে ডাকাতদ্বয়কে দেখলেন। তারপর হারানের কাছে একটু ঘষটে সরে বললেন, "আচ্ছা বলো তো হারান, তুমি এত লোক থাকতে আমার কাছে এলে কেন? আরো তো ছাপাখানা আছে। চাইলে তোমারে কলকাতার আরো আরো ছাপাখানার সন্ধান দিয়ে দিতে পারি।"

হারানের দুই হাতের জোড় মুদ্রায় কাঁচুমাচু ভঙ্গি। সে বলল, "তা ছাপাখানা আরো আরো তো থাকপেই। কিন্তু আমরা ডাকাত, সবার কাছে যাবার সাহস আছে নাকি! তাছাড়া আপনি হলো গে কত্তা, আমার গাঁয়ের লোক। আমার চেনা মানুষ। চেনা মানুষের কাছে না গিয়ে কি অচেনা জায়গায় ঝাঁপ দেব! কোম্পানির পুলিশের ভয় নাই!"

মহেশ বাগদিকে ইশারা করে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল হারাণ। তারা নিজেদের ভেতর ফিসফাস করলো খানেক। গঙ্গাকিশোরের অস্বস্তি হচ্ছে। তিনি গলা উঁচিয়ে বললেন, "হারাণ, আমার কলকেতায় যাবার আছে। আজকের মতোন ছাড়ান দাও। পরে দেখতিছি। এখন না বের হলি আমার দেরি হয়ে যাবেনে।"

মহেশ বাগদি হেসে বলল, "চিন্তা করবেন না কত্তা। আজ আমাগে ছিপ নৌকোয় করে আপনারে নিয়ে যাবানে। দেখপেন চোখের নিমিষে আপনি কলকেতায়। চলেন গুছোয় নেন।"

পাঁচ

পাঁচখান ছিপ নৌকো ছুটছে। অনেক পেছনে পড়ে গেছে হারানের দলের বড় নৌকো আর মহেশের দলের বড় নৌকো। দুদিক থেকে দুই দুই চারখান ছিপ নৌকো মাঝের ছিপ নৌকো পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। মহেশের মতলবে, হারান সম্মতি দিয়েছে। তারা ছাপাখানার দেবতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে ত্রিবেণীর ঘাট ছুঁয়ে নিয়ে যাবে। দেখাবে কীভাবে জ্যান্ত মেয়েমানুষকে জোর করে পোড়ায় বাড়ির লোকেরা। সেসব দেখে গঙ্গাকত্তার মনের দোল কেটে যাবে। ঠিক তাদের সাহায্য করতে রাজি হয়ে যাবে। ত্রিবেণীর ঘাটে একটা সতী পড়বে না তা হয় না। হারাণের কথায় সম্মতি দিলেও মহেশ বাগদি সন্দেহ তুলল। বলল, "সে নাহয়, সতী সে ঘাটে পাওয়া যাবে। কিন্তু উলটো দিকে যেতে উনি রাজি হবেন কেন!"

"সে আমি কত্তাকে ভুলোয় রাখব আনে। খানিকটা সময় জানতে দেব নানে। মাঝ গাঙে আমাদের ছিপ নৌকো যখন ছোটে, তখন দুই পাড়ের কিচ্ছুই মালুম হয় না।"

"আ হা হা হা! তোমার গানের গলা তো চমৎকার! তা তুমি গান না গেয়ে পাইকগিরি, ডাকাতিগিরি করো কেন! তোমার গান শুনলে বর্ধমানরাজা নিশ্চিত তোমাকে পাইকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রাজসভার গায়ক করে নেবেন।"

হারাণ ডাকাত লজ্জা পায়। সে জিভ কাটে। তারপর খানিকটা প্রতিবাদ করতে হয় বলে হয়ত সে বলে বসে,

" কত্তা, গান শুনতে হলে আগে গায়কের চেহারা-ছবি দেখে ভক্তি আসা দরকার। আমার মতো হতকুচ্ছিৎ কালো ষণ্ডার মুখ থেকে গান শোনার আগে মানুষ ভিরমি খাবেনে "

নদীর মিষ্টি হাওয়া আর হারাণের গান শুনে গঙ্গাকিশোরের প্রাণে তখন খুব আরাম হয়েছে। তাঁর মনে নেই কলকাতার কথা। মনে নেই শ্রীরামপুরের কথা। বহড়ুর বাড়িতে বউ কয়েকটা টাকা পাঠাতে বলেছে—সেসব চিন্তাও ভুলে মেরেছেন। এই যে ওয়ার্ড সাহেব তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না। তিনি বলছেন গঙ্গাকিশোরের কলকাতায় থাকার ইচ্ছে হলে থাকুক। সে ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে কাজ করুক। সেখানেও তাদের ছাপাখানা বসেছে। তাদের অনেক বই ছাপার পরিকল্পনা। বিশেষ করে বাংলায়। গঙ্গাকিশোর বাংলা, ইংরেজি দুই ভাষাতেই দক্ষ কর্মকারক। তাঁকে হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে চাইছেন না। তাই তো এক কথায় কেরীকে বলে গঙ্গাকিশোরকে খানিক টাকা ধারও দিয়েছিলেন মার্শম্যান সাহেব। সে টাকা গঙ্গাকিশোর শোধ করে দেয়ার পরে যখন গঙ্গাকিশোর চলে যেতে চাইছেন, তখন নানা বাহানায় তাঁকে আটকে রাখছে শ্রীরামপুরের সাহেবরা। এই তো এখন নতুন একটা বাংলা সাময়িকীর কাজ ধরিয়ে দিয়েছে। এমনকি ওয়ার্ড সাহেব গঙ্গাকিশোরের মজুরি বাড়িয়েও দিয়েছেন। চার পাতা কম্পোজে এক টাকার রেট গঙ্গাকিশোরের জন্য খাটে না। তাঁকে শ্রীরামপুরের সাহেবরা দেন দেড় টাকা।

গঙ্গাকিশোর সব ভুলে আছেন। শরীর, প্রাণ — সব জুড়িয়ে যাচ্ছে যে। তিনি চোখ অর্ধেক বুজে গঙ্গার হাওয়া গায়ে মেখে নিজেকে তাজা করছিলেন। ওই চোখ বুজেই হারাণ পাইককে বললেন, "হারাণ, আর একখান গান শোনাও দেখি। বড়ই প্রাণের আরাম হয়েছে।"

হারাণ তো না বলবে না। সে চায় কত্তাকে ভুলিয়ে রাখতে। সে আর একটা গান ধরে নেয় ঃ

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখনো,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।

"আহা!" চোখ খুলে ফেললেন গঙ্গাকিশোর। একজন ডাকাতের মনে এত ভক্তি! তা ডাকাতেরা কালী ভক্ত হয়। কালী পুজো দিয়ে তারা ডাকাতিতে যায়। কিন্তু গঙ্গাকিশোর হারাণের গানের সুরে প্রাণ আকুলকরা এক প্রাণের খোঁজ পেলেন যেন। চোখ খুলে হারাণের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, দুচোখ বন্ধ করে হারাণ গান গাইছে, আর তার মুখমণ্ডল জলে ভেসে যাচ্ছে। কুলকুল করে জল নামছে দু'চোখ বেয়ে।

নিশ্চই মনের ভেতর অনেক বেদনা। অনেক পাপবোধ। কাঁদুক কাঁদুক। কত মানুষের মাথা কাটে, ধনরত্ন লুট করে এরা। কিন্তু এরাও তো মানুষ। এদের মনেও তো পাপ-পুণ্যের খেলা চলে। দস্যু রত্নাকরের মনে হয়নি! হয়েছিল বলেই তো তা থেকে মুক্তি খুঁজতে এমন একজন দেবতা তৈরি করলেন, যে দেবতা যুগযুগ ধরে মানুষকে তার পরমের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। গঙ্গাকিশোর ডাকাত হারাণের গায়ে একটা স্নেহের হাত রেখে তার কান্না থামাতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিলেন। তখনি তাঁর চোখে পড়ল, বাঁশবেড়িয়ার কালিমন্দিরের চূড়া পেছনে ফেলে নৌকো ছুটছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র থমকালেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "হারাণ, এ কোথায় নিয়ে চলেছ, আমাকে? এ তো কলকাতার পথ নয়!"

হরাণের কালি গান থেমে গেছে। সে হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "অন্যায় নেবেন না কত্তা। আজ আপনার সঙ্গে একটা শুভ কাজ শুরু করতে যাচ্চি। ত্রিবেণীর যাত্রাশুদ্ধি ঘাট একটু ছুঁয়ে যেতে মন চাইল। রাতের বেলা হলে তো কোনও শ্মশানকালির দোরে যেতাম। কিন্তু দিনের বেলা, আর আপনি সঙ্গে আছেন, আপনার কলকাতায় পৌঁছবার তাড়া, আমি তাই একটু ত্রিবেণীর যাত্রাশুদ্ধি ঘাট ছুঁয়ে যাচ্ছি, অন্যায় নেবেন না।"

"আরে, কী বলছ হারাণ! আমার কলকাতায় পৌঁছনোর তাড়া আছে। আর আমার ক্ষিধে-তেষ্টা নেই নাকি! সন্ধে সন্ধে পৌঁছলে তবে না খাবার পাব। রাত হয়ে গেলে পাব?"

রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। আজ দুপুর থেকে সব কাজ চৌপাট। শ্রীরামপুরের কাজও কিছু পড়ে থাকল, শেষ হলো না। সময় তার মাপা। কাল সকালে বের হবার কথা আছে। দশখানা 'অন্নদামঙ্গল' পৌঁছে দিতে হবে মহিষাদলের বিধবা রানি ইন্দ্রাণীদেবীর হাতে। তিনিও একটা অপূর্ব জিনিস দেবেন। সেটা দেখার জন্যই তো প্রাণ ছটফট করছে। সেটা হলো তুলসিদাসের রামচরিত মানসের একটা সুচিত্রিত পুথি। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা, শুনেছেন ৩৪৩। রাণি বলেছেন দশখানি 'অন্নদামঙ্গল' পেলে তিনি পুথিটি হস্তান্তরিত করবেন। গঙ্গাকিশোর তো মুখিয়ে আছেন এমন পুথির জন্য। চিত্রিত অন্নদামঙ্গলের যা চাহিদা হয়েছে, আবার না ছাপতে হয়। কিন্তু পুরনো বই আবার না ছেপে নতুন বই ছাপতে চান গঙ্গাধর। মনের মতো পুথি হলে তাঁর একবছরের খোরাকি আপনি উঠে আসবে।

হারাণ বাগদি হাত জোড় করে বলল, "কত্তা ক্ষমা করে দেবেন দোষ নেবেন না। আপনার আহারের ব্যবস্থা হয়ে এসেছেই। যাত্রাশুদ্ধি ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েই আপনার দুপুরের আহারের আসন পাতা হবে। চিন্তা করবেন না। আমাদের পেছন পেছন বড় দু'খানি নৌকো আসছে। তার সঙ্গে আছে একখান ছিপ নৌকো। দুপুরের খাবার মাছ, মাংস, ভাত,

অম্বল, দধি নিয়ে সেই ছিপ নৌকো এলো বলে। আর আজ আপনার জন্য খাবার হবে বলে অন্য কাউকে রাঁধতে দেয়া হয়নি। আমাদের বড় নৌকোতে আছে এগারো বারো জন কুলিনের বিধবা। তারাই রাঁধবে।"

" তুমি এতগুলো মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! তোমাকে তো পুলিশে ধরবে!"

" কী করব কত্তা। তাদের পুড়ে মরার হাত থেকে তো বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সমাজে, নিজেদের গৃহে তো তাদের ঠাঁই হচ্ছে না। এদের একটা হিল্লেও করতে পারছি না।"

ত্রিবেণী ঘাটের কাছাকাছি হতেই কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল। মহেশ বাগদি আর হারাণ বাগদি নিজেদের ভেতর চোখ চাওয়া-চায়ি করে নিল। তাদের চোখ চকচকে হয়েছে ঢের। তাদের ভাবনা মতো সব ঘটছে। মনে হয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কত্তার রাগও প্রশমিত হয়েছে। হারাণের নির্দেশে ঠিক পাড়ের কাছে নয়, তবে জলের মাঝে যতটা দূরত্বে থাকলে শ্মশানের দৃশ্য চোখে ভালো মতো ঠাওর হয়, সেরকম জায়গায় নৌকো রাখার চেষ্টা করছে মাঝিরা। শ্রোত নেই। এক জায়গায় নৌকো দাঁড় করিয়ে রাখতে দুই দিকের মাঝিকে যতটা দুই বিপরীত দিকে অল্প অল্প বৈঠা মারতে হয়, ততটুকু মারবে। হারাণের চোখে পড়ে গেছে পেছন থেকে সাদা পতাকা লাগানো একটা ছিপ নৌকো ছুটে আসছে। সেটা যে তাদের খাবার নিয়ে আসছে বুঝে ফেলেছে। দ্বিপ্রহরের আহারের আগে গঙ্গাকিশোর কত্তার চোখে যেন না পড়ে।

খুব আরাম করে খেলেন গঙ্গাকিশোর। কতদিন বাড়ির বাইরে। ভালো করে খানই না। আর এমন যত্ন করে রাঁধা খাবার পাবেন বা কোথায়! শ্রীরামপুর প্রেসের বাড়িতে যারা রান্না করে সব পুরুষ লোক। আর রান্নাতে সাহেবরা বিশেষ মশলা খেতে পছন্দ করেন না বলে কেমন একটা টলটলে ঝোল রাঁধে। আজ একেবারে প্রাণ ভরে খেয়েছেন গঙ্গাকিশোর। একেবারে বাড়ির রান্নার স্বাদ। গিন্নির মুখটা মনে আসছিল হাত মুখ ধোয়ার পর। তখন পাশের নৌকো থেকে একটা ফরশি নিয়ে এক মাঝি এসে গঙ্গাকিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তার নল। কয়েকটা টান মেরেই মৌতাতে চোখ বুজে আসে। ভরপেট খাবার পরে এমনিতেই শরীর আমেজ চায়। তাছাড়া এমন সুগন্ধী তামুক তো তার জোটে না। মাঝে মধ্যে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গেলে হুকো টানার সুযোগ হয়। তাঁর যাযাবর জীবনে এইসব বিলাসিতা রাখার সুযোগ নেই, তিনি করেনওনি।

চোখ বুজে আসছিল বটে কিন্তু হঠাৎ করে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘন্টার বিকট চিৎকারে চোখ মেলতেই হলো। গঙ্গাকিশোরের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকোটি সরে গেছে। এখন তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠেছে একটা শ্মশানঘাটের ছবি। এটা সত্যি না ছবি! বন্ধু হরচন্দ্র রায়ের দৌলতে এক কাঠখোদাই শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে খুব নিখুঁত করে কাঠখোদাই করে ছবি আঁকতে পারে। গঙ্গাকিশোর চোখ ডললেন। অভ্যাসে বড় করে তাকালেন। না, এ কোনো ছবি নয়। তিনি একাধিক জ্বলতে থাকা চিতা নিয়ে একটা শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

" হারাণ, এই শ্মশানটা কি এখানে ছিল! না কি আমাদের নৌকো চলতে শুরু করেছে?"

" কত্তা, আমরা এখানেই আছি। ঘন্টা খানেক ধরে। এটা মহাপুণ্যের ত্রিবেণী শ্মশান। এখানে মানুষের শবদাহ হলে, সে স্বর্গধাম লাভ করে।"

" তা অত বাদ্যি কেন এখানে! মানুষের মৃত্যুতে তো অন্য মানুষের মনে শোক-দুঃখ হবার কথা। সেখানে কাসর-ঘন্টা, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ওরা হই-হল্লা করছে কেন?"

" সে কি কথা, আপনি এর আগে কি কখনো দেখেননি সতীদাহের শ্মশান! সতীদাহ তো পুণ্যের কাজ। সেই পুণ্যের জন্য এত আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়। মন মন চন্দনকাঠে সাজানো চিতায় ঘি মাখান হয়।"

" সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। আমাকে দেখতে দাও। ওই দেখ একজন রমণী টলতে টলতে শ্মশান-চিতা প্রদক্ষিণ করছে। মেয়েটার শাড়ির অর্ধেক মাটিতে লুটোচ্ছে। তার শরীরের উর্ধাঙ্গ পুরোটাই নগ্ন। ও নিজেকে ঢাকা দিচ্ছে না কেন, হারাণ!"

" কত্তা, মেয়েটি কি আর নিজের ভেতর আছে! ওই যে টলতে টলতে হাঁটছে, তার কারণ ওকে মাদক খাওয়ান হয়েছে। ওর কোনো হুঁশ নেই। ওর হাতে যে আমের ডাল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, দেখুন সেটাও সে নাড়াতে পারছে না। ওটা

মাথার উপর তুলে নাড়াতে থাকা মানে সে নিজের ইচ্ছায় সতী হচ্ছে।"

সতীদাহ নিয়ে অনেক কথা শ্রীরামপুর মিশনারীতে শুনেছেন গঙ্গাকিশোর। তিনজন সাহেবই তাঁদের অভিজ্ঞতা বলেছেন। সেসব নিয়ে নিয়মিত লেখালিখি হয়েছে। গঙ্গাকিশোর কম্পোজ করেছেন ওইসব অভিজ্ঞতা। কিন্তু নিজের চোখে তা কখনো দেখেননি।

গঙ্গাকিশোর চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে আছেন। তাঁর চোখের উপর যেন কেরী সাহেবের লেখা উঠে আসছে। বাচ্চা বউটি যখন টলতে টলতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, তখন পাশেই মৃতদেহটিকে ঘি-মধু মাখাচ্ছে কয়েকজন। পুরোহিতের কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়েছে। বাজনা থেমে আছে। একটা বালকের হাতে পুরোহিত একমুঠো খই তুলে দিল। সেই বালক তা ছোট দুটি অঞ্জলি থেকে সেই মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিল। গঙ্গাকিশোর বুঝলেন বালকটি ওই মৃত মানুষটির পুত্র হবে। এর মধ্যে চিতায় শবদেহটি তুলে দেয়া হয়েছে।

যেহেতু বাদ্যযন্ত্র থেমে আছে আর গঙ্গাকিশোর একমনে তাকিয়ে আছেন দৃশ্যের দিকে সেসময় পুরোহিতের উচ্চারণ তাঁর কানে আসে। পুরোহিত সেই বিধবাকে বলছে, " বলো সতী বলো, সঙ্কল্প করো, আমার মাথার যত চুল ততদিন যেন আমি স্বর্গে স্বামীসুখ উপভোগ করতে পারি।"

পুরোহিতের এই উচ্চারণের সঙ্গে সতী হতে যাওয়া বউটি কিছু যে বলল, তা বোঝা গেল না। কিন্তু একজন এয়োতী মহিলা এসে সে সময় সেই মেয়ের মাথার চুল নতুন চিরুনি দিয়ে মাথার দুই দিকে বিছিয়ে দিল। আবার পুরোহিতের কণ্ঠ। " বলো, স্বর্গের নর্তকীরা আমার ও আমার স্বামীর জন্য যেন চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। যেন এই পুণ্যকর্মের জন্য আমার পূর্বপুরুষেরা ও স্বামীর পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে যায়।"

এসময় আবার নানাবিধ সুরে বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। কিছু শোনা যায় না। গঙ্গাকিশোর দেখতে পান সেই অর্ধ নগ্ন বউটি নিজের গা থেকে গয়নাগাটি খুলে খুলে এক একজনের হাতে তুলে দিচ্ছে। একজন তার দু'হাতে লাল সুতো বেঁধে দিল। কপালে পরাল সিঁদুরের টিপ। আর তার আঁচলে বেঁধে দিল অন্য জন কিছু খই আর কড়ি। চিতায় আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেই বালক। অত্যন্ত বেশি দাহ্য পদার্থ থাকায় মুহূর্তে সেই চিতা জ্বলে ওঠে।

পাশ থেকে হারাণ বাগদি বলল, " কত্তা, এবার তিনবার প্রদক্ষিণ করবে ওই জ্বলন্ত চিতা। তারপর মেয়েটি ওই লেলিহান আগুনে উঠে যাবে। "

" আর দেখতে পারছি না হারাণ। ওই তো মেয়েটি হাঁটতে পারছে না। তাকে ধরে নিয়ে হাঁটান হচ্ছে। তুমি কি কিছু করতে পারো না হারাণ?"

" আপনি বললে, এখনও আমি চেষ্টা করতে পারি।"

" যাও। দাঁড়িয়ে থেকো না।"

হারাণ নিজেদের দলের সংকেত ছুঁড়ল হাওয়ায়। কু উ উ কু উ উ। তার হাতে লাঠি। ঘাটের কাছেই এসে গেছিল নৌকো। হারাণ জলে ঝাঁপাল। তাকে দেখে খোলা তরোয়াল হাতে ঝাঁপাল মহেশ বাগদি। তারপর ছ-খানি ছিপ নৌকো আর দু'খানি পানশি নৌকো থেকে মুহূর্তে ঝপ ঝপ ঝাঁপানোর শব্দ। চোখের নিমেষে প্রায় গোটা চল্লিশ জন শ্মশানের ডাঙায় উঠে হা রে রে রে শব্দ তুলে ছুটে গেল চিতার দিকে। প্রথমে হারাণ আর মহেশ। আর দুই দলের দুই সর্দারকে ঘিরে ধরে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে অন্য ডাকাতেরা। ছ'খানি নৌকোর দাঁড়ি ছাড়া সব মাঝিই এখন ডাকাত। লাঠির আওয়াজ হচ্ছে। ঝাপাঝপ লাঠি ঘুরিয়ে সামনে যাকে পেরেছে মাথা ফাটিয়ে এক লাফে হাত ধরে ফেলেছে সতী হতে যাওয়া বউটির। তাকে প্রায় জোর করে চিতার ভিতর ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছে মৃতব্যক্তির আত্মীয়জন কেউ।

গঙ্গাকিশোর দেখলেন হারাণের হাত থেকে মেয়েটিকে টেনে চিতায় ছুঁড়ে দিতে সেই ব্যক্তি টানা হ্যাঁচড়া করছে। মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে হারাণের হাতের লাঠি পড়ে গেছে। মহেশ বাগদি এক লাফ মেরে জ্বলন্ত চিতার গা ঘেঁষে একেবারে সামনে চলে এসেছে। তার রাগ বাঘের মতো। গলায় গর্জন। মুহূর্তে হাতের খোলা তরোয়াল সেই ব্যক্তির গলা

লক্ষ্য করে ছুটে উঠল। মৃত ব্যক্তির বিস্মিত আত্মীয়জনের মাথা তখনো যাদের আস্ত ছিল, দেখল একটা মাথা উড়ে গিয়ে পড়েছে পেছনে আসতে থাকা পুরোহিতের গায়ে। আর ফিনকি দেয়া রক্তে ভাসছে ডাকাত আর সেই সতী হতে যাওয়া বউটি।

বড় নৌকোয় তোলা হয়েছে সেই মেয়েমানুষকে। তার জ্ঞান ফিরে আসছে ধীরে। আগের উদ্ধারপ্রাপ্ত বিধবারা মেয়েটিকে ভালো করে শাড়ি পরিয়ে নৌকোর মেঝেয় শুইয়ে দিয়েছে। গঙ্গার হাওয়াও মেয়েটির জ্ঞান ফিরতে সাহায্য করছে।। হারাণ ত্রিবেণির ঘাটে ভালো করে স্নান করে গায়ের রক্ত ধুয়েছে। দেখে নিয়েছে দশ-পনেরো জন শ্মশানে শুয়ে গোঙাচ্ছে। মেয়েটির বিতরণ করা ধন-রত্ন অন্যান্য ডাকাতেরা তুলে নিয়ে এসেছে। হারাণের নির্দেশে তাদের সব নৌকোই দ্রুত চলা শুরু করে দিয়েছে কলকাতার দিকে। তারা জানে কিছু সময়ের ভেতর গ্রামবাসীরা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আহত লোকজনদের বাঁচাতে আসবে। পুলিশ আসার আগেই যথাসম্ভব দ্রুত তাদের সরে পড়তে হবে।

কলকাতার বটতলার ঘাটে নামার সময় রাত অনেকখানি হয়েছে। একটা টিমটিম করে বাতি জ্বলছে। গঙ্গাকিশোর, হারাণকে বললেন, "হারাণ, আমি কালই তোমাদের জন্য কি করা যায়, ব্যবস্থা করব। এখন নিরাপদে মেয়েদের রাখো। তাদেরও একটা সদগতি করতে হবে। কাল এসো এইখানে।"

সাহেব পাড়ায় ১২ নং ওয়াটারলু স্ট্রিটে চলে এসেছেন গঙ্গাকিশোর। সঙ্গে রয়েছে মহেশ আর হারাণ। তারা দুজনই খুব ভদ্রগোছের কেরানির মতো পোশাক পরেছে। উত্তেজনায় গত রাতে একরকম ঘুমহীন গেছে। গতকাল চোখের উপর দেখেছে হারাণ আর মহেশ কীভাবে, কতখানি সাহস আর আকুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক সুন্দরী বধূকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু গঙ্গাকিশোর শুধুমাত্র দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া কিচ্ছুটি করেননি। তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে। মিশনারীরা বাংলার মেয়েদের নিয়ে ভাবছে, বাংলার মেয়েদের জীবন বাঁচানোর জন্য লেখালিখি করছে। আর তিনি সব কিছু জেনেও এতদিনে সমাজের কোনো কাজে এলেন না! নিজের উপর ঘৃণা এলো। ঘুম থেকে সকালে তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে গঙ্গায় চান করে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন। হারাণ এলেই বেরিয়ে পড়বেন।

গঙ্গাকিশোর জানতেন সাহেব একটু বেলা করে প্রেসে আসেন। তবুও সকাল সকাল মানে বেলা দশটায় বৌবাজারে প্রেসে পৌঁছে গেছেন। এই প্রেস থেকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপেছেন গঙ্গাকিশোর। 'অন্নদামঙ্গল' যেমন গঙ্গাকিশোরকে কলকাতায় পায়ের তলায় মাটি এনে দিয়েছে, তেমনি প্রেসের মালিকেরও খানিক পয়সা হয়েছে। প্রেসের মালিক রোজারিও সাহেব তাই গঙ্গাকিশোরকে মূল্য দেন। অন্য ভারতীয়দের দিকে যেমন হেয় চোখে তাকান, তা করেন না।

প্রেসের সামনে রোজারিও সাহেবের পালকি না দেখেই বুঝতে পেরেছেন সাহেব আসেননি। গঙ্গাকিশোর সাহেবের বাসায় সাহেবপাড়ায় চলে এসেছেন। বাড়ির পোর্টিকোয় কাঠের বেঞ্চে তিনজনকে বসিয়ে সাহেব রোজারিও একখানা চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি বসে বললেন, "টেল গঙ্গা, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

"সাহেব, সি, দে আর মাই ফ্রেন্ডস। ডু সাম ফেভার ফর দেম।"

"অফকোর্স, হামি করিব। উহারা তোমার লেখক মনে হইতেছে। হা হা চিন্তা করিও না, আমি উহাদের বই ছাপিয়া দিব।"

"সাহেব, বই ছাপিতে হইবে না। ইউ প্রিন্ট সাম প্যামফ্লেটস অনলি।"

"কেমন, কেমন! উহারা বিজনেস ম্যান নাকি?"

" না সাহেব, উহারা ডাকাত।"

রোজারিওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতক্ষণ ভালো করে গঙ্গাকিশোরের বন্ধুদের দিকে তাকাননি। এখন পিটপিট করে চেয়ে দেখলেন, সত্যিই বুক এমন চওড়া সাধারণ বাঙ্গালির হয় না। ডাকাতের মতোই। রোজারিও সাহেব ভয় পেলেও মুখে সেটা প্রকাশ করে ধরা দিতে চাইলেন না। বললেন, "গঙ্গা, ডোন্ট ট্রাই টু ফুল মি। হামি ডাকাইত চিনি। তুমি এখন বলোতো উহারা কী চায়?"

গঙ্গাকিশোর তাঁর প্রেসের মালিককে হারাণ আর মহেশের ছাপার বিষয় আর তারা কেন ছাপছে বুঝিয়ে বললেন।

রোজারিও সাহেব বললেন, " নো নো, ইম্পসিবল, ডাকাতের সঙ্গে আমরা কোনো বিজনেস করিতে পারি না। প্রভু যিশু শুধু নয়, কোম্পানিও অনুমোদন দেয় নাই।"

গঙ্গাকিশোর ভাবতে পারেননি রোজারিও সাহেব তাঁর মুখের উপর এরকম একটা সামান্য কাগজ ছাপতে না করে দেবেন। ওই একপাতা কম্পোজ তিনি নিজেই করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর কাছে তো ছাপার যন্ত্র নেই। গঙ্গাকিশোর মাথা নিচু করে সাহেবের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজে মরমে মরে যেতে যেতে মনে করতে পারলেন রোজারিও সাহেবের 'করিম অ্যান্ড কোম্পানি' প্রেসের কাছাকাছি পটলডাঙায় 'সংস্কৃত' প্রেস নামে অন্য আর একটি প্রেস আছে। সেখানে লাল্লুলালের কাছে বলবেন, তিনি নিজেই ওই এক পাতা ম্যাটার কম্পোজ করে দেবেন, লাল্লুলাল শুধু ছেপে দেবেন।

হলো না। বিপদের সময় বোঝা যায় কে আসল বন্ধু। বটতলার কোনো প্রেসই ওই ডাকাতদের ঘোষণা ছাপতে রাজি নয়। এমনকি চোরবাগান স্ট্রিটে বন্ধু হরচন্দ্র রায় তাকে ফিরিয়ে দিল। সে অবশ্য বলল, " রাগ কোরো না গঙ্গা, একটু ঠান্ডা মাথায় ভাব। ডাকাত দলের এই খোলা চিঠি নিশ্চিত পুলিশের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাবে। তারপর তারা ডাকাতের খোঁজ করতে করতে প্রেসের কাছেও পৌঁছে যাবে। জানো তো পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।"

বিকেল বেলায় একেবারে বিপর্যস্ত গঙ্গাকিশোর। পরাজিত গঙ্গাকিশোর। মোহনটুনির ঘাটে হারাণদের নিজেদের নৌকোয় তুলে দিয়ে বললেন, " হারাণ, আজ আমি ব্যর্থ হলাম। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা যে সতীর জন্য বেদনার বাঁশি আমার বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিলে, সেই বাঁশির সুর আমি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে দেব না। এই অবলা মেয়েমানুষদের হত্যার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদী কণ্ঠ আমি তুলবই। আমি নিজে প্রেস বানাব। নিজে সংবাদপত্র করব। তখন দেখব কে আমাকে বাধা দিতে আসে। আমি তোমাদের কথা লিখব, ছাপব, প্রচার করব।"

বিকেলের সূর্য সতীর সিঁদুর রাঙা কপালের মতো এলোমেলো পায়ে নদীর জলের ভেতর ডুব দিতে চাইছে। তার করুণ, ক্লান্ত মুখ নজরে পড়েছে গঙ্গাকিশোরের। হারাণ আর মহেশ বাগদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দোর্দন্ড প্রতাপ ওই ডাকাত দু'জনও যেন ভেঙে পড়েছে। তাদের সামনে সব কিছু অস্পষ্ট আর কালো হয়ে আসছে। গঙ্গাকিশোর তাদের ব্যাথিত মুখের দিকে তাকিয়ে না বলে পারলেন না, "আশা হারিও না হারাণ। একটা না একটা উপায় আমাদের সামনে আসবেই। আমরা সমাজের এই রাক্ষুসে ক্ষিধে ধ্বংস না করে ছাড়ব না। কোনো একটা উপায় করতে পারলেই আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নেব।"

নদীর জলে দ্রুত বৈঠা মারার ছপ ছপ ধ্বনি উঠল। গঙ্গাকিশোর নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত হারাণ ডাকাত, মহেশ ডাকাতের নৌকো একটা বিন্দু হয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে না যায়।

শোভাবাজার রাজবাড়ির দরবারে সকাল সকাল রবিবারের সভা বসেছে। বাওন বৃন্দাবন ঘোষালের পেছনে লাগে অনেকেই। বৃন্দাবন ঢুকতেই রামকমল সেন মুখ থেকে ফরশির নল নামিয়ে ভ্রু বাঁকিয়ে বললেন, " কি হে বেন্দাবন, আজ কার হাঁড়ির খবর এনেছ? খবুরে বেন্দাবন না থাকায় আমাদের আসর কেমন জোলো হইয়াই ছিল। এক্ষণে নতুন শ্বাস আসিল।"

বৃন্দাবন ঘোষাল, রুগ্ন শরীর গায়ে গামছা জড়ানো। পরনে আট হাতি ধুতি। ফর্সা শরীরে কেবল জ্বলজ্বল করে তার উপবীতখানি। কী জানি কোন ঘাটের বালি দিয়ে সে উপবীত মার্জনা করে। ভারি চকচকে তা। এই সভার প্রধান রাধাকান্ত দেব একদিন তা জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছিলেন। বৃন্দাবন এখানে আসে ভালো-মন্দ আহার করার জন্য। আর রাধাকান্ত দেবের মেজাজ ভালো থাকলে দু-একটা উপহারও পাওয়া যায়। সে সাধারণত খুবই দীন-হীন রূপে শ্লথপায়ে এই সভায় ঢোকে। সভায় বৃন্দাবনের কদর খবুরে হিসেবে। কলকাতার কত রকমের কেচ্ছা যে তার ঝুলিতে আছে! সে ঘরে ঢুকলেই সবাই নড়েচড়ে বসে। কিন্তু আজ বৃন্দাবন ঘোষাল নিজেই খুবই নড়েচড়ে ঘরে ঢুকেছে। খুবই উত্তেজিত তার ভঙ্গি। হাতে একখানা কাগজ। সেই কাগজ আন্দোলিত করতে করতে সে খানিকটা হাঁফায়।

রামকমল সেন বললেন, "বেন্দাবন, কী হইয়াছে! তুমি অমন করিতেছ কেন?"

তখনো ফরাসের উপর লেপ্টে বসেনি বৃন্দাবন ঘোষাল। সে হাতের কাগজ খানা দেখিয়ে বলল, "এটা কী!"

"আমরা জানিব কেমন করিয়া! তোমার হাতের জিনিস তুমি জান।"

" ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র।"

রাধাকান্ত কম কথা বলেন। তিনি মুখের ধোঁয়া ঘরের হাওয়ার ভেতর ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, "খুবই ভালো খবর বৃন্দাবন। বাংলা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র সত্যিই জরুরি ছিল।"

উত্তেজিত বৃন্দাবন ঘোষাল নিজেকে সামলাতে পারে না। সে খানিক উচ্চগ্রামেই বলে, "কিন্তু ইহাতে কি লেখা আছে জানেন?"

সমবেত স্বর, "কী করিয়া জানিব! তোমার হাতে পত্রিকা, জানিব আমরা!"

রাধাকান্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, " আচ্ছা, তোমার যাহা দেখিয়া উত্তেজনা জেগেছে, তাহা পড়িয়া তুমি আমাদিগকে তোমার উত্তেজনার কিঞ্চিত অংশ দাও।"

বৃন্দাবন ঘোষাল ফরাসের উপর বসে পড়ে সামনে কাগজ বিছিয়ে একটা সংবাদ পড়া শুরু করল। "এই সংবাদের শীর্ষ নাম 'ডাকাতের কান্না'। এখানে লেখা হইয়াছে গত সপ্তাহের শেষে, রবিবারে নিমতলা ঘাটে, সন্ধ্যাকালে এক রমণী পতির সঙ্গে সহমরণে যাবার সময় এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। লাল রেশমি শাড়ি পরিয়া যখন মৃত ব্যক্তির পত্নী গলায় ফুলের মালা আর মাথায় চিরুণি দিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতেছিল, তখন এক দল ডাকাত হা রে রে স্বরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং মৃত ব্যক্তির বাড়ির আর আর পুরুষদিগের উপর লাঠি হাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। লাঠির আঘাতে সকলের মাথা ফাটিয়া যায়। সেই সময় ডাকাত সর্দার মশাল প্রজ্জলিত করিয়া ঘোষণা দেয়, ইহার পর হইতে হুগলি নদী তীরের কোনো শ্মশানে কোনা স্ত্রী লোককে মৃতদেহ অনুগমন করাইয়া চিতায় তোলা হইলে সেই বাটীর সকলকে ধনে-জনে নির্বংশ করা হইবে। তারপর সেই ডাকাত বুক বাজাইয়া মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে লইয়া নিমতলা ঘাটে তাহাদের নৌকোয় করিয়া রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়।"

রামকমল সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "এই পত্রিকার নাম কি? কবে প্রকাশিত হয়েছে? পত্রিকার সম্পাদক কে?"

বৃন্দাবন ঘোষাল সংবাদটা পড়ে ফেলার পর অনেকখানি শান্ত। সে ধীরে ধীরে বলল, "এই তো, গত শুক্রবার প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। উপরে লেখা আছে, ১৪ই মে ১৮১৮, শুক্রবার।"

" কাগজের নাম কি?"

" বাঙ্গাল গেজেটি।"

"কে সম্পাদক?" রামকমল সেনের প্রশ্নে বৃন্দাবন ঘোষাল অনেক সময় ধরে আতিপাঁতি করে খোঁজ করল কাগজের পাতায়, পাতায়। তারপর সে দুই দিকে মাথা নাড়ল।

রাধাকান্ত দেব মুখ খুললেন, " অজ্ঞাত স্থান হইতে বাহির হইয়াছে নাকি! এই কাগজ কি সতীদাহের বিরুদ্ধে?"

মিন মিন স্বরে বৃন্দাবন ঘোষাল বলল, "একেবারে শেষের পাতায় ছোট্ট করে লেখা আছে, প্রকাশক হরচন্দ্র রায় কর্তৃক ৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।। মূল্য ৫০ পয়সা।"

রাধাকান্ত দেব-কে চিন্তিত দেখাল। বললেন, "ডাকাতের কাজ ডাকাতি করা। বড় লোকদের নিকট হইতে ধন-রত্ন ছিনাইয়া লওয়া। কিন্তু ব্যবসায়ীর নৌকো, বড়লোকদের বাড়িতে আক্রমণ না করিয়া ইহারা শ্মশানঘাটে উপস্থিত। ইহা কিছু বিচিত্র শোনাইতেছে না? ইহাদের সাথে ওই ম্লেচ্ছ রামমোহনের কোনো যোগ নেই তো! বৃন্দাবন, খবর তোলো তো।"

কবিতা

স্বরূপ মুখার্জী

নিজস্ব মৃত্যু

হে শাশ্বত মৃত্যু
আমার মৃত্যুকে নবরূপে
মধুরভাবে সৃষ্টি করো

আমি চাইলেও যেন
মৃত্যু থেকে
পরিত্রাণ না পাই

স্মৃতি যে কী ভীষণ প্রতারক
মৃত্যুই জানে
সে বেদনার গভীরতা

পিঙ্কি ঘোষ

কাঁসাই পাড়ের ইতিহাস

শেষের কবিতা আজও স্বপ্নময়
অন্তমিলের রাজ্যে সর্বত্রই নৈরাজ্য,
তোমার ভাবনায় হারিয়েছি বহুবার।
দেখেছি সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধতা,
খুঁজে পাইনি ধ্রুবতারার ঔজ্জ্বল্য,
কাঁসাই পাড়ে ঘুমিয়ে আছে একটা ইতিহাস...
শাড়ির ভাঁজ এখনও কাঁসাইয়ের বালিকে
আগলে রেখেছে সযত্নে।
দূরে সরে গেছে কত চেনা মুখ
ধূসর হয়েছে কত তীক্ষ্ণ ঈঙ্গিত।
প্রহরান্তে তুমি ধারাপাতের হিসাবে ব্যস্ত হও,
তোমার চাহিদার সাদা ক্যানভাস ভরে ওঠে
আমার আত্মহনন আর আপোষের রঙে।
তবুও তোমার সহস্র আবদারেও—

টিউলিপকে আমি পদ্ম বলবো না।

শর্বরী চৌধুরী

প্রথম

চেষ্টা করছি তোমার ছবি আঁকতে
মনে করছি আমাদের যৌথ যাপনের মুহূর্তগুলো।
কত স্মৃতি আনন্দ বেদনার !
অনেক সময় নিয়ে শেষ করি ছবিটা
ছবি শেষ হলে চমকে উঠি !
তুলির আঁচড়ে যে ফুটে উঠেছে,
সে তো তুমি নও,
সে আমার প্রথম প্রেমিক !

মঞ্জুশ্রী সরকার

দুগ্গা দুগ্গা

বরটি তোমার মোটেই যে-গো সুবিধের নয়
ভাঙ-গাঁজা-সিদ্দি খেয়ে শ্মশানে ঘুমায়।
তার উপরে আছে আবার নন্দী-ভিঙ্গী
যেমন গুরু তেমন চেলা সর্বক্ষণের সঙ্গী!
ভদ্র ঘরের মেয়ে তুমি বাছলে এমন বর!
ওই জন্যই পিতা তোমার করেছিল পর!!
বাবাকে বুঝলে ভুল, পতির কোলে ঝোল
অশিক্ষিত গোঁয়ার গোবিন্দ যজ্ঞে বাধালো গোল।

(এবছর)
দুলতে দুলতে আসবে কেমন বাপের বাড়ির পথে
চব্ব চোষ্য খেয়ে দেয়ে উঠবে ঘোড়ার রথে।

চার চারটে দিন তুমি থাকতে বাপের বাড়ি
একটা দিন কমিয়ে দিল বদ মায়েসের ধাড়ি।

পরকীয়ায় সায় দিয়েছেন দেশের বিচারপতি
এই সুযোগে ছাড়ো দেখি অমনতর পতি।
বন্ধুত্ব স্থান নিয়েছে আট থেকে আশি
এই সুযোগে একটা বন্ধু জোটও দেখি শশী।
জীবনটা যে বদলে যাবে রোমান্সে ভরপুর
তাই তো বলি শিব-ঘরণী ছাড়ো অন্তঃপুর।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী
বৃক্ষকমল

চারাগাছগুলি মাথা তুলছে, রিনরিনে গলায় বলছে—যেওনা
আমাদের ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছ তুমি?
তরুণ শাখাতরু মৌন কাঁদে, কেঁপে ওঠে বারবার
এখনও বিশ্বাস হয় না বৃক্ষকমল চলে গেছে!
মহীরুহ প্রার্থনারত—হে বৃক্ষনাথ, তুমি আছ এভাবেই
সকলেই শোনে, শুধু শোক পায় মূঢ় মানুষেরা

সাঁওতাল ছেলেমেয়ে চলে যায় পুকুরের পথে
জলেতে দীঘল মাছ খেলা করে, ঘাই দেয় ধানক্ষেত
জাবর জীবেরা খোঁজে — কোথায় রাখাল?
জীবনের গল্প ওড়ে, পাখি ও বেড়ালের খেলা....
পাতিহাঁস রাজহাঁস সমস্বরে সমাবেশে আসে

ফল ও ফুলের গাছ শান্ত হতে থাকে
চুপ করে শোনো—এই যে পাহাড় ভূমি পাথরে শয়ান
এইদেশে কখনো বা বৃক্ষকমল ফুটেছিল

সুচরিতা চক্রবর্তী
দিঘির মতো চোখ

রোজ বিকেলে যে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াই
তা কোনো নদী নয়
কালো দিঘি বলা যায়, তোমার চোখের মতো—।
ঠিক তখনই সুর্য পশ্চিমে নামতে থাকে, এক মায়াবী সোনালী আভা—
পাতা থেকে টুপ টুপ করে আলো খসে পড়ে
পেঁচার ডানায় নামে পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার।
দিঘির জল আরো কালো হলে কার ঘরে
উনুনে আঁচ পড়ে বাচ্চা কাঁদে সোহাগ মাখে জলে ভেজা ঘাস।
এতো যে সুখ লেগে আছে তোমার চোখের পলকে,
ঝুমঝুম সন্ধ্যা মালতী পিঠ বেয়ে নেমে আসে;
ইচ্ছের ডাকে আলোয়ান টেনে বাড়ানো হাত ধরে কে!
সে তো কোনো নদী নয় তোমার দিঘির মতো চোখ
সুর্যের সাথে আমাকে ডুবিয়ে মারে রোজ।

গৌতম তালুকদার
প্রতিটি মুহূর্তে

এখন এই সামান্য আয়োজনের
প্রয়োজনটুকু বোধ হয়
ফুরিয়ে আসছে।
কারো জন্য কোনো কিছুর জন্য
হৃদয়ের গভীর থেকে
বেরিয়ে আসতে পারছে না
উষ্ণতার অভিনন্দন।
স্নেহ মমতার তাড়িত আবেগ
প্রতিটি মুহূর্তে অজানার .....
কখন রাত থেকে ভোর
কার জন্য কেঁদে উঠবে !

পাপড়ি দাস সরকার
সহজ পাঠ

তুলো তুলো মেঘের মতো ঘুম ঘুম গন্ধ
জড়ো হয়েছে তোমার মুখমন্ডলের চারপাশে

তুমি হাঁ করে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছ
তোমার লালা অজান্তে গড়িয়ে পড়েছে বালিশে
আর এক অনাবিস্কৃত ভূখন্ডের মানচিত্র
জেগে উঠেছে আচমকা..

তুমি সেই দেশে প্রস্বাস নিতে চাইছ; চাইছ
বসবাস গড়ে তুলতে
তোমার না হওয়া সন্তানেরা দু' হাত বাড়িয়ে
কোলে উঠতে চাইছে; চাইছে
নতুন ভুখন্ডে দাঁড়িয়ে
স্তন্য পানের অধিকার..

একটা কালি খতম কলম দিয়ে তুমি আনমনে
খুঁচিয়ে চলেছো সেই নতুন দেশের ভূমি
তুমি একমনে চেষ্টা ক'রে চলেছ
তোমার ভুখন্ডে

তোমার গাছ বসাবার...

মো হি ত ব্যা পা রী
অবিশ্বাসের খেলা

মানুষ হয়ে মানুষ চিনতে পারিনি আজও।
চারপাশে মুখোশের আড়ালে অবিশ্বাসের ভিড়।
মানুষ যেখানে লোক ঠকাতে ব্যস্ত,
বিশ্বাসের বদলে বিশ্বাসঘাতকতাই শেষ পরিণাম।
প্রতি নিয়ত মানুষ ঠকাচ্ছে মানুষ প্রতিযোগিতায়।
আমিও ঠকছি সবার সাথেই অবলীলায়।
তবুও মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।
একদিন ঠিক হবেই হবে সত্যের জয়।
বিশ্বাসহীন জীবনে আলো বাতাস কম।
বিশ্বাসহীনের ন্যায় জীবনটা অত মূল্যহীন নয়।
আমি লক্ষ বছর ভরসা রাখব তোমাদের উপর।
তারপরেও ফিরে আসব তোমাদেরই কাছে।
বিশ্বাস তো ভাঙে বিশ্বস্তরাই জীবনে সবার।
একঝুড়ি অবিশ্বস্ততার ঋণ রেখে যায়।
আমি হেসে খেলে পার হয়ে যাই জীবনের খেলাঘর।
সব ভুলে তোমাদেরই কাছে ফিরে আসব আবার।

খে য়া স র কা র
সুর

মৃত্যুদৃশ্যে অভিনয় ছেড়ে
এদিক-ওদিক খুঁজে তুলে আনো
আলো-ছায়া যাপন
রাংতায় মোড়া প্লাস্টিকের জীবনগুলো
দরজার গায়ে জটিল চিহ্নে আটকে থাক
জানি ডানা পাওয়া সহজ নয়
বিবি খুঁজে নেয় গোলাম আর টেক্কা
তুমি চায়ের কাপে পেখম তুলো
কিংবা গেলাসেই হরিবোল
পোকামাকড় সরিয়ে জমি তৈরি করবো ঠিক
ইঁদুরের দল আসবে আবার
তোমার বাঁশির সুর আমাকে শিখতে দিও

পু লি ন রা য়
আমরা জেগে আছি

দিগন্তে রঙের খেলা শেষে
শুরু হয় শ্রাবণ বৃষ্টিপাত
অঝোরে ঝরে আকাশের কান্না

আমাদের নদীতে যে মাঝি মাছ ধরে
তার চোখেও কান্নার জল
কিষাণ-কিষাণীর বুকে আর্তনাদ

কাশবনে নেই কোনো ফুল
বাঁশবনের ফাঁকে দেখা যায় না চাঁদ
সবুজাভ ক্ষেতের শিয়র দিয়ে বয়ে যায়
কষ্টের-বেদনার নীল বাতাস

ওইখানে -ওই উর্বর সরোবরে
বাসা বেঁধেছিলো যে পাখি
স্তব্ধ হয়ে গেছে তার গান

আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সড়ক থেকে
মুছেনি রক্তের দাগ
আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত ঝরা বন্ধ হবে না
বাঙালির কান্নার রোল ধ্বনিত হবেই চিরকাল

তারপরও, আমরা জেগে আছি
জেগে থাকবো...

দি শা চ ট্টো পা ধ্যা য়
তৃষ্ণা

এখন সময়ে নেই
অতএব আকাশ
তুমি স্থির হও

মেঘের বয়ান মেনে
উদাসীন চিত্র আঁক

উড়িয়ে দাও ভ্যাঁপসা গুমোটে আঁকা
বৃষ্টির শোক
কেনো না আমার আর সময় নেই।

শি ল্পী গ ঙ্গো পা ধ্যা য়
খোঁজ

আমার তেমন কোন বন্ধু নেই তাই শত্রুও নেই

নির্ভেজাল শত্রুদের চেনা যায়, যারা
বন্ধুর মুখোশের আড়ালে শোনায় মিশ্র মালকোশ
জলের ভেতর গোপনে লুকিয়ে রাখে ক্রোধ ঈর্ষা আগুন
তারা সুযোগ পেলেই ঝাঁঝরা করে দেবে হৃদয়
ঘুরে দাঁড়ানোর সময়টুকুও দেবে না ...

যদিও
জীবনভর ঝিনুকভরা মুক্তোর মতো বন্ধু খোঁজে
বুকের ভেতর আগলে রেখেছি ভালোবাসা
রূপসাগরের তীরে একলা বসে
মানুষ খুঁজি সহজ মানুষ, যার ভেতর কোনো বক্রতা নেই,
কত মানুষের ভাষা দুর্বোধ্য মনে হয়, অথচ
নদীজল এমনকি পতঙ্গের ভাষাও বুঝি
বৃক্ষের সবুজ পাতায় রোদের উৎসবে জীবন খুঁজি

এভাবেই মাঝে মাঝে আলো আসে, বন্ধুর মত
আমি বুক পেতে দি ভালবাসায়...

পা র্ব তী ভ ট্টা চা র্য
তুমি যে আমার

দূর থেকে তোমাকে দেখেছি অনেক বার
অদ্ভুত এক ভালোলাগা চোখে,
কাছে পেলাম যখন নিখাদ ভালোবাসলাম।
দু'জনেই সঙ্গী হলাম সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত।
একদিন গেলাম পারিজাতের বনে
সেখানে গজমোতির সিংহাসনে তোমায় মানিয়েছিল ভালো।
কিন্তু, কী বলবো বলো—
না, একা নেমে এলাম আমার স্যাঁতস্যাঁতে আঙিনায়—অভাব, দ্বন্দ্ব,
মাঝে মাঝে ভাত ফোটবার প্রিয়তম গন্ধ!!
এ কী, এখানেও তুমি এলে, হলে আমার সংগ্রামী হাতিয়ার?
ওহ কবিতা, তুমি যে আমার, আমার ই।

ত ড়ি ৎ চ ক্র ব র্তী
চাঁদের সম্পান

যদি বলে দিতে, চাঁদ কেন আসে
কেন চলে যায়!
চাঁদের বুড়ির সাথে কিসের সম্পান!
কলঙ্ক মেনে তাকে ভালোবাসা
কেবল ছলনা বৈকি,
শশীমুখ সুখ্যাত জনমুখে আনাগোনা!
চাঁদমামা তোমার কোন তুতোভাই!
দুরাগত টিপ কপাল ছুঁয়ে হাতছানি,
সাদা মেঘে নেমে আসে ওড়না।
তথাপি চাঁদ বুকে এসো। তোমায় দেখে
যুগযুগ হাতে হাত দিয়ে ওরা
মুগ্ধ জোৎস্নায় চিকচিক করে সুবর্ণরেখা।
তাই তো পূর্ণিমা থাক বছর ভর।
অমাবস্যার কি'বা দরকার।

হা ন না ন আ হ সা ন
স্বপ্ন আঁকে

সোনাঝুরি গাছের ফাঁকে
হু হু বাতাস বেড়ায় খেলে
পানসি চেপে মেঘ জমিনে...
স্বপ্ন আঁকে কাদের ছেলে।

পাহাড় তখন উড্ডীয়মান
খেয়াল খুশি ভিজছে একা
ঘুম ভাঙে যেই দূর নীলিমায়
উলুকঝুলুক আলোর রেখা।

সুর-লহরী প্রবাহিত
রূপ-অপরূপ আছড়ে পড়ে
এমন ছবি দূতিয়ালি
থিরথিরানি ভিতর গড়ে।

সু স্মে লী দ ত্ত
আপনি বাঁচলে বাপের নাম...

হচ্ছেটা কি? যাহোক হোক পাশের বাড়ি আপনজন
তোর কি চেনা?কে জানে কেউ কন্যা নাকি কারোর বোন!

আমরা চিনি? ধুত্তেরিকা সময় বা কই কাজের তাড়া
বলল ওরা কী যেন নাম হায়রে স্মৃতি হতচ্ছাড়া

সব যা মুছে ওই ওখানে ডাকছে দেখি আলোর রেখা
ভুল তো সবই আসল কথা হবেই হবে বিধির লেখা...

চোখটা দেখি বড্ড চেনা কোথায় যেন আলাপ হল
ওসব কথা বড্ড ক্লিশে সত্যি নাকি মিথ্যে জোলো

সঙ্গে ছিল সঙ্গী কত তাদের দেখি বেশতো ঠিক
চরিত্রটা কেমন জানি নেশার ঘোরে দিগবিদিক...

আত্মঘাতী? হতেও পারে কিম্বা ছিল মনের রোগী
উগ্র ছিল? হয়ত তাই শরীর লোভে পুরুষ ভোগী-

শিক্ষিত মেয়ে একটা ভালো ডাক্তার সে হতোই হতো
কপালদোষে কী যে হল বাঁচল কী আর বাঁচার মতো!

যাক যা কিছু হয়েই গেল বয়েই গেল আমার বা কী
খিল তুলেছি নিজের ঘরে কাজের বোঝা হিসেব রাখি-

সময় কাটে কাগজ পড়ে তার মধ্যে ক্ষণেক চোখ
মুখবইতে কমেন্ট করি এবার তবে বিচার হোক

মিছিল হাঁটে আমিও হাঁটি হাতের পরে মোমের বাতি
ধর্ষিতা সে ভাবছি মনে চ্যানেল জুড়ে তার কী খাতির

একদিনে মেয়ে সেলিব্রিটি পর্দা জুড়ে সে হাসি মুখ
টি আর পি তে বাড়ছে দেখ জমিয়ে মজা খাবার সুখ

কাটছে দিন কাটছে রাত সামনে পুজো কী আর করি
প্রতিবাদের চক্করে কী নিজের দোষে নিজেই মরি?

তার চেয়ে ভালো বুদ্ধি নিয়ে সঠিক কাজে লাগাই মাথা
শনির কোপে জীবন যাবে সবমিলিয়ে মস্ত যা তা...

সৌমিতা সে ভালোই আছে স্বর্গ নামে দেশটি বেশ
আমিও থাকি নিজের মতো শুরুর থেকে শেষের রেশ

হঠাৎ যদি এমন কোনো ঝড়ের রাতে প্রশ্ন কাকে?
ধর্ষিতা যে বোনই হত, কন্যা হত ভুলতে তাকে?

মুচকি হাসি কি-ই বা বলি বুঝবে কবে হদ্দ বোকা
ওসব ভুলে দিব্য থাকো আখের গুছো ধুমসো খোকা

নি র্ম ল ক র ণ
থাক পাশাপাশি

আলো হাসে ঝিকমিক আকাশের গায়ে
সাদা সাদা পেঁজা মেঘ ডাইনে ও বাঁয়ে,
হেসে হেসে ভেসে যায় দূরে বহুদূরে
সে-হাসি ছড়িয়ে পড়ে কাশবন জুড়ে।
আশ্বিনে সেই মেঘে আলো-ছায়া খেলা
পুজো কবে? খোঁজ নিই এবেলা ওবেলা।
তুলোর মতন মেঘ ডাকে ইশারায়
ইচ্ছে তো হয়, ঘুরি মেঘের পাড়ায়।

কালো মেঘ হাসে না তো গম্ভীর ভাব
গুরু গুরু গর্জায় দুষ্টু স্বভাব।
মা বলে— দুষ্টু নয়, ভেবে দেখ তুমি
নিমেষে জুড়িয়ে দেয় তপ্ত যে-ভূমি!
বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে গাছ ওঠে দুলে
সাজায় নিজেকে তারা পাতা আর ফুলে।
পাখি গান গেয়ে যায়, করে কলতান
আমরাও খুশি হয়ে গেয়ে উঠি গান।

মেঘেদের ছবি দেখি আর ভালোবাসি
সাদা কালো দুই মেঘ থাক পাশাপাশি।

দু র্গা দা স মি দ্যা

ওগো অনিশ্চয়

ওগো অনিশ্চয়! মৃত্যু- দীর্ণ এই পৃথিবীতে কেন তবে আর জীবনের সঞ্চার!
অহরহ জীবন-যুদ্ধে পরাজিত প্রাণ
তবু কেন দেশে দেশে এমন যুদ্ধের অভিযান?
তোমার কাছে প্রশ্ন তবে কোন মুখে মানুষ এসে দাঁড়াবে জীবনের সম্মুখে?
এতোদিনের লালিত বিশ্বাস কি তবে এক নিঃশ্বাসে শেষ হবে যুদ্ধের কলরবে?
তবে কি মিথ্যে হল সব? সভ্যতার যাবতীয় গৌরব
যা আজ মানুষকে করেছে মহামানব বিশ্বপ্রাণের জয় যাত্রায়!
শান্তির ললিত বাণী দিয়ে গেল যাঁরা তাঁরা কি তবে বে-সাহারা এই জগতের মাঝে?
লজ্জায় মরে যাই, মরে যাই সংকোচে যুদ্ধলিপ্স সেই সব মানুষদের দেখে।

অ জ য় কৃ ষ্ণ ব্র হ্ম চা রী

অনন্তকাল বাইছি সুতো

উড়ছে ঘুড়ি — উড়ছি আমি জন্ম থেকে
লাটাই কিন্তু কাল'-এর হাতে, বলছে হেঁকে
ডাইনে-বাঁয়ে পেটকাট্টা - মুখপুড়িও
চেতন রেখে চিন্তাসুতো ঠিক ঘুরিও...

মাঞ্জা সুতো - মাঞ্জা জামা স্রোতের তালে
মেধা'র উপর মেধা ঢালে কে খেয়ালে!
উড়ছে ঘুড়ি কেউবা কাটে সকাল সকাল
কেউবা কেবল সন্ধ্যা-দুপুর, সবাই নাকাল..

উড়ছি তবু হিল্লিদিল্লি পাহাড়চূড়া'য়
সমতলের চতুর্দিকে মেঘ চেহারায়
ছাড়ছি সুতো ছাড়ছে সুতো স্ফূর্তিতে
আগে - পরে পরতে হবেই বুকচিতিয়ে।

তবুও আমরা অনন্তকাল ওড়াই ঘুড়ি
ঘুড়ির পিঠে পিঠ ঠেকে যায় তবুও উড়ি।

জ য় গো পা ল ম ন্ড ল

নিরাশার পদাবলী

সর্বোচ্চ চূড়ায় চন্দ্রচূড় ঘোরে পরী চোখবাঁধা
নিরপেক্ষ নক্ষত্র-তিলক
যোগ্য অযোগ্য নির্মল সমস্যা
ডি এ ফি এ পিছোয় বছর বছর
ওরাও কি বিকোয় কড়া-গণ্ডায়!
মাত্র কয়েক মাস বাদ-বিবাদ
চলবে পিছোবে মরবে খোকা ঘুরবে ভূত
অযোগ্য যখন তারা হবে তখন দেখা দেবে যমদূত
এ আইন পড়েনি চিত্রগুপ্ত, সর্বোচ্চ মূল্যে সর্বোচ্চ উকিল
শিবু পণ্ডিত নেত্যকালিকে খুঁজে পায়
সব শেষের পর,
ওরা পথে এদের বাজিমাত
ঠিক সময় জমির মূল্যে কিনে নেয় চিরকেলে কাম

তোমরা ভুলে যাও ফিরে পাবে সম্মান
টাকার খেলায় ভোগের মেলায় ভগবান
তারপর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সময় হলেই
বিচার-টিচার চোখ ধাঁধানো খেলা—
দুর্গামণি ছিন্নভিন্ন চিতার আলো
এও ভবিতব্য!

প্রবন্ধ

জ হি রু ল র হ মা ন ম ণ্ড ল

বাংলা উপন্যাসে পরকীয়া সম্পর্কের বিবর্তন : বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ

'পরকীয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ নায়িকাবিশেষ বা যে প্রণয়িনী কুমারী বা অপরের পত্নী। তবে সাধারণভাবে শব্দটিকে পরসম্বন্ধীয় বা অন্যের অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিবাহিত কোনো ব্যক্তির (নারী বা পুরুষ) স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহোত্তর বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক ও যৌন কর্মকাণ্ডই হল পরকীয়া। সামাজিক অনুমোদন না মিললেও, জনমানসে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কোনো একজনের পরকীয়ার গল্প শুনতে বা শোনাতে মানুষের যে আগ্রহ, তার মধ্যেই এর সূত্র নিহিত। এমন একটি মুখরোচক বিষয়কে ঔপন্যাসিকরা এড়িয়ে যাবেন, এমন হতেই পারে না। অনেক আগে থেকেই সাহিত্যে বা সমাজে পরকীয়া ব্যাপারটি প্রচলিত থাকলেও বর্তমান অস্থির সময়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে, যার কারণে আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের সকল পরিকাঠামো প্রবল নদী ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়েছে। বিবাহ নামক সমাজের আদিম প্রথাটি আজকের দিনে আরও বিপন্ন। এই বিপন্নতার সাক্ষী বাংলা উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের প্রাক্ প্রাথমিক পর্ব থেকে আজকের দিনের আধুনিক উপন্যাস কীভাবে এই বিপন্নতা অর্থাৎ পরকীয়া সম্পর্ককে ধরে রেখেছে, সেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। প্রাচীনকালে স্বাধীন সম্পর্কের রমরমা ছিল অর্থাৎ একপতিত্ব বা একপত্নীত্ব পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারত' থেকে জানা যায় — 'উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ পূর্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই! ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস ক্রোধ করিও না, ইহা নিত্যধর্ম, গবীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয়; শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মলিপ্ত হয় না...'[১]। পরকীয়া সম্পর্কের বীজ যে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, এই উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখব, নিদ্রিত শ্বশুরের অগোচরে পুত্রবধূর কামরূপে অভিসারের চিত্র বা ডোম্বীর প্রতি আসক্ত কাহ্নর শাশুড়ি, শ্যালিকা প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে গৃহত্যাগের ঘটনা; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা আইহন পত্নী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক—এই ব্যাপারগুলি বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্ককে প্রকট করে তোলে। আদি ও আদি-মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি ঘটনার দিক থেকে অনেক সরলতায় পূর্ণ। কিন্তু কালের গতিতে ধীরে ধীরে উপন্যাসের জন্ম হল, যেখানে মানুষের জীবন অনেক জটিলতায় পূর্ণ। মানুষের সম্পর্কের বিন্যাস দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। বাংলা উপন্যাসের সার্থক সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। তাঁর 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮) উপন্যাসের কথা ধরা যাক। দুটি উপন্যাসের পতিব্রতা দুই রমণী সূর্যমুখী ও ভ্রমর পতিব্রতা হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বামীরা অন্য নারীতে আসক্ত। কুন্দনন্দিনী পরকীয়া নারী রূপে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর সংসারে এসে পড়েছিল। অন্যদিকে রোহিণী উপস্থিত হয়েছিল গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মাঝে। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বা গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়নি। একজন আত্মহত্যা করে, অন্যজনকে হত্যা করা হয়। সমাজে তখন সংস্কারের প্রাবল্য খুব বেশি ছিল, কাজেই সম্পর্কগুলি পরিণতি লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই হয়তো তাঁর লেখনীতে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের যে সম্পর্কগুলি তৈরি হয়েছিল, সেই সম্পর্কের পরিণতি ভয়াবহ হয়েছিল। পরকীয়া সম্পর্ক একজন নারীর জীবনে কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভ্রমর চরিত্রটি। সে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসের একস্থানে গোবিন্দলালের উদ্দেশ্যে বলছে — 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও — আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব'[২]। এই উক্তিটি নারীর শুধু আক্ষেপের নয়, স্বাধীনচেতা মনেরও বহিঃপ্রকাশ বটে। আবার 'রজনী'(১৮৭৭) উপন্যাসে গৃহবধূ লবঙ্গলতা, পরপুরুষ অমরনাথকে বলে — 'তুমি আমার কে? তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে'[৩]। এভাবেই বঙ্কিমের উপন্যাসে পরকীয়া সম্পর্কের বিভিন্ন বৈচিত্র্য উঠে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিবাহিত রমণীর অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রণয়ের চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন চারুলতা ও বিমলার ক্ষেত্রে। তবে চারুলতার কাছে অমলের যতটা গুরুত্ব, অমলের কাছে কিন্তু তার সে গুরুত্ব নেই। তাই চারু ঘরেও নয়, পারেও নয়, মাঝখানেই থেকে যায়। 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) এর এই অভিজ্ঞতার পরই 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)-র বিমলাকে আবার স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে আসতে দেখা যায়। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি 'নষ্টনীড়' (১৩০৮)-এর অনেক পরে লেখা। দেখা যাচ্ছে ক্রমশ দাম্পত্য বন্ধনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। লক্ষণীয়, এই দুই নারী চরিত্রই নিঃসন্তান, স্বামীদের ব্যক্তিগত মনোযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। এই সাহচর্যের অভাব তাদের কাছে প্রেমের অভাব বলে মনে হয়েছিল। এই অভাববোধ থেকেই তারা পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরপুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ল্যাবরেটরি' (১৩৪৭)গল্পটির কথা না বললেই নয়। বিবাহিত নারীর দৈহিক শুচিতার সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ ভেঙেচুরে দিয়েছেন এই গল্পে। এখানে সোহিনীর মধ্য দিয়ে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির অসারতা দেখিয়ে সতীত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে কথক ভেঙে ফেলেছিলেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সে যুগে ছিল না। সেইজন্যই 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল উপেন্দ্রর কাছে। অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অসুস্থ স্বামীর রোগশয্যার পাশে কিরণময়ীকে অভিনয় করতে হয়েছিল। তবে উপেন্দ্রর প্রতি তার আন্তরিক গোপন পরকীয়া ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে —'স্বামীকে আমি কোনদিন ভালবাসিনি, কিন্তু কায়মনে ভালবাসতে চেষ্টা করতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু তিনি বাঁচলেন না, আমারও সে চেষ্টা স্থায়ী হল না। ভালবাসার সাধ যে আমার কত বেশী, সে কথা প্রথম টের পাই তোমাকে দেখে'[৪]। পত্নীনিষ্ঠ উপেন্দ্রর কাছে এই আবেদন বিশেষ কোনো কাজে আসে নি। ফলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে দিবাকরকে নিয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিল কিরণময়ী। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'(১৯১৮) উপন্যাসে দেখা যায়, সৌদামিনী নরেনের সঙ্গে ঘর ছাড়লেও দাম্পত্যজীবনের প্রচলিত ভারসাম্য রক্ষা করে তাকে ফিরিয়ে আনে তার স্বামী। এমনকি নাগরিক শিক্ষিতা অচলাকেও (গৃহদাহ-১৯২০) সামাজিক অনুশাসন মেনে ফিরে আসতে হয়েছিল। সুরেশের সঙ্গে অসামাজিক জীবনযাপন করলেও শেষে মহিমের হাত ধরেই তাকে বলতে হয় 'যতদূর বল যেতে পারব'।[৫] কিন্তু সে যাওয়ার মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ যে ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। এই ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে মানুষকে আপোষ করে চলতে হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। শরৎচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'শাস্তি' (১৯২৩) উপন্যাসে বিবাহিত গোপার কমল নামের এক রূপবান যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা এসেছে। তারা পালিয়ে ছ'মাস এক নিভৃত গ্রামে গিয়ে জীবনযাপন করে। এখানে গোপা এবং কমল দুজনেই রাজনৈতিক কর্মী। রাজনৈতিক সহকর্মীর প্রতি বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্ক স্থাপন সে যুগে অভিনব। তবে শেষ পর্যন্ত গোপাকেও ফিরে আসতে হয় তার সংসারে। যদিও স্বামী শুভেন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতো আর স্বাভাবিক হয়নি।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনার আবির্ভাব যেমন বঙ্গভঙ্গ, চটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি সমসাময়িক উপন্যাসগুলির বাঁক বদলে সাহায্য করেছিল। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। বিশ শতকের তিনের দশকে দেখা যায় সভ্যতার ভরকেন্দ্র অনেকাংশেই গ্রাম থেকে নগরে স্থানান্তরিত। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সংকল্প, বিশ্বাস ধীরে ধীরে উপন্যাসের পাতায় স্থান পাচ্ছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৩৮৩) উপন্যাসে কুসুম পরাণের বিবাহিত বউ হওয়া সত্ত্বেও শশীর প্রতি আসক্ত। কিন্তু কুসুমের ডাকে শশী প্রথমে সাড়া দেয়নি। ন' বছর ধরে ভালবাসার মানুষের উদাসীন আচরণে কুসুমের ভালবাসা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই শশী যখন সময়ের ব্যবধানে সবকিছুকে তুচ্ছ করে কুসুমকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তখন কুসুম তা প্রত্যাখান করে বলেছে — 'কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে'।[৬] সার্থক পরিণতি পায়নি শশী-কুসুম এর সম্পর্ক, কিন্তু নারীর নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার তখন থেকেই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অথৈজল' (১৩৫৪) উপন্যাসেও সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্যের সংসার ছিন্নভিন্ন হওয়ার ছবি আছে। এখানে পরকীয়া সম্পর্ক তৈরি হয়েছে পুরুষটির দিক থেকে। শিক্ষিত ডাক্তার শশাঙ্ক খেমটাওয়ালি পান্নার ছলাকলায় মুগ্ধ হন। শশাঙ্ক স্ত্রী সুরবালাকে ত্যাগ করে পান্নার সঙ্গে কলকাতায় বাসা বাধেন। শশাঙ্কের এই আসক্তি অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন বিভূতিভূষণ — 'আর একটা নেশা আমায় পেয়ে বসলো। মদের নেশার চেয়েও বেশি। কখনো কেউ আমায় ওভাবে ভালবাসেনি। সুরবালা? সে আছে, এই পর্যন্ত। কখনো

তাকে দেখে আমার এমন নেশা আসেনি মনে'।[৭] নায়কের এমন অকপট স্বীকারোক্তি এর আগের বাংলা উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়নি। একদিকে সম্পর্কের রক্ষণশীল বাতাবরণ অন্যদিকে নতুন চেতনার উন্মেষ এই পর্বের উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি বিশেষ পর্ব। প্রসঙ্গত সমকালীন ঘটনাবলীর দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ জনিত বিষণ্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতি ঘটনাগুলি জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এইসব ঘটনাগুলি সমাজের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে পঙ্গু করে তুলেছিল। ভেঙে পড়েছিল একান্নবর্তী পরিবার। শুধু পুরুষ নয়, নারীকেও বার হতে হয়েছে অর্থ উপার্জনের জন্যে। যে কালে এরকম ভাঙা-গড়ার কালপর্ব চলছে, সেখানে সম্পর্কের মধ্যে বহুবিধ জটিলতা আসতে বাধ্য। বনফুলের 'রাত্রি' (১৯৪১) উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ের ঔরসে একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু সব কিছু জেনেও ঘনশ্যাম তাকে বিবাহ করল। রাত্রি উপলব্ধি করেছিল — 'আমার জন্যে নয়, নিজের সন্তানের জন্যই এবং হয়তো আমার আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল। আমাকে সে কোনদিনই ভালবাসেনি'।[৮] এই সম্পর্কগুলি প্রমাণ করে সামাজিক সহিষ্ণুতার চরমতম পর্যায়কে। অন্যের সন্তানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে বিয়ে করা, আধুনিক মানসিকতার নামান্তর হিসেবে দেখা যায়। এই পর্বে বিভূতিভূষণের 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১) উপন্যাসে পরকীয়া সম্পর্কের অন্য এক চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বিবাহিত বিপিন বিবাহিত মাসী ও শান্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই পরকীয়ার মাত্রা যে দৈহিক ক্ষুধা ছাড়া কিছুই নয়, তা সহজেই অনুমেয়। একাধিক নারী সম্পর্ক পুরুষের বহুগামিতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'যায় যদি যাক' (১৯৪৪) উপন্যাসে পরকীয়ার মহৎ দিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বামী সুজনের চিকিৎসার জন্যে সেবা বারিধিকে দেহদানে কুণ্ঠিত হয়নি। একসময় সেবা অন্যের সন্তানের মা হয়ে উঠলেও সুজন তাকে আশ্রয় দেয়। সেবার মা হওয়ার খবরে সুজনের প্রতিক্রিয়া চোখে পড়বার মতো — 'ঘৃণা নয়, তার (সুজনের) করুণা হল নতুন করে। বললে, সন্তান কখনও অবৈধ হয় না'।[৯] পাপবোধকে দূরে সরিয়ে রেখে নব মাতৃত্বের অনুভূতি দুজনের সম্পর্ককে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল। চল্লিশের দশকের হতাশা, বেদনা, বেকারত্বের জ্বালা সমকালীন আর্থসামাজিক পটটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বনফুলের 'জঙ্গম' (১৩৫০) উপন্যাসের নায়ক এই যুগের প্রতিনিধি। সে তার স্ত্রী অমিয়াকে কাছে পেয়েও পরস্ত্রী সরমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। মিষ্টিদিদি, রিনি সম্পর্কে তার বিকৃত যৌনচেতনা প্রকাশ পায়। গণিকা মুক্তার সঙ্গে পরিচয়ের পর গণিকাপল্লীতে যেতে সে দ্বিধাবোধ করে না। স্ত্রী অমিয়া সম্বন্ধে সে ভাবতে পারে —'শংকরের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশুপ্রকৃতি অমিয়া মিটাইতে পারিবে?'।[১০] আসলে এই সময় প্রেম পরিণত হয়েছিল বিকৃতিতে। তাই কামপ্রবৃত্তিই হয়ে উঠে সম্পর্কের মূল পরিণতি।

পঞ্চাশের দশক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সময়কাল। একদিকে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে কাজের তাগিদে নারীদের চিরপরিচিত গৃহকোণ থেকে কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসা— এই ঘটনাগুলি নারী-পুরুষ সম্পর্কের মাত্রাকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়। নারীর আর্থিক স্বাধীনতা দাম্পত্য জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। জগদীশ গুপ্তের 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৩৫৯) দেখা যায়, অভয়া স্বামী বসন্তর ঘর ত্যাগ করে প্রথম পক্ষের সন্তানসহ চলে গেছে অতুলের কাছে। এখানে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)র বিমলা কিংবা 'গৃহদাহ' (১৯২০) র অচলার মতো পাপবোধ দেখা যায় না। বরং অভয়া অনুভব করে — 'মা তাহাকে তীরে বিঁধিয়া বিঁধিয়া অসংখ্য ক্ষতপথে তার আনন্দ আকঙ্ক্ষা নিষ্কাশিত করিয়া দিতেন; ইনি (স্বামী বসন্ত) যেন প্যাঁচ কষিয়া কষিয়া তার বিলাসলালসাকুল যৌবনের অমৃতরস ব্যর্থ মরুক্ষেত্রে উদগীরণ করাইতেছেন। আশাভঙ্গে অভয়ার কান্না পায়'।[১১] অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর' (১৩৬০) এবং 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৩৬২) উপন্যাসে উঠে এসেছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পরকীয়া সম্পর্ককে কীভাবে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। 'মীরার দুপুর' (১৩৬০) উপন্যাসে দেখা যায়, মীরা অসুস্থ স্বামী হীরেনকে রেখে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে। হীরেন এই অর্থ উপার্জনকে খুব একটা ভালভাবে নেয়নি। এই অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে মীরা পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে অমরেশের সঙ্গে। অমরেশকে মীরার মনে হয়— 'সুন্দর বিশাল মহীরুহের মতো, যার অফুরন্ত ফুল, ফুলের সৌরভ, ফল, ফলের শাঁস, পত্র আর পত্রের অফুরন্ত সবুজ লাবণ্য ভোগ করে মেয়েরা'।[১২] এইভাবে স্বামী হয়ে উঠে অবহেলার পাত্র, আর পরপুরুষ হয়ে উঠে পরম পুরুষ। 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৩৬২) উপন্যাসে দেখা যায়, দীপ্তি স্বামী শিবনাথের ঘর ছেড়ে মন্টুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। এখানে দীপ্তিও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী এক নারী। পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ স্বনির্ভরশীল

নারী চরিত্রগুলির অবস্থা একইরকম। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০) উপন্যাসেও এরকম নারী চরিত্রের সন্ধান মেলে। মণীন্দ্রর স্ত্রী শান্তি সংসার চালানোর জন্যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। মণীন্দ্র সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করে। এইভাবে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি পঞ্চাশ দশকের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও চাকরিহীনতা, মধ্যবিত্তের জীবন ধারণের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের উপন্যাস বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভরে বৃষ্টি' (১৯৬৭) বেশ উল্লেখযোগ্য। এখানে মালতী নিঃসঙ্কোচে স্বামীর বন্ধুর প্রতি আসক্তির কথা জানাতে পারে — 'আমি কি শুধু নয়নাংশুর স্ত্রী, একজন স্বাধীন মন সম্পন্ন মানুষ নই? আমার ভাল লাগছে জয়ন্তকে। জীবনে একটা নতুন ধরনের স্বাদ পাচ্ছি'।[১৩] এইভাবে পরকীয়া সম্পর্কে নারীর স্বাধীন মতামত উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বাণী রায়ের 'তনিমা জাতক' (১৩৭০) উপন্যাসের তনিমার কাছে পরকীয়া কোন পাপের কাজ নয়, বরংচ বেঁচে থাকার রসদ। অন্যের বিবাহিত স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমিকের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে, সে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত বোধ করেনি। পরকীয়া উপন্যাস প্রসঙ্গে এই দশকের সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'বন্যা' (১৩৭৬) উপন্যাসটির কথা স্মরণ করা যায়। উপন্যাসে সত্যর স্ত্রী লীলা সত্যর বন্ধু সুখেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ সুখেনের স্পর্শ লীলার জীবনে — 'একটা নতুন স্বাদ। আর সে স্বাদ যেন বা বন্যার জলের মত'।[১৪]

সত্তরের দশক অন্যান্য দশকগুলি থেকে বেশ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে বাংলা উপন্যাসে। এই দশকের সূচনা হয় নকশালপন্থী আন্দোলনের গর্ভে। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার' (১৩৭৮) উপন্যাসটি এই শতকের বেশ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এখানে কথকের মা আনুর সঙ্গে সুধীরমামার সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার সূচক। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আনু মানসিক বিপর্যয়ের দিনগুলিতে সুধীরবাবুকে অবলম্বন করেই সুস্থিত হয়েছিল। এখানে অবৈধ সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, ঠিক তা কিন্তু ঘটেনি। অসহায় পরিস্থিতি দুটি মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের 'সম্পর্ক' (১৩৭৯) উপন্যাসে রামতনু সোম পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসেও তরুণী নীরার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আসলে কোন বয়সে এসে এই সম্পর্ক মাথাচাড়া দেবে, তা বোঝা মুশকিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'কাগজের বউ' (১৯৭৭) প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এখানে সুবিনয় নামের এক অদ্ভুত চরিত্রের সন্ধান আমরা পাব। সে উপল নামের একটি চরিত্রকে প্ররোচিত করেছিল, তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সুবিনয়ের মত অনুযায়ী 'পৃথিবীতে কোন জিনিয়াস কখনো একটামাত্র মেয়ে মানুষ নিয়ে থাকতে পারে না'।[১৫] এ এক অদ্ভুত সময় যেখানে স্বামী পরকীয়া সম্পর্ক করবার জন্যে নিজের স্ত্রীকে অকাতরে অন্যর কাছে বিলিয়ে দিতে পারে। 'যাও পাখি' উপন্যাসটিও (১৯৭৬) পরকীয়া প্রেমের অন্যরকম দৃষ্টান্ত বহন করে। এই উপন্যাসের শীলা দাম্পত্য সম্পর্কে সুখ না পেয়ে স্বামী অজিতের পরিবর্তে সুভদ্রর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে অজিত এজন্য দুঃখ পায় না। বরংচ সে ভাবে শীলা কারোর প্রেমে পড়ুক, তাহলে সে অন্তত কিছুসময় একলা থাকতে পারবে। সম্পর্কের এই শিথিলতা সত্তর দশকের উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আশির দশকের উপন্যাসগুলির মধ্যে কণা বসুমিশ্রের 'আকাশের চাবি' (১৯৮০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে মিলিমাসি কল্যাণের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে সোহিনীর সঙ্গে নিজেই কল্যাণের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। আর কল্যাণের স্ত্রী সোহিনী হয়ে উঠেছিল মিলিমাসির খেলার পুতুল। মিলিমাসি, কল্যাণ, সোহিনী ও তার মেয়ে একটি জোড়া খাটে শোয় প্রতিদিন রাত্রিতে একসঙ্গে। সোহিনীর সামনেই চলতে থাকে অবৈধ প্রেমের লীলা। পরকীয়া সম্পর্কের এমন নির্লজ্জ প্রকাশ এর আগে কখনও কোন উপন্যাসে এমনভাবে দেখা যায় নি। শীর্ষেন্দুর 'মানবজমিন' (১৯৮৮) উপন্যাসটি পরকীয়া সম্পর্কের এক অন্যমাত্রা বহন করে। এই উপন্যাসে শ্রীনাথ-তৃষার দাম্পত্য জীবনের মাঝে শ্রীনাথের দাদা মল্লিনাথ এসে ঢুকে পড়ে। এজন্য অবশ্য শ্রীনাথই দায়ী। অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা ও দারিদ্র্য ধীরে ধীরে তৃষাকে আরও অগ্রসর করে মল্লিনাথের প্রতি। সজলের (তৃষার পুত্র) মল্লিনাথের ঔরসে জন্ম হলেও শ্রীনাথের পিতৃ পরিচয়ে তৃষা তাকে দিব্যি মানুষ করে। তৃষার মতো মেয়েরা সামাজিক সম্মানও বজায় রাখে, আবার গোপনে সব কিছু চালায়। সম্পর্কের মাপকাঠি বজায় রাখতে তৃষার মতো মেয়েরা সিদ্ধহস্ত।

নব্বই দশক ও শূন্য দশককে বিশ্বায়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই শতকগুলিতে নারী পুরুষের লিঙ্গ বিভাজনের ব্যাপারটিকে যথাসম্ভব সঙ্কোচন করা হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাকা' (১৩৯৯, শারদীয় দেশ) উপন্যাসে চন্দ্রমৌলির সঙ্গে তার বন্ধু সোমনাথের স্ত্রী সেবন্তীর এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলেও পরস্পর

পরস্পরকে চেয়েছিল। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাছের মানুষ' উপন্যাসে সম্পর্কের বিচিত্র রসায়ন দেখা যায়। উপন্যাসের তিতির জন্মদাতার পরিবর্তে পালনকারীকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছিল। এটা কিন্তু সাধারণভাবে পিতা-কন্যার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিতির জন্মসূত্রে আদিত্যের স্ত্রী ইন্দ্রাণী ও শুভাশিসের অবৈধ কন্যা। কিন্তু আদিত্য তিতিরের উপর অতিরিক্ত ভালবাসার কারণে অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের করে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। এ এক অন্যরকম পরকীয়া সম্পর্কের পরিণতি। শীর্ষেন্দুর 'খেলনাপাতি' (শারদীয়া ১৪২৩) উপন্যাসটি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উপন্যাস। এখানে পরকীয়ার প্রকাশ অত্যন্ত নির্লজ্জতার সঙ্গে। উপন্যাসে কৌশিকের স্ত্রী সাক্ষী অনায়াসেই আঁচলের স্বামী গোবিন্দকে চুমু খায়। নিছকই ব্যাপারটা সাক্ষীর কাছে খেলার মতো। ইচ্ছে হল করলাম, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির কথা একবিংশ শতকের নারী -পুরুষের কাছে নিছকই যে হাসির সামগ্রী হয়ে উঠে তা উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। তিলোত্তমা মজুমদারের 'মানুষ শাবকের কথা' (২০০১) উপন্যাসে উঠে আসে শাশুড়ি কীভাবে নিজের পুত্রবধূকে পরকীয়ায় প্রশ্রয় দিচ্ছে। তবে এই প্রশয় নিঃসন্দেহেই নারীত্বের প্রতি যন্ত্রণার কথা ভেবে। চম্পাবতীর গর্ভজাত পুত্র যদুর সঙ্গে পার্বতিয়ার বিবাহ হলেও যদু তার স্ত্রীকে যৌন সুখ দিতে অক্ষম। তাই পার্বতিয়া কিষণলালের কাছে অভিসারে যায়। আবার পার্বতিয়া একের পর এক সন্তান এনে দিলেও চম্পাবতী তা হাসি মুখে গ্রহণ করে। সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খিনী, (২০০৬) উপন্যাসটি উল্লেখ করা যাক। এখানে নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়ে রাত্রির সঙ্গে রণদেবের বিবাহ হলেও, রণদেব একের পর এক নারী সংসর্গ করতে থাকে। এই পরকীয়াতে মন নেই কেবল শরীরের প্রাধান্য। এমনকি বালিকা পলাকে রণদেবের যৌনতার শিকার হতে দেখি। পুরুষের বহুগামিতার চূড়ান্ত উন্মত্ত প্রদর্শন উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পরকীয়া ব্যাপারটি আধুনিক জীবনযাপনের সাপেক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন থেকে আধুনিক কালপর্বের উপন্যাস ঘাঁটলে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার যে, পরকীয়া সম্পর্কের ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়েই যে সম্পর্কের মধ্যে সাম্য রক্ষা করে পরকীয়া সম্পর্ক তৈরি করতে পারছে, এ কথা প্রমাণিত। পরকীয়া সম্পর্কিত বেশীরভাগ উপন্যাসগুলিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পরকীয়া সম্পর্কের ভয়ংকর পরিণতিগুলিকে। সমাজ মানসের বিবর্তনের ধারাগুলিও উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। তবে বেশীরভাগ ঔপন্যাসিক-ই পরকীয়া সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে জনমানসে একটা সচেতনতার বার্তা দিয়েছিল, এ কথা বলায় যায়। তারা চেয়েছিল সুস্থ সমাজ, বিশুদ্ধ দাম্পত্য — যা বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতেও সমান প্রাসঙ্গিক।

সূত্র নির্দেশ :

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), মহাভারত, পৃ. ১১২ , হিতবাদী সংস্করণ, ১৯৬৬
২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃ. ৫৭, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৬
৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনী, পৃ.৪২৫, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৬
৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চরিত্রহীন, পৃ. ২৫৭, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৬
৫। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৬৩
৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় , পুতুল নাচের ইতিকথা, পৃ.৪৪, প্রকাশভবন, ১৩৮৩
৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অথৈ জল, পৃ. ১৭৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৭৯
৮। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রাত্রি, পৃ. ৪৩ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪
৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যায় যদি যাক, পৃ. ১২, গুপ্ত এন্ড সন্স, ১৯৭৬
১০। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জঙ্গম, পৃ. ১২, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৩
১১। জগদীশ গুপ্ত, নিষেধের পটভূমিকায়, পৃ. ৭২, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৯
১২। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মীরার দুপুর, পৃ. ৪৬, নাভানা, ১৩৬০
১৩। বুদ্ধদেব বসু, রাত ভরে বৃষ্টি, পৃ. ১২০, এম সি সরকার এন্ড সন্স, ১৯৬৭
১৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বন্যা, পৃ.৭, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৩৭৬
১৫। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কাগজের বউ, পৃ. ৪৬, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৮৪

ত ন্ম য় দে ব না থ

উপনিবেশের কাল ও রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা'

সময়টা ছিল ১৩১০, বৈশাখ। 'ভারতী'-র সম্পাদক তখন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন ইমদাদুল হক। এর ঠিক তিন মাস পর একই শিরোনামে প্রবন্ধ লিখলেন দেবেন্দ্রনাথ সিংহ। দুটি লেখার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ঔপনিবেশিক বাংলায় তখন 'ন্যাশনালিজম ও হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদের ধারণা অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৭ পরবর্তী)। পাশাপাশি 'হিন্দু মেলা'-র (১৮৬৭) সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত সংস্কার সভা'-র (১৮৭০) গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত শাসনের যে দাবি এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' (১৮৭৬) একভাবে বাঙালির রাষ্ট্রচেতনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছিল। অন্যত্র ধর্মীয় সমালোচনার কথা যদি স্মরণ করি তাহলে দেখব, খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসন, শাস্ত্রের নামে 'অপকর্ম' তথা হিন্দুধর্মের সনাতন প্রথার 'অবনতি' এবং একাধিক মতাদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্মের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্তার একদল শিক্ষিত বাঙালিকে বেশ সংকুচিত ও ভাবিয়ে তুলেছিল, তাঁরা এই ধরনের ভাব-সংঘাতের তেমন কোনো সমাধান খুঁজে না পেলেও বারবার রামমোহনের আদর্শকেই বিশেষ উপযোগী ও কার্যকরী বলেই ভেবেছিলেন। এক সময় খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁরা যে ব্রাহ্মধর্মে আস্থা খুঁজে পেয়েছিল তাও নিরাশ করেছে, তাই বলতে বাধ্য হন, রামমোহনের 'উদার বেদোক্তধর্ম' 'ঘোর সাম্প্রদায়িক' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) তাঁদের কাছে আলাদা তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছিল।[১] তাসত্ত্বেও 'আধুনিকতা'-র বোঝাপড়ার সূত্রে ঔপনিবেশিক বাংলায় যে ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিতর্কের জন্ম বা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল পক্ষ-প্রতিপক্ষ অবস্থানগুলিকে মান্যতা দিয়ে বর্তমানের ইঙ্গিতপূর্ণ সমাধান খোঁজার চেষ্টা। যেমন রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪)। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে তৈরি হওয়া সংশয়, দ্বিধা ও অসংগতি লক্ষ করে 'সেকাল'-এর নির্মাণ। এই নির্মাণ-প্রকল্পের ধারণাকে বাঙালি মুসলমানরাও সেসময় সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বাঙালি হিন্দুর 'আধুনিকতা'-র বোঝাপড়ায় এবং সময়ের (উনিশ শতক) উন্নতি-কল্পে সুস্থ মানসিকতায় 'অপর'-এর ধারণা থেকে মুসলমানের 'অগৌরবের ইতিহাস' রচনার শুরু। রবীন্দ্রনাথ এজন্য বস্তুত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দায়ী করেছেন। কার্যত তাঁদেরকেই আদর্শ মেনে বাঙালি হিন্দুরা এই ধরনের ইতিহাস লেখায় মনোযোগী হয়েছিলেন।[২] সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বাঙালি হিন্দুর জাতীয়তাবাদের বোধকেও তৈরি করেছিল। এই ধরনের ইতিহাসই যখন ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, এমন সময় কয়েক জন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সেই ভ্রম-সংশোধনে চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের উদ্যোগ ছিল আত্মসত্তার সামাজিক নির্মাণের প্রতি। তার প্রমাণ একাধিক সাময়িকপত্রে রয়েছে। একটি উদাহরণ ইমদাদুল হকের লেখাটি। মুসলমানের অতীত ইতিহাস 'অগৌরব'-এর নয়, একথা বোঝানোর পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থানের কারণ হিসেবে প্রতিবেশী হিন্দুকে দায়ী করে বলেছেন,

"এই বিলাসিতায় উৎসর্গিতসর্বস্ব, আলস্যপরায়ণ, পৌরুষবিহীন, অদৃষ্টবিশ্বাসী, অধঃপাতিত হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবস্থা, প্রতিবেশী হিন্দুগণ আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু মুখেই সে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সাহিত্যেও তাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন; দরিদ্র, নিঃসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবেশীর উপর করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করা, সে ত দূরের কথা।"[৩]

এখানে লক্ষ করবার, মুসলমানরা যে দরিদ্র, নিঃসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত সেকথা লেখকের বোঝাপড়ায় শুরু থেকেই রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ সিংহ তাই এই লেখার সমালোচনা করতে বসে বিবাদী পক্ষের নিরাপদ অবস্থানটি (safe zone) খুঁজে পান এবং হিন্দু বাঙালির এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণাকে সংস্কার করার জন্য 'মুসলমান ভাই'দের কাছে অনুরোধ জানান। বাঙালি হিন্দু লেখকের মুসলমান-বিদ্বেষের উদাহরণ হিসেবে ইমদাদুল হক বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) গ্রন্থদুটির প্রসঙ্গ এনেছেন। এই একই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের প্রতিও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি (নবনূর, মাঘ ১৩১০)। গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকাতেই, বৈশাখ ১৩০৫। ইমদাদুল হক এই গল্পটি হয়তো আগেই পড়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁর 'ভারতী'-র লেখাতে এই গল্পের উল্লেখ নেই। কিন্তু সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরীর The

Vernacular Education in Bengal পুস্তকাকারে প্রকাশিত বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমালোচনার (১৩০৭, কার্তিক, ভারতী) কিছু অসংগতির কথা 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' লেখাতেই জানিয়েছিলেন ইমদাদুল হক। সেখান থেকেই কার্যত তিনি একটি ভবিষ্যৎ সমাজদর্শন অর্থাৎ 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'র কথা বলবেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের একতা প্রতিষ্ঠা।

বোঝাপড়ার কয়েকটি সূত্র ঃ

রবীন্দ্র-ছোটোগল্প নিয়ে তৈরি হওয়া কিছু মন্তব্য এখনও সর্বজনীন হয়ে আছে। তার সবটাই প্রায় অ্যাকাডেমিক কাজ বললে ভুল হবে না। যেমন তাঁর গল্প গীতিকাব্যের পরিচয়বাহী, তাঁর গল্পে আছে গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে শহর-জীবনের জটিল বাস্তব ইত্যাদি। প্রথম মন্তব্যটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আপত্তি ছিল, তিনি নিজের গল্পকে কখনোই গীতিধর্মী বলতে চাননি। তাসত্ত্বেও ছোটোগল্পের সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে সমালোচক-গবেষকদের ভুল ঐক্যমতের স্বীকার তেমনভাবে হতে হয়নি, যেমনটা জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক পরিসরে 'দুরাশা' গল্পটিকে পড়া হয়েছে বিশেষত 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং মানুষের 'জীবনসত্য'-কে পাশাপাশি রেখে। সেই সঙ্গে সিপাই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য খোঁজা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক থেকেছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সমকালীন সামাজিক অবস্থান, সংকট এবং তাদের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত বোঝাপড়ায় এই গল্পটি যে ধরনের জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল তা অবশ্যই সমাজবিদ্যার বিবেচনায় ধার্য হতে পারে। বিশেষত সেটাই আমরা বুঝতে চাইব। মনে রাখতে হবে, ততদিনে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরা ঐতিহ্যমিশ্রিত বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বোঝাপড়ায় অনেকখানি সচেতন। উনিশ শতকের শেষ থেকে, বিশেষ করে ১৯০৫-এর পর থেকেই সেই সচেতনতার সূত্রগুলি আলএস্লাম, ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মিহির ও সুধাকর প্রভৃতি পত্রিকার থেকে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যায় নিছক কোনো ব্যক্তিস্বার্থকে মাথায় রেখে কিংবা সামাজিক স্বীকৃতির কথা ভেবে গল্প লিখতে তিনি বসেননি। তাঁর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত বোঝাপড়া বুঝতে গেলে অন্যতম মাপকাঠি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ। এই বিষয়ে তাঁর লেখাপত্র তৈরিও হচ্ছে এই সময়ের পর থেকেই। ১৩২৯ শ্রাবণে কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি 'হিন্দুমুসলমান' কিংবা 'হিন্দুমুসলমান'[৪] প্রবন্ধ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮)। দুটোই কালান্তর-এ (১৯৩৭) সংকলিত। তাঁর বক্তব্য সহজ-সরল। রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। হিন্দুধর্ম আচারসর্বস্ব এবং মুসলমানরা ধর্মমতসর্বস্ব হওয়ায় দুয়ের মিলনের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে।[৫] তার ফলে রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতা ব্যহত হচ্ছে।[৬] সুতরাং যুগপরিবর্তনই ভরসা। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র মনুষ্যত্বের কারণেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হবে।[৭] এছাড়া তাঁর ন্যাশনালিজমবইটির কথাও মাথায় রাখা জরুরি। বইটি ১৯১৬ সালে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া তিনটি বক্তৃতার সংকলন।[৮] বলা বাহুল্য এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের 'নেশন'-এর ধারণাটি স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর 'ন্যাশনালিজম-এর ধারণা ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে গেছিল। ফলে তাঁর 'নেশন' কখনোই নিজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গর্ববোধ কিংবা 'অপর'-এর প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব বা প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করে না। তাই সাম্রাজ্যবাদকে তাঁর কাছে বারবার মানবিক সৌজন্যের বিপরীত কোটিতে বসতে হয়েছে। তাছাড়া মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সব সময়ই ছিল। গোরা (১৯১০) বা 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে।

এই সূত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়ালে রাখা দরকার, ১৮৮৯-১৯০০ সাল মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহবাস, ছিন্নপত্রের সময়। এই সময় থেকেই তাঁর ধর্ম-বিষয়ে আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তবে তা যে খুবই স্পষ্ট একটা ব্যাপার ছিল এমনটা নয়। ১৮৮৪-তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' (প্রচার, ১৫ শ্রাবণ, ১২৯১) প্রবন্ধের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'একটি পুরাতন কথা' (ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৯১)। তাঁদের মতভেদ ছিল মূলত 'সত্য'-এর সত্য-মিথ্যা সংক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য সময়ের পক্ষপাতশূন্য, কিন্তু বঙ্কিম বলেন যা লোকের হিতসাধন করে না বাইরের চেহারায় তা সত্য হলেও তা প্রকৃত সত্য নয়। এছাড়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল ৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২ সালে প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি, সেখানে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সার উপলব্ধি খুঁজে পাব। এই ধর্মে বাধ্যবাধকতা ভেঙে ঈশ্বরের সঙ্গে অহেতুক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারটাই তাঁর পছন্দের ছিল। এরপর ১৩০৯ মাঘে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয় 'ধর্মের সরল আদর্শ', যা পরে ১৯০৯-এর ধর্ম বইতে সংকলিত হয়েছে। এখানে লক্ষ করবার, 'ধর্ম' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের

যে দর্শন বা উপলব্ধি তার আক্ষরিক সূচনা এখানেই। সেখানে তিনি বলেন, যা অবশ্যই স্মরণীয় সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।[৯]

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের কেন্দ্রবিন্দু মানুষের প্রয়োজন ও সাংসারিক স্বার্থকে প্রশ্ন করা এবং 'ধর্ম' সংক্রান্ত ধারণাকে সংশয়মুক্ত করা। 'ধর্ম'-এর যে নিজস্ব ঐশ্বর্য তা সাংসারিক স্বার্থে নিষ্পেষিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' বলতে যা বুঝতেন তা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভিত্তিক চিত্তবৈকল্যে লব্ধ নয়, বরং সম্পূর্ণ সমাজসচেতন ও আধুনিক একজন মানুষের স্বতন্ত্র বোঝাপড়া। বলা বাহুল্য প্রচলিত সমাজ-মনের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এর পূর্বে 'ধর্ম', একভাবে 'হিন্দুধর্ম'-এর যে ধরনের সংস্কার বা সংস্করণ করা হয়েছে তা বড়ো অর্থে প্রচলিত সমাজ-মন বিরুদ্ধ ছিল না। বঙ্কিম যে 'জাতীয় ধর্ম'-এর কথা বলেন তার উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ বা মানবহিতৈষী হলেও তা বিভিন্ন শাস্ত্রেরই সংস্কারকৃত রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে নিজের বা সংসারের উপযোগী করে নেওয়ার পক্ষপাতী নন, এখানেই তিনি অন্যদের তুলনায় আলাদা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর আলোচনায় প্রয়োজনীয় উপনিষদের ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা পূর্বসূরিদের মতো 'ধর্ম'-কে শাস্ত্রাভিষিক্ত করে তোলার অভিপ্রায়ে নয়, বরং সর্বান্তকরণে শাস্ত্রবিধিমুক্ত, সরল ও বিকারমুক্ত উপলব্ধি হিসেবে বোঝাতে, যা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যেরও অঙ্গ ছিল। খেয়াল করব, ১৯০১-এ প্রকাশিত হবে নৈবেদ্য। যেখানে রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রমুক্ত ও সংস্কারবিযুক্ত আধ্যাত্মিক ভাবনার বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যাবে। 'আমার এ ঘরে আপনার করে/গৃহদীপখানি জ্বালো।/সব দুখশোক সার্থক হোক/লভিয়া তোমারি আলো।'[১০]

'বিচ্যুতি' বনাম 'আত্ম-নির্মাণ' :

'ভারতী' পত্রিকাতে ইমদাদুল হকের তোলা অভিযোগ এবং দেবেন্দ্রনাথ সিংহের স্বীকারোক্তি আপাতভাবে ঔপনিবেশিক বাংলার তথাকথিত বিতর্ককে যেমন চিহ্নিত করছে, তেমনই দুই পক্ষের আত্ম-নির্ধারণের ক্রমকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী পুনরায় ঝালিয়ে নিতেও চেষ্টা করেছে। উনিশ শতকের মোটামুটি শুরুর দশকের পর থেকে 'হিন্দুধর্ম'-কে যেভাবে প্রসিকিউশন করা হয়েছিল তার নির্মিত এক রৈখিক কাঠামোর মধ্যেকার 'ধর্ম' ও 'সাহিত্য' বিষয়ক যে প্রক্রিয়া তা কিন্তু নির্দিষ্ট জাতীয় গর্ববোধের থেকে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রচার' পত্রিকায় ধর্ম বিষয়ক যে কয়েকটি লেখাপত্র ছাপা হয়েছিল সেসবের মর্মার্থ তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তার একটি উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম এবং সাহিত্য' নামের প্রবন্ধটি (১২৯১, পৌষ)। সেখানে সাধারণ ধর্মপ্রচারকদের ধর্মকে বঙ্কিম 'পৈশাচিক কল্পনা' ছাড়া অন্য কিছু মনে করেননি। ধর্ম যে ব্যক্তির উন্নতিসাধনের পরিচালক সেকথা তিনি এখানে স্পষ্টতই আলোচনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে 'আধুনিকতা'র মানদণ্ড বা শরিক। তাসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের 'ভাবাদর্শ'[১১] অনুযায়ী এই ধর্মেরই ভিন্ন তাৎপর্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল[১২] এবং শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তচেতনা থেকে উঠে আসা 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম'-এর মতো বিষয়গুলি জীবনযাত্রায় প্রয়োগের চেষ্টাও ছিল। 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭-১৮৯৯) উদ্যোক্তাদের কাছে 'হিন্দু' ও 'ন্যাশনাল' হয়ে উঠেছিল একপ্রকার সমার্থক ধারণা। কিন্তু চরিত্রপূজা (১৯০৬) গ্রন্থে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মর পরিবর্তে হিন্দু বলে পরিচিত করানোর মাধ্যমে 'হিন্দু' সংক্রান্ত কোনো জাতীয় কল্পনা বা 'হিন্দু স্বাদেশিকতা'র তথাকথিত ধাঁচা রবীন্দ্রনাথের থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাছাড়া হিন্দুর আচারসর্বস্ব আচরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন অস্বস্তি ছিল। আর এই আচারসর্বস্বতার জন্যই হিন্দুর যে নিরাপত্তাহীনতার ভয় তাও একভাবে তৎকালীন 'হিন্দু ধর্ম'-এর মডেল তৈরিতে এবং নিজেদের জাতীয় দায়বদ্ধতা নির্মাণের ক্ষেত্রেও কাজে দিয়েছিল। এমনকি খ্রিস্টানরাও মহম্মদের জীবন নিয়ে বিরূপ প্রচারে মেতে উঠেছিলেন। ১৮৫৮ সালে সত্যার্ণব প্রেস (The Calcutta Christian Tract and Book Society) থেকে প্রকাশিত মহম্মদের জীবনচরিত্র ও মহম্মদীয় রাজ্যের পুরাবৃত্ত-র মতো নেতিবাচক বই তারই প্রমাণ। ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চাওয়া শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরা অতীত চরিত্রের 'বিকৃত' স্বরূপ নিয়ে যে সরব হবেন তা বলা বাহুল্য। একেও একপ্রকার 'জাতীয়তাবাদী' এজেণ্ডা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' লেখা হয়েছে উনিশ শতকের একদম শেষে পৌঁছে, সুতরাং গোটা শতাব্দী জুড়ে ঘটে চলা ধর্মীয়

প্রজেকশনের প্রতিলিপি তাঁর স্মৃতিতে নিশ্চিতভাবেই ছিল। ফলে তিনি উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদের অবস্থান থেকেই যে এই গল্পটি লিখে থাকবেন শুরু থেকে এমনটি প্রায় ভেবেই নিয়েছিলেন সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানরা। রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় কোনো সময় নিলেন না। কালিদাস নাগকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখলেন,

"আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।"[১৩]

অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তিগত জাতীয় পরিকাঠামো নির্মাণ-প্রকল্পে বর্তমান পরিস্থিতির দ্বিধা ও সংকটকে বুঝতে গিয়ে সমসাময়িক সাহিত্যে নিজের অসহজ অবস্থানকে বিচ্যুতির এক একটি ক্রম হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। এবং এই বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি অতীতের ইসলাম রাজত্বের গৌরবময় ধ্বজাকে খুব সহজে লোকপ্রিয় করে তোলবার প্রকল্পটিও তাঁরা খুব সহজেই গ্রহণ করে ফেলে। বলা বাহুল্য এখানে অধীনতার কোনো প্রশ্নই ছিল না, যা-কিছু সবটাই 'আত্ম-নির্মাণ' কেন্দ্রিক।

বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য :

'নবনূর'-এর প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩১০) 'বিমলা' নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। লেখক অজ্ঞাত।[১৪] গল্পের নায়ক চরিত্র একজন মুসলমান বালক, নাম জহুর। নায়িকা হিন্দু বালিকা বিমলা। দু-জনের প্রেম হলেও বিবাহ অসম্ভব, তাই বিমলার বিয়ে হয় জহুরের বন্ধু সুখেন্দুর সঙ্গে। জহুরেরই তত্ত্বাবধানে। তারপর বিমলাকে ভালোবেসে জহুর দীর্ঘদিন অবিবাহিত ছিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ বিবাহিত বিমলার তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি লক্ষ করে সে শীঘ্রই নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার অগ্রহায়ণ (১৩১০) সংখ্যায় এই গল্পের সমালোচনা লিখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর মোদ্দা কথা ছিল এই গল্পে যদি হিন্দুর প্রতি অবমাননা করা হত অর্থাৎ বিমলার সঙ্গে যদি জহুরের বিয়ে হত, তাহলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভাব শিথিল হয়ে পড়ত। তার জন্য দোষী হবেন মুসলমানরাই। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই 'নবনূর'-এর ১৩১০ মাঘ সংখ্যায় ইমদাদুল হক লিখলেন 'বিমলা ও হিন্দু সমাজ' নামের প্রবন্ধটি। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'বিমলা'-র পাশাপাশি রাখলেন রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মিলন' গল্পদুটি। ইমদাদুল হক হিন্দু-মুসলমানের প্রণয় সম্পর্ককে সর্বার্থেই স্বীকার করেছেন। তাঁর অনুমান এই ধরনের সম্পর্ক সমাজে যদি সত্য-ই প্রতিষ্ঠা পেত তাহলে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বাড়ত বৈ কমত না। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের চোখে এই ধরনের কল্পনা ছিল একেবারেই অমার্জনীয়। অর্থাৎ তাঁদের মতো বাঙালি হিন্দুরা মনে করেছিলেন এই ধরনের প্রণয় সম্পর্কের কল্পনা 'সম্ভ্রান্ত' হিন্দুর কাছে অসহনীয়। বলা বাহুল্য হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চেতনায় এই ধরনের বোঝাপড়া সেসময় সাবলীল ছিল। অল্পবিস্তর সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার শিকার হলেই বিভ্রান্তি বোধ করতেন তাঁরা।

'মিলন' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গভাষা' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩১০)। এই গল্পে আছে নায়ক বিক্রম সিংহের সঙ্গে নবাবপুত্রী ফাতিমার প্রেম। বিক্রম সিংহ ও ফাতিমা পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। উল্লেখ্য, এই গল্পে বিক্রম সিংহকে পাওয়ার জন্য ফাতিমাকে হিন্দু হওয়ার সাধনা করতে হয়নি। অন্যদিকে 'দুরাশা' গল্পে কেশরলালকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নবাবপুত্রী নুরউন্নীসা হিন্দুদের রীতি-নীতি শিখতে চেয়েছিলেন। ফাতিমা এবং নুরউন্নীসার এই ভাবগত পার্থক্যকে ইমদাদুল হক অকাতরে গল্পকারের কল্পনার অবনতি বলেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে বিষয়টি ঠিক তেমন ছিল না। ইমদাদুল হক বাঙালি মুসলমানের স্বার্থে তাঁর বক্তব্যের যুক্তি সাজিয়েছিলেন বলেই হয়তো এমনটি ঘটেছে। কেননা, আমরা লক্ষ করেছি 'মিলন' গল্পে কোথাও বিক্রম সিংহকে 'হিন্দু' পরিচয়ে উপস্থাপন করা হয়নি। অর্থাৎ বিক্রম সিংহ কেবলই চরিত্র মাত্র। কিন্তু 'দুরাশা'-তে কেশরলাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবাবপুত্রী প্রথমেই বলেছেন, 'কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল।' ফলে দুই গল্পের দুই নায়কের স্বভাব-চরিত্র যে এক হবে না, তা স্বাভাবিক। হিন্দু কেশরলালের দৈনন্দিন যাপনের ছবি গল্পে যেভাবে সচল ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, সেখান থেকে এটুকু তো অনুমান হয় তাঁকে পেতে হলে প্রথমে একজন হিন্দু হিসেবে তাঁর যাপনকে আত্মস্থ করা জরুরি। আর সেটাই করতে চেয়েছিলেন নবাবপুত্রী।

'বিমলা' গল্পে 'সম্ভ্রান্ত' হিন্দু রমণীর সঙ্গে একজন মুসলমানের প্রেমে পরিণতি সম্ভব হলে 'হিন্দু'র যে ধরনের অবমাননা ঘটতে পারে বলে দীনেশচন্দ্র অনুমান করেছিলেন মূলত সেই ধারণাকে প্রশ্ন করেছেন ইমদাদুল হক। কার্যত এই সূত্রেই প্রসঙ্গক্রমে 'দুরাশা' গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষেও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন—

১. রবিবাবু দেখাইয়াছেন, মুসলমানরমণী হিন্দুরক্তপ্রবাহ শিরায় অনুভব করিয়া গর্ব করা সত্ত্বেও হিন্দুস্বামী লাভ করিতে হইলে তাহার বহু সাধন আবশ্যক; কেননা, তাহার দেহে যেটুকু হিন্দু রক্ত আছে, মুসলমান সংস্পর্শে সেটুকুর জাতি গিয়েছে। রবিবাবুর এ কল্পনায় মুসলমান সমাজ খুবই সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই! বঙ্গের প্রিয় কবির ত এই কীর্তি, সুতরাং তাহাঁকে ধন্যবাদ।[১৫]

২. রবীন্দ্রনাথও মুসলমানরমণীর আদর্শ খর্ব করিয়া একটা উদ্ভট গল্প রচনায় বাহ্বা লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে কি হিন্দুর মজ্জাগত মুসলমানঘৃণা অথবা সঙ্কীর্ণচিত্ততা স্পষ্ট অনুভূত হয় না?[১৬]

এই ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে গিয়েই কার্যত ইমদাদুল হক 'দুরাশা' গল্প ও রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে ভুল করলেন। গল্পের কোথাও এমনটা বলা নেই নবাবপুত্রীর শরীরে যে হিন্দু রক্ত আছে তা মুসলমানের সংস্পর্শে নষ্ট হয়েছে। বরং উল্টো বলা আছে, নবাবপুত্রী নিজের শিরায় যে পুণ্যরক্তপ্রবাহ অনুভব করতেন সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সঙ্গে ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করে তিনি তৃপ্তি পেতেন। গল্পের মজা এখানেই লুকিয়ে আছে। নবাবপুত্রী শুরু থেকেই কি কেশরলালের প্রেমে পড়েছিলেন? তা তো আমাদের মনে হয় না। তাই যদি হত তাহলে প্রথম থেকেই কেশরলালের রূপ-বর্ণনার পরিচয় কিংবা ষোড়শী কন্যার পক্ষে এক যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য যা যা উপকরণ প্রয়োজন তার প্রায় কিছু হয়তো আমরা দেখতে পেতাম। কিন্তু তা নেই বা ঘটেনি। আমাদের প্রশ্ন, নবাবপুত্রী প্রথম প্রথম কেশরলাল নাকি তার ধর্মীয় আচরণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন? গল্পে আছে, নবাবপুত্রী স্বধর্মের উপাসনাবিধি জানতেন না, তাঁদের অন্তঃপুরের প্রমোদভবনে ধর্ম সজীব ছিল না। অথচ তিনি ছোটো থেকেই মনে মনে স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা অনুভব করেছিলেন। আর সেই কারণেই কেশরলালের নিত্য ধর্মাচরণ তাঁকে দিনে দিনে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। এবং তাঁদের বাড়ির হিন্দু বাঁদি প্রতিদিন যেভাবে নত হয়ে কেশরলালের পদধূলি নিত তা দেখে নবাবপুত্রীর ঈর্ষা হত। এই ঈর্ষার কারণ কিন্তু হিন্দুর বাঁদির কেশরলালের সন্নিকটে যাওয়ার কারণে কিংবা প্রেমের অভিযোগে নয়; হিন্দু বাঁদির পক্ষে যা সম্ভব তা একজন নবাবপুত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না এই ভেবেই তাঁর ঈর্ষা হত। তাছাড়া নবাবপুত্রী তো নিজের মুখেই জানিয়েছেন, 'একসময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত'। তাহলে এখানে 'হিন্দু' কেশরলাল কেন? কেননা, ধর্মাচরণের প্রতি কেশরলালই যে নবাবপুত্রীর সামনে একমাত্র ছিলেন, ফলে তাঁর ধর্মপিপাসাকে একনিষ্ঠ কেশরলালই একমাত্র জাগাতে পেরেছে। হয়তো আচারনিষ্ঠ কোনো এক মুসলমানের পক্ষেও এই ধর্মপিপাসাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হত! কিন্তু সেই সুযোগ ঘটেনি। তিনি একমাত্র কেশরলালকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ এখানে নবাবপুত্রীর ধর্মপিপাসাই মুখ্য। তাছাড়া নবাবপুত্রী যে যোগিনী সেজে কাশীর শিবানন্দস্বামীর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে সেখানে কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই অধ্যয়ন ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল কেশরলালের সংবাদ সংগ্রহ করা। কেননা, তখন শিবানন্দস্বামীর কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ আসত। সুতরাং এই গল্প দ্বিতীয় বৃত্তে পৌঁছে রোমান্সের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হচ্ছে।

পাশাপাশি কেশরলাল চরিত্রটিকেও বোঝা দরকার। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর কেল্লা ছিল যমুনার তীরে। এবং তাঁর ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। কোম্পানিবাহাদুরের সঙ্গে সিপাইদের লড়াই শুরু হওয়ার পর সেই বিপ্লবের আঁচ যখন বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও এসে লাগল তখন কেশরলালই বলেছিলেন, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যুতক্রীড়া বসাইতে হইবে।' যে কেশরলালকে শুধুমাত্র 'হিন্দু ব্রাহ্মণ' বলেই দাগিয়ে দেওয়া হল তাঁর মুখে 'হিন্দুমুসলমানের দ্যুতক্রীড়া' কথাটি শুনে আশ্চর্য হতে হয় না কি? তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে কারণে এই ধরনের বৈষম্যের অভিযোগটি আরও সংঘাতিক হয়ে উঠেছিল তা হল কেশরলালের মুখ দিয়ে বলানো অন্য একটি সংলাপের দায়ে। রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনার তীরে আম্রকাননছায়ায় আহত কেশরলালকে যমুনার জল খাওয়ানোর সময় নবাবপুত্রী নিজের পরিচয় দিলে কেশরলাল সিংহের মতো গর্জন করে বলেছিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী। মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' অনেকের মনে হতে পারে

কেশরলালের থেকে এতটাও আশা করা যায় না; কিন্তু বিষয় হল কেশরলাল একজন স্বদেশী যুবা, তাঁর কাছে এমন পরিস্থিতিতে 'ধর্ম' কিংবা 'বিধর্ম'-এর তুলনায় কঠিন সত্য ও নবাবের প্রতি অবিশ্বাস ছিল যথেষ্ট বেদনাদায়ক। ফলে তীক্ষ্ণ ফলার মতো তাঁর জেহাদতুল্য ঘোষণা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর 'বিধর্মী' উচ্চারণ বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রে পাওয়া। তাছাড়া সত্যি যদি তিনি বিধর্মীকে অপছন্দ বা ঘৃণা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই বদ্রাওন ফৌজে অধিনায়কের পদে কখনোই যোগ দিতেন না। যেমনভাবে আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৩৭২) উপন্যাসের নায়ক অর্জুনবর্মাকে পাব, যিনি যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়, যবনদের অত্যাচারে গুলবর্গা ত্যাগ করে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরে গিয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া কেশরলালের এই সংলাপের মধ্যেই ভিন্ন একটি কৌশলও লুকিয়ে আছে, যদি বিধর্মী কিংবা যবনের প্রতি তাঁর সহজাত বা প্রকৃতিগত ঘৃণা থাকত তাহলে তিনি কথাটি অন্যভাবে বলতে পারতেন, যেমন 'মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' না বলে বলতে পারতেন, 'মৃত্যুকালে যবনের হাতের জল খাইয়া আমার ধর্ম নষ্ট হইল!' অর্থাৎ 'যবন' কথাটি বিধর্মী অর্থে আসছে না, আসছে বিশ্বাসঘাতকের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে। ফলে সেই সময় এভাবেও তো গল্পটিকে পড়া যেতে পারত!

আমাদের হয়তো মনে হতে পারে গল্পের শেষে কেশরলালকে আরও খানিকটা দেখতে পেলে হয়তো ভালোই লাগত। কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য কেশরলালকে যেভাবে ফিরিয়ে আনছেন রবীন্দ্রনাথ, এই কেশরলাল পূর্বের কেশরলাল নন। ফলে এই কেশরলালের তেমন কোনো প্রয়োজন আর নেই, নবাবপুত্রী ঠিক যতটুকু তাঁকে দেখেছিলেন কিংবা লেখকের উদ্দেশ্যগত প্রকৃত ভাবসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যতখানি প্রয়োজন ছিল ততটাই তাঁকে পাওয়া গেছে। তবে গল্পশৈলীর বিচারে এই সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অন্য রকম। এই গল্পের দুটি কাহিনি বর্তমান এবং অতীত। অতীতের কাহিনিটি ঘটছে নবাবপুত্রীর সংলাপের মাধ্যমে। ফলে নবাবপুত্রীর চোখ দিয়েই আমরা আসল গল্পের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি, আবার ফিরেও আসছি। অর্থাৎ চাইলে নবাবপুত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কোনোভাবেই কেশরলালকে অতিরিক্ত রূপে পাচ্ছি না। তাছাড়া একান্তই যদি দেখাতে চাওয়াও হয় তাহলে কেশরলালের সংসারযাপন দেখাতে হত, নয়তো তাঁর দারিদ্র্য, তা না হলে ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে নবাবপুত্রীর প্রতি পুনরায় অবমাননাকে প্রকট করে তুলতে হত। বলা বাহুল্য সেসব এখানে দেখানো সম্ভব হত না। তাছাড়া নবাবপুত্রীর অবমাননাকে দেখাতে গেলে তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও সংযমকে ছোটো করা হত। গল্পের উদ্দেশ্য তা ছিল না। নবাবপুত্রী ও তাঁর জীবন-সাধনাকে সর্বজনীন ও চিরন্তন করে তোলার জন্য গল্পের শেষে তাই ব্রাহ্মণ্য-গৌরব কিংবা হিন্দু কেশরলাল নেই। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাটি ইমদাদুল হকরা ধরতে পারেননি বলেই মনে হয়। যে কারণে এই গল্পকে সহজেই 'উদ্ভট গল্প' বলা হয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান-বিদ্বেষী সংকীর্ণ চিত্ত বলে দোষারোপ করা হয়েছে। এই মন্তব্যকে নাকচ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কার্য-বিবরণ কিংবা শান্তিনিকেতনের সাধনাশ্রমের উদাহরণ টানলেই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা মোক্ষম যুক্তি হবে না। এই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করতে হবে এই গল্পের মধ্যেকার যুক্তির দ্বারাই।

ভুললে চলবে না, নবাবপুত্রীর পক্ষে সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন কিংবা তাঁর মতো জীবন-সাধনা যে কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো তিনি নবাবপুত্রী বলেই এতটা সম্ভব হয়েছে। সেকালের কোনো বাঙালি হিন্দু পরিবারের নারীর পক্ষে এতকিছু পালন করা অসম্ভব ছিল। শুধু অসম্ভব নয়, অমার্জনীয়ও ছিল। উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দু রমণীর যা-কিছু প্রতিবাদ তা কিন্তু পুরুষ-আধিপত্যের ছত্রছায়ায় বসে। সেই ছত্রছায়া নবাবপুত্রী অকাতরে কাটিয়ে উঠেছিলেন, কোনো রকম ছন্দপতন ছাড়াই। সমাজের কোনো বিধি-নিষেধের ধার ধারেননি তিনি। বরং সমগ্র বাঙালি সমাজকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ করেছেন। একথা মানতে হবে, দীর্ঘ আটত্রিশ বছর সবকিছু ছেড়ে, অগ্রাহ্য করে, শুধুমাত্র নিজের অনুরাগের সন্ধানে দেশের প্রায় সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো সেসময় কোনো হিন্দু নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে এই গল্পের নায়িকা হিসেবে অন্য কোনো সাধারণ মুসলমান বা হিন্দু রমণীকে না বেছে রবীন্দ্রনাথ কেন শুধুমাত্র একজন নবাবপুত্রীকেই বেছে নিলেন তার উত্তর কি ইমদাদুল হকরা খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন? সেকালে বাঙালি মুসলমান মহিলারাও যে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারতেন সেই কল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথই তো প্রথম বললেন। তাছাড়া ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ ভাবকে সরাতে গিয়ে কেশরলালকেও সরিয়ে রাখতে হয়েছিল হয়তো। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন আদর্শকে, তাঁর 'সময়ের পক্ষপাতশূন্য সত্য'-কে তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন?

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. বীণাপাণি পত্রিকায় ১৩০৩ চৈত্র, ১৩০৪ বৈশাখ সংখ্যা জুড়ে যতীন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম' নামে ধারাবাহিক দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য এই লেখা ছিল সেই সময়ের প্রতিনিধি-স্থানীয়।

২. ভারতী, ১৩০৭, কার্তিক।

৩. ভারতী, ১৩১০, বৈশাখ, পৃষ্ঠা ২৪।

৪. ২০০৯-২০১০ সালে প্রকাশিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা-র রবীন্দ্র সংখ্যায় অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ নিয়ে তথ্য-যুক্তিপূর্ণ একটি গবেষণা-প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'হিন্দুমুসলমান': প্রেক্ষিতের পুনর্বিচার'। আগ্রহী পাঠককে এটি অবশ্যই পড়তে অনুরোধ করছি। খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান লেখা।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৫, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয়তাবাদ (ন্যাশনালিজম, অনু. অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২২, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ১২।

১১. অধ্যাপক ছন্দম চক্রবর্তী তাঁর নির্মাণের কূট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুকিশোরসাহিত্যে ভাবাদর্শগত প্রসঙ্গ (একলব্য, ২০২৪) বইতে ভূমিকা-স্বরূপ 'ভাবাদর্শ' কথাটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা সেখান থেকে শব্দটি সরাসরি গ্রহণ করেছি।

১২. এই প্রসঙ্গে আমরা প্রধানত দু-ধরনের লেখা তথা চিন্তার উদাহরণ দিতে পারি। দুটি লেখাই ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা আলোচনা থেকে নেওয়া (প্রথম খণ্ড, ১৮৮৪-৮৫)। 'ধর্মপ্রচার' নামের একটি লেখাতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় জাতীয় ও নৈতিক বোধের জায়গা থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বয়ান তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'ধর্মরে আস্বাদ কেবল ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে সক্ষম।' (পৃষ্ঠা ১৭৮) এই একই সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছে 'জাতীয় ভাব, উন্নতি ও একতা' নামের লেখাটি (পৃষ্ঠা ৮৭-৯৪)। সেখানে জাতিভেদ, ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক ভাব, বাল্য-বিবাহ, ব্যভিচার ও সুরাপানের মতো সামাজিক অক্রিয়া-কাণ্ডের থেকে রেহাই পেতে সমাজে বিশুদ্ধ ধর্মনীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। যা প্রাচীন সমাজ ধর্মনীতির উপর সংস্থাপিত এবং সকল উন্নতির মূল।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৩।

১৪. দীনেশচন্দ্র সেনের লেখাটি পড়লে বোঝা যায় এই গল্প একজন বাঙালি মুসলমান লেখকের লেখা।

১৫. নবনূর, প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৩১০, পৃষ্ঠা ৩৮০।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

ঋণ:

১. গোপাল হালদার সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ: শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০১০

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৯

৩. রণজিৎ গুহ, কবির নাম ও সর্বনাম, কলকাতা: তালপাতা, ২০১২

৪. সন্দীপন সেন, রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৫

গল্প

অরূপ কুমার মন্ডল

বিশ্বাসঘাতক

চাকরি পাওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই তীর্থযাত্রার মতো নির্বাচনে যাচ্ছে কিষান। ভোট মানেই যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তক্ষয়ী লড়াই। জীবন বাজি রেখে ভোটকর্মীদের অগ্নিপরীক্ষা। নামে ট্রেনিং, আসলে টেনশন তৈরির কৌশল। একদিন আগে থেকেই গাড়িতে বাদুড় ঝোলা, দমবন্ধ গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে মেট্রিয়ালস সংগ্রহ, পুলিশ ট্যাগ দিয়েই লড়াই শুরু। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা কিষানের আগে কখনো হয়নি। রাতে অঝরে বৃষ্টি, এই কারণেই বোধহয় বাইরে চিৎকার চেঁচামেচি বোমাবাজির আওয়াজটা কম। অবশ্য সেই অবসরে পাশের ঘরে পিস্তলধারী একমাত্র পুলিশটি অঘোরে ঘুম দিচ্ছে। টিম টিম করে জ্বলতে থাকা চল্লিশ ওয়ার্ডের বাল্বটি নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ছোট কয়েকটা মোমবাতির উপর নির্ভর করে বৈকণ্ঠপুর প্রাইমারি স্কুলের ছোট্ট ঘরটিতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পাঁচজনের টিমে প্রিসাইটিং ও ফাস্টপোলিং ছাড়া বাকি তিনজন লো বেঞ্চে শুয়ে ঠান্ডায় নাক ডাকাচ্ছে। মাটির মেঝেতে পলিথিন বিছিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের পেপার ওয়ার্কে ব্যস্ত দু'জন। রাত তখন কত খেয়াল নেই। ঘরের জানালা দরজাগুলো কোনক্রমে আটকানো। স্কুলের মাঠ পেরিয়ে বেশ দূরে পায়খানা বাথরুম। তার অবস্থাও তথৈবচ। ভোট উপলক্ষে এটুকুই ব্যবস্থা। তাও মন্দের ভালো। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাওয়ার তো উপায় নেই। তাই কিষান খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাজ সারে। তখনও শেষ হয়নি, সেই আলো-আঁধারিতে দেখে পাশের পচা পানা পুকুর থেকে কালো দড়ির মতো এঁকেবেঁকে কী একটা পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকছে। গ্রামের ছেলে, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়না, এটা সাপ। বিষধর সাপও হতে পারে। ভয়ে মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যেতে গিয়ে ভিজে মাটিতে পা পিছলে একেবারে নিচে। জল-কাদায় মাখামাখি। কোনক্রমে উঠে দেখে সাপটি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকছে। চেঁচামেচি করতেই প্রিসাইডিং বিজয়বাবু বেঞ্চের একটি ভাঙা পায়া নিয়ে ছুটে এসে সজোরে সাপটির মাজায় বাড়ি মারে। তখন সে খেপে গিয়ে হিংস্রভাবে 'ফোঁস' শব্দ করে তেড়ে আসে। মুহূর্তে বিজয়বাবুর তৎপরতা ও মুহুর্মুহু আক্রমণে সাপটি নেতিয়ে পড়ে।

সাপ মরলো কিন্তু ভয় পিছু ছাড়লো না। হাওয়া বাতাসহীন বদ্ধ ঘরটির চারিদিকে ছড়ানো কার্বলিক অ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে কী যে কষ্ট তা ওই দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ জানলো না।

এমনি করে সারারাত....

তখনো প্রভাতের আলো ফোটেনি। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। আতঙ্কে চমকে ওঠে কৃষান। ভয়ে ভয়ে দরজা খোলে - '... ও আপনারা এসেছে গেছেন ?' এজেন্টদের দেখে স্বস্তি।

পায়খানা বাথরুম সেরে দ্রুত তৈরি হয় সবাই। বেঞ্চ সাজানো, ভোটিং কমপ্লেক্স তৈরি, এজেন্ট নিয়োগ, দ্রুত পরপর তিনটি ব্যালট বক্স প্রস্তুত করা... ইত্যাদি

সারারাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর দিনের শুরুটা রৌদ্র ঝলমল হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে উত্তাপ। প্রকৃতির রুদ্ররোষ, মাঝে মাঝে বৃষ্টির দাপটা , তারই মধ্যে মুহূর্মুহু পেটোর আওয়াজ আতঙ্ক ছোটাছুটি চিৎকার চেঁচামেচি খিস্তি খেয়ুড় - একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশে সারাটা দিন। মাঝে মাঝে খন্ডযুদ্ধ। তখন ভোট বন্ধ। সকাল থেকে শুকনো কয়েকটি বিস্কুট আর জল ছাড়া কিছুই পেটে পড়েনি। সুযোগও নেই। ফাস্টপোলিং কিষান ভোটারদের আইডেন্টি কার্ড দেখে ভোটার-লিস্ট মিলিয়ে স্লিপ ইস্যু করে দূরবর্তী এজেন্টদের হেঁকে শুনিয়ে দেওয়ার পর ভোটারের বাম হাতের তর্জনীতে কালি লাগিয়ে দিচ্ছে। দেরি হলে এজেন্টদের শাসানি। ভুল হলে খড়্গহস্ত। ধৈর্য রাখা খুবই কষ্টের। যেন গণতন্ত্রের নাগপাশ একমাত্র ভোটকর্মীদেরই গলায়। এরই মধ্যে এগিয়ে আসা ঘোমটায় ঢাকা এক মহিলার সবকিছু মিলিয়ে বাম হাতের তর্জনীতে কালি লাগানোর সময় হঠাৎ চোখে পড়ে, তার হাতের কব্জির ভেতরের অংশে একটি ছোট্ট ফুলের ছবির, ট্যাটু। চমকে ওঠে কিষাণ। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য কিছু ভাবার কোনও সুযোগ নেই।

যত সময় গড়ায় তত ভোটারদের লাইন দীর্ঘ হয়। বিকাল সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। গম গম করছে। বাড়ছে উত্তেজনার

পারদ। এরমধ্যে হঠাৎ লোডশেডিং। তীব্র উল্লাসে হাজার লোকের চিৎকারে চমকে উঠে কিষাণ। শুরু হয় দুমদাম বোম্বিং, আর্তনাদ। একটা প্রবল ঝড় আছড়ে পড়ে অন্ধকার বুথের মধ্যে। মুহূর্তে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড, ব্যালট বক্স, কাগজপত্র কাড়াকাড়ি, মারপিট, দক্ষযজ্ঞ। একটা ভয়ংকর পরিবেশে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। পরিস্থিতি বুঝে কিষান পেছনে রাখা নিজের ব্যাগটা নিয়ে বেঞ্চের নিচে লুকাতে গেলে আচমকা একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ে তার কাঁধে। 'বাবাগো...' বলে চিৎকার করে উঠতেই মুহূর্মুহু কিল ঘুসি। কোনক্রমে নিজেকে বাঁচাতে পাশের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই কোথা থেকে কে একজন এসে সজোরে হেঁচকা টানে অন্ধকার ভিড়ের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে যায় স্কুলের পেছনে ঝোপের মধ্যে। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য কিষান, আর কিছু জানেনা।

পেছনে ঝোপ জঙ্গল, খালপাড়ে খড়ের ছাউনি, কঞ্চির ছিটে বেড়ার গায়ে মাটির গাঁথনি। ঘরের স্যাঁতসেতে মেঝেতে খেজুর পাতার চেটাইতে কিষানের জ্ঞান ফেরে। চোখ মেলে দেখে ধুলো মাখা একটি ছোট্ট শিশু কন্যা বসে খেলছে। তার সরল দৃষ্টি হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকেও খোঁজার চেষ্টা করে। কিষাণ অবাক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়, স্মৃতিপটে মিলানোর চেষ্টা করে....কি করে সে এখানে এল।

শ্যামলী ছোট্ট মেয়েটিকে ঘরে রেখে নদীতে গেছে মিন ধরতে। এছাড়া তার উপায় কী। গত বছর স্বামী মার্ডার হওয়ার পর দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্রায় অনাহারে। যাকে ভালবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে ছিল সে যে তাকে ভালোবাসেনি সেটা তার জানা ছিল না। চাকরি পেয়ে চলে যায় দূরে। আর যোগাযোগ রাখেনি। শুকনো বাসি মনটাকে নিয়ে বহুদিন অপেক্ষার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে আর বিয়ে করবে না। এমনি করেই টিউশনি ও সামাজিক কাজের মধ্যেই জীবনটা চালিয়ে দেবে। কিন্তু বাদ সাধলো তার বাবা। বাবার নির্দেশে একান্ত বাধ্য হয়েই তার দলের ছেলেকে বিয়ে করে শ্যামলী। দলের কাজেই এই গণ্ডগ্রামে। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও স্বভাব, চরিত্র ও আদর্শে ছেলেটি ছিল অত্যন্ত ভদ্র। হবেই না বা কেন ? শ্যামলী মনে করে, তাদের দলের আদর্শটাই তো বড়। অন্যান্য দলের কর্মীরা যখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তখন ক্ষমতায় যত তুচ্ছ হোক না কেন একমাত্র আদর্শের জোরেই না খেতে পেরেও হাসি মুখে কথা বলতে পারে এ দলের ছেলেরা। দলের কাজে সারাদিন বাইরে থাকার সময় পেটে কিছু না পড়লেও রাতে ঘরে ফিরে এক গাল হেসে সে শ্যামলীর সাথে কথা বলতো। শ্যামলী এতে গর্ববোধ করে ছেলেকে বলতো, 'বাবার মত হও।' কিন্তু ভালো মানুষের জায়গা বড়ই সীমিত। যখন অভাব দারিদ্র প্রলোভনেও তাকে কেনা যাচ্ছে না, তখন কোনো না কোনো অছিলায় তাকে ফাঁসিয়ে দাও, অথবা রাতের অন্ধকারে বেওয়ারিশ লাশ বানাও। গতবছর এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে লাশ বস্তাবন্দি অবস্থায় ইট ঢুকিয়ে গভীর নদীতে ছুঁড়ে দিয়েছিল একদল হায়না।

শ্যামলী বাগদি হলেও পড়াশোনায় কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু এই গণ্ডগ্রামে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সেখানে পড়াশোনা তো নৈব নৈব চ। গ্রামের সরকারি স্কুলটা মাস্টার অভাবে বহুদিন বন্ধ। টিউশন পড়তে কেউ আসে না। তাই বাধ্য হয়েই পেট চালাতে নদীর উপরেই ভরসা।

* * * * * * * * * * * * * *

এরমধ্যে ভোটকেন্দ্র অর্থাৎ স্কুলটি দখল নিয়েছে মিলিটারি। সকাল হতেই খবর ছড়িয়ে পড়েছে একজন ভোটকর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গতবছর এরকমই একজন ভোটকর্মীর ডেডবডি রেললাইনে পড়েছিল। যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাই প্রশাসন পুলিশ ভীষণ তৎপর। গোটা এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে। সড়ক পথ, রেলপথ, নদীপথ, ঝোপ জঙ্গল, এমনকি বাড়ি বাড়ি খোঁজও চলছে।

জ্ঞান ফিরলেও ওঠার ক্ষমতা নেই কিষানের। সারা শরীরে ব্যথা। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে, "তুই কে রে ?" সে বোকার মত তাকিয়ে আধো আধো করে কী উত্তর দেয় বুঝতে পারেনা। আবার বলে, 'তোর বাবা-মা কোথায় রে?'

—"লদীতে জাল টানতি গে" মেয়েটি উত্তর দেয়।

এমন সময় একটা কলরব কানে আসে। বাইরে থেকে কে একজন হাঁক পাড়ে— "শ্যামলী ঘরে আছিস?" কঞ্চির বেড়ার

ফাঁক দিয়ে দেখে একদল লোক, সঙ্গে পুলিশ। শ্যামলীর তিন বছরের ছোট মেয়েটি ছুটে বারান্দায় গিয়ে বলে —"মা ঘরে নি।" খোলা দরজা দিয়ে পুলিশ দেখতে পায় ঘরের মেঝেতে একজন শুয়ে।

শ্যামলী খবর পেয়ে ছুটে আসার আগেই কৃষানকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। নদীর সরু বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে দেখে মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে তখন। পিছু পিছু তার পাঁচ বছরের ছেলেটি কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারিনি। তার ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটো জানতেও পারল না - কে এই লোকটি? কেনই বা তার মা পাগলের মত কাল লোকটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে ঘরে এনে সারারাত ধরে সেবা করেছিল ? তার সাথে মায়ের কি পরিচয়?

পাঁচদিন অজ্ঞাতবাসের পর মুক্তি। আজ হসপিটাল থেকে ছুটি কিষাণের। নিজেই নিজের অভিভাবক। এর মধ্যে কেউ তাকে দেখতেও আসেনি — না প্রিসাইডিং, না সেক্টর অফিসার। ইলেকশন পিরিয়ডের মধ্যে বলেই পুলিশ হসপিটালে ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে। ইলেকশন শেষ। তাই আর প্রয়োজন নেই কিষাণের। লোকাল ট্রেনের ভিড়ের মধ্যেও আজ সে বড়ই একা। নিঃসঙ্গ একাকীত্ব মনের মধ্যে নানান ভাবনার জাল বিস্তার হতে থাকে। ... সেদিনের লোডশেডিং এর সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়তেই নানান প্রশ্ন ভিড় করে মনের মধ্যে। কেমন করে সেই অন্ধকার বুথে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেল? কে তাকে টেনে নিয়ে গেল? কেনই বা নিজের জীবন বাজি রেখে এভাবে বাঁচালো? ওই ভাঙা ঘরটিতে সে কেমন করে গেল? ধুলোমাখা ছোট্ট শিশুটির চোখের নিষ্পাপ ভাষাগুলো যেন ছবির মত ফুটে উঠছে। ... শ্যামলী...মেয়েটির মায়ের নাম? কোন শ্যামলী ? কব্জির আড়ালে ফুলের ছবি ... মনে পড়তেই বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে কিষানের। ইস... সে তো তাকে ফাঁকি দিয়েছিল। চাকরি পাওয়ার পর কোনদিনই যোগাযোগ রাখিনি, খোঁজও নেয় নি। কাপুরুষের মত বাবা মায়ের শাসন, বংশ মর্যাদা, জাতি-ধর্ম, ক্যারিয়ার এবং তমালির রূপে আচ্ছন্ন থেকেছে। কিন্তু শ্যামলী এখানে এল কীভাবে ? এখানেই কি তার বিয়ে হয়েছে? ... যাকে সে ঠকিয়েছে, বেইমানি করেছে শ্যামলী তার উপর প্রতিশোধ নিতেই পারত! ছি: ... বিবেকের দংশনে ছটফট করে কিষাণ। শ্যামলী বাগদী গরিব হতে পারে কিন্তু মানব ধর্মের কাছে সে অনেক বড়।

ট্রেন থেকে নেমে জনজোয়ারে ভাসতে ভাসতে স্টেশনের বাইরে এসে একটি দৃশ্য চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ায় কিষাণ। শহরের জনকলাহলের মধ্যে এক বীভৎস নগ্ন দৃশ্য। রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। বয়ে চলেছে জনস্রোত। তারই মধ্যে থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে আসছে দাড়ি চুলে ভর্তি একটি উলঙ্গ পুরুষ, পাগল। দেখতে দেখতে আবার মিলিয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে বসে দৃশ্যটি মনে পড়তেই গা গুলিয়ে ওঠে কিষাণের। কথা দিয়ে কথা রাখেনি শ্যামলীর সাথে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে কিষাণ।

সো ম না থ ব সু
ডিসচার্জ

আজ ২২শে মে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকার আওয়াজে হাল্কা ঘুমের বিদায় ঘটল।
নার্স এখন বিপি, পিআর চেক করবে।
গুড মর্নিং স্যার। নার্সের সম্ভাষণ।
সিস্টার আজ কি ডিসচার্জ হবে?
হতে পারে। তবে ডক্টর রিপোর্ট দেখবেন তারপর বলবেন.....
সৌভাগ্য আজ পাঁচ দিন হসপিটালে রয়েছে। দুটো মেজর সার্জারি করতে হল। ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট। কলকাতার ডাক্তাররা সন্দেহ করেছিল অ্যাওরটিক ভাল্বের সমস্যা। কিন্তু সঠিকভাবে কিছু না বলার কারণেই সমস্যাটা কতটা জটিল সেটা বুঝতেই বউ-মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে দক্ষিণ ভারতের হসপিটালে।

আবার নার্সের ডাকে সম্বিৎ ফিরল। খালি পেটে ওষুধ খেতে হবে। বেড থেকে নামিয়ে সৌভাগ্যকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। সারাদিন এই চেয়ারে বসে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে করিডরে হাঁটতে হবে। নানা ব্যায়াম করতে হবে। এটাই রোজকার রুটিন। বাড়িতেও এসবই চলবে।

হসপিটাল বয় নিয়ে এল ব্রেক ফাস্ট। সময় ধরে চলছে এদের কাজকর্ম।

ওদিকে মেয়ের নির্দেশ ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে নাও। ওই এখন সৌভাগ্যের গার্জেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হল। একটা ভালো লাগা কাজ করছে হসপিটাল থেকে আজ ছুটি পাওয়া যাবে। সেই তো গেস্ট হাউজ গন্তব্য। বাড়ি যাওয়ার দেরি আছে। ডক্টর পারমিশন দিলে তবে। ডিসচার্জের পর চেক-আপ করতে আসতে হবে। সেটা কতদিন পর হবে সেটা রোগীর শরীরের উপর নির্ভর করছে।

এখন সকাল ৯টা। হসপিটালের প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু হল। খুবই মনোগ্রাহী সে সুরধ্বনি। ডক্টর-নার্স-সেবাকর্মীদের সারাদিনের কর্মচঞ্চল থাকার প্রেরণা শপথ। সৌভাগ্যের মেয়েও এই সঙ্গীত উপভোগ করছে মোবাইলে ডাউনলোড করে নিয়েছে।

একদিকে ডক্টরের ডিসচার্জের ঘোষণা অন্যদিকে হসপিটালের ফাইনাল বিল। সৌভাগ্যের একটা হাল্কা চিন্তা রয়েছে। যদিও হসপিটালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড নিজে রুমে এসে বিলের বিষয়ে সৌভাগ্যকে আস্বস্ত করেছেন। সেটা তো সার্জারির আগে। তবুও একটা অস্বস্তি রয়েছে। কেননা সার্জারির পরদিনই সৌভাগ্যের মেয়ে মিমির কাছে একটা ফোন আসে যা ওকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করেছিল। পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ওকে আস্বস্ত করে ওটা ভুয়ো ফোন। তাই মা-মেয়েও একটু চিন্তিত। হেলথ্ ইনসিওরেন্স থেকে কতটা অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যাবে এটাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখন বেলা একটা প্রায়। লাঞ্চ করে নিয়েছে ওরা। সৌভাগ্যের খাবার হসপিটালের দায়িত্ব। মেয়ে-বউকে আলাদা খাবার অডার করতে হচ্ছে।

হঠাৎ মিমির মোবাইলে মেসেজ ঢোকার শব্দ। তড়িঘড়ি করে মোবাইল দেখল মিমি।

—হসপিটাল যে ফাইনাল বিল ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে পাঠিয়েছে তার কপি।

—বিল তো অনেক। আগের প্যাকেজের থেকে তো বেশি! মিমির মুখ থমথমে।

—চিন্তা করিস না। ড: কার্তিককে জানা।

—কি বলব? "Hospital authorities submitted their final bill"

কয়েক সেকেন্ড পর নিস্তব্ধ ঘরে নিরবতা ভাঙল ড: কার্তিকের রিপ্লাই — Don't worry mimi. I'll talk to Dr. Vinu Gowda.

এই ড: কার্তিক এখন ওদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। চিকিৎসা বিষয়ক সব ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে। ওর পরামর্শেই এই হসপিটালে আসা। ও নিজেও একজন জেনারেল সার্জেন। Dr. Gowda ওর বন্ধু।

সময় এগোচ্ছে সৌভাগ্যের পরিবারের চিন্তার মেঘ জমছে — কি হবে? কত টাকা এখনো দিতে হবে!

মিমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। সৌভাগ্য বলল, আমার মনে হচ্ছে একটা মিরাকল হবে। টেনশন করিস না। সৌভাগ্য নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। আবার বলল, ইনসিওরেন্স থেকে ৪ লাখের একটু বেশি অ্যাপ্রুভাল দেয় এবং দেড় লাখ তো ডিপোজিট করা আছে। তাহলেও বাকিটা দিয়ে দেবো। দেখা যাক না কি হয়!

সৌভাগ্যের কথা শেষ হতে হতেই মিমির মোবাইলে মেল ঢুকল, আমাকে দেখা। ইনসিওরেন্স কোম্পানি ফাইনাল বিলের ক্লারিফিকেশন চেয়েছে।

আবার অপেক্ষা.....

মিমি কোথাও যাবে বলে মনে হচ্ছে। ওর মা বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

—হসপিটালের ইনসিওরেন্স সেকশনে কোন খবর আছে কিনা খোঁজ নিয়ে আসি।

নার্সরা আসছে তাদের ডিউটি করে যাচ্ছে। ফিজিওথেরাপিস্ট এসে সৌভাগ্যকে ব্যায়াম করিয়ে গেল। এগুলো প্রতিদিন বারবার করতে হবে।

দুপুরে একবার এলেন ড: নাগি। সৌভাগ্যের সার্জারি করেছেন। উনি কনফার্ম করলেন আজ ডিসচার্জ হবে। অধীর আগ্রহে ডিসচার্জের জন্য অপেক্ষা, আবার ইনসিওরেন্স

অ্যাপ্রুভাল কি হয় এটা না জানলে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে। দক্ষিণ ব্যাঙ্গালোরের এই অঞ্চলে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। বিকালের চা-স্ন্যাক্স দিয়ে গেল বয়। সৌভাগ্যের সেদিকে মন নেই। তিন জনেই বেশ চিন্তিত। বড্ড অসহায় লাগছে মিমিকে। এ ক'দিন ওর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে। ওর দিকে তাকিয়ে সৌভাগ্য ভাবছে মেয়েটা হঠাৎই বড় হয়ে গেল। এত দায়িত্ব এর আগে তো সামলায় নি। প্রয়োজন হয়নি। সৌভাগ্য ওদের সামলে রেখেছে। এই প্রবাসে সত্যিই আজ ওদের পাশে থাকার মত কেউ নেই! নেই বললে ভুল হবে। মাসির মেয়ে-জামাই সার্জারির দিন ছিল সারাক্ষণ। কিন্তু আজ মনোবল বাড়াবার জন্য কাউকে খুব প্রয়োজন ছিল।

সৌভাগ্য দেখল মিমি সন্ত্রস্ত গলায় কারো সাথে ফোনে কথা বলছে। কাকে ফোন করেছিলি?

—ইনসিওরেন্স অফিসে।

—কি বলল? ওরা হসপিটাল বিল নিয়ে যে কোয়েরি করেছে হসপিটাল রিপ্লাই দেয়নি। সন্ধ্যে ৭.৪৫।

রাতের খাবারও এসে গেল এবার সৌভাগ্যকে বড্ড বেশি উদ্বিগ্ন লাগছে।

—তুমি খেয়ে নাও তোমার তো ওষুধ খেতে হবে। বলতে বলতেই মিমি (দাঁড়াও) একটা মেসেজ এলো। ৭.৪৯ হসপিটাল ফাইনাল বিল কোয়েরি সহ পাঠিয়েছে।

—তাহলে ঘন্টা দুই তো লাগবেই। ইনসিওরেন্স অফিসে এবার একবার ফোন করবি?

—দশ মিনিট পর করি। মিমি উত্তর দিল।

সৌভাগ্য শুনছে মহিলা অফিসারের সাথে খুব অনুনয় করে মিমি বলছে, ম্যাডাম রাত বাড়ছে। হসপিটাল থেকে আমাদের গেস্ট হাউস যেতে এক দেড় ঘন্টা সময় লাগবে। পেশেন্টকে নিয়ে এতটা রাস্তা যাব! একটু তাড়াতাড়ি করবেন প্লিজ।

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল আমাদের তো একটু মিনিমাম টাইম দিতে হবে। চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—রাত ৯টা। মিমির ফোন বেজে উঠল— আপনার ইনসিওরেন্স অ্যাপ্রুভ। মেইল বক্স দেখে মিমি সৌভাগ্য দুজনেই প্রথমে একটু হতচকিত।

ইনসিওরেন্স থেকে পুরো ৫ লাখ টাকাই স্যাঙ্কশন হয়েছে। তিন জনের মুখেই হাসি ফুটল। তোমরা অপেক্ষা করো। আমি অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছি—মিমি বলতে বলতে ফাইল এবং দুটো মোবাইল নিয়ে চলে গেল।

ওর মা বলল এবার সব গুছিয়ে নিই। নাও—সৌভাগ্য সম্মতি দিল। নিজে চেয়ার থেকে উঠে হসপিটালের ড্রেস চেঞ্জ করতে গেলে মিতু বলল, তুমি উঠবে না। ব্যস্ততার কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করবে না একদম। খুব সাবধানে থাকতে হবে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মিতুর ফোন বেজে উঠল। মিতু ফোন রিসিভ করতেই উচ্ছসিত কণ্ঠে মিমি বলল, চিন্তার কিছু নেই। বাবাকে ফোনটা দাও। সৌভাগ্য ফোন ধরেই বলল কত দিতে হবে এখন?—এক টাকাও দিতে হবে না। উল্টে ফেরত পাব সাতাশি হাজার টাকা। ৪/৫ দিনের মধ্যে তোমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা মিতু-সৌভাগ্য দু'জনেরই।

সৌভাগ্য এখন অনেক নিশ্চিন্ত। ওরা দু'জনেই ইনসিওরেন্স কম্পানি এবং ড: কার্তিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। হসপিটালের বিপুল বিল পরিশোধের ব্যাপারে চিন্তা একটা ছিলো। যতটা ইনসিওরেন্স ছিল পুরোটাই পাওয়া যাবে এটা ওরা তিন জনের কেউ আসা করেনি। তবে সৌভাগ্যের মন বলছিল মিরাকল একটা হবে।

মুহূর্তে দরজা ঠেলে দু'জন নার্সের প্রবেশ। সৌভাগ্যকে উদ্দেশ্য করে বলল,'স্যার আপনার ডিসচার্জ হয়ে গেছে।' সৌভাগ্য ডিসচার্জ অর্ডারটা হাতে নিয়ে সই করতে গেলে নার্সদের একজন বলল, 'বাড়ির কেউ সই করুন।' তখনই মিমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মিতু বলল, ঐ তো মেয়ে এসে গেছে। ও সই করবে।

দিন আমাকে। মিমি ডিসচার্জ অর্ডারের কাগজটি নিল। নার্স বললেন, ওটা গেটে দেখাতে হবে। আপনিও রাখতে পারেন কাছে। আমরা সাথে যাচ্ছি।

মিমি মিতুকে বলল, মা সব দেখে নিয়েছ তো। হুইল চেয়ার এসে গেল। সৌভাগ্যকে বসিয়ে দিল অ্যাটেন্ডার। ঘর থেকে বেরিয়ে সৌভাগ্য দেখল নার্সরা ওদের ফটো তোলার জন্য তৈরি হচ্ছে। দু'জন নার্সই সৌভাগ্যের চেয়ারের পাশে দাড়াল। মিমি, মিতুও পাশে দাঁড়িয়েছে। ফটো তোলা শেষ। এবার হুইল চেয়ার এগোলো লিফটের দিকে। সবাই খুব আন্তরিক। লিফট পাঁচতলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছে গেল। বৃষ্টির একটা সোদা গন্ধ নাকে এলো সৌভাগ্যের। একটু ঠান্ডা অনুভব করছে সৌভাগ্য। মেয়েকে ডেকে বলল, ওলা করবি তো? উত্তর এলো বুক হয়ে গেছে। আসছে ৩ মিনিটের মধ্যে। একটু স্বস্তির নি:শ্বাস নিলো সৌভাগ্য। দেখল ব্যাগপত্র নিয়ে মিতু একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাত দশটা বাজে ওয়েটিং রুমে যথেষ্ট ভিড়। সব রোগীর বাড়ির লোকজন। সবাইকে কম-বেশি উদ্বিগ্ন লাগছে।

গাড়ি এসে গেছে। অ্যাটেন্ডেন্ট সৌভাগ্যকে পিছনের সিটে বসিয়ে দিল। মিতু ব্যাগ গুছিয়ে পাশে এসে বসল। মিমি ড্রাইভারের পাশের সিটে। দরজা বন্ধ হল। দারোয়ান বিদায় জানাল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বৃষ্টি ভেজা একচিলতে বাতাস সারাদিনের উৎকণ্ঠাকে নিমেষে গ্রাস করলো।

উ ৎ প লে ন্দু ম ণ্ড ল
আবাদ জীবনের আখ্যান

সুন্দরবনে আদর্শ গ্রাম আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জয়বাংলা হওয়ার আগে সুন্দরবন ছিল গ্রাম। খুলনা ও জশোরের বহু লোক তখন এপারে। যুদ্ধের পরে আমাদের কলুনপাড়ার বাসাবেড়ে সুরেন জয়বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করে, তার কাঁধে বাঁক। পাকা বাঁশের বাঁকে দুপাশে ঝুলানো সংসারের তাবড় জিনিষ, চৈত্রের দুপুরে বউ আর মেয়ে নিয়ে সুরেন বেরিয়েছিল। এসময় ছায়ারা ছোট হয়। সুরেনের মেয়ে আমাদের সঙ্গে খেলত। ওর মা প্রায়শই আমাদের বাড়িতে কাজ করত, সে কারণে মেয়েটিও আমাদের বাড়িতে আসত। ওর ঠাকুমা মাঝে মাঝে আসত মেয়ের খোঁজে। সে বুড়ি আর শশুরের ভিটেতে যেতে পারেনি। আমাদের কলুনপাড়ায় তার ইন্তেকাল হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের লোকরা এসেই নবিন চর দখল করত। আমার ঠাকুরদাও এসেছিল স্বাধীনতার আগে কালিন্দির এপারে। তার হাবডজন ছেলেদের নিয়ে জমিদারের তাড়ায় এপারে এসেছিল। বেশকিছু জমি ওপারে নিয়েছিল কিন্তু রাখতে পারেনি। নদীর বাঁধ রাখতে পারত না কালিন্দির জোয়ারের জল সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বাপ-কাকাদের কথায় আলো হয়ে যেত। এক জনপদ ছেড়ে আর এক জনপদ, সেখানেও শান্তি নেই। সামান্য কিছু জমি মনে হয় ভাগে করত তারপর আবার আবাদের খোঁজে। গোসাবাথানার অন্তর্গত অন্যতম থানা ছিল সন্দেশখালি। এই গ্রাম তখন জঙ্গল আবৃত, আমার ঠাকুরদা ২০০ বিঘে জমি আবাদ করেছিল। দুই খালের মাঝে বিশাল অরণ্য। শান্তিখালের পাসে মাচা করে থাকা। বাবা কাকারা পালা করে আসত -যেত। তখনও মেয়েরা মানে জ্যাঠিমারা আসেনি। মা গল্প করত শান্তিখালের ওপাশে তখন উলুবন। সেজ জ্যাঠা মাঝে মাঝে ঠাকুরদার উপর রাগ করে উলুবনে শুয়ে থাকত, সেই উলুবন এখন নেই। শান্তিখালের সংগে নদীর একসময় ঘোরতর যোগ ছিল। তবে শান্তিখালে মাঝে মাঝে নদীর জল ফোঁস করতো—সংযোগস্থলে প্রায়ই বাঁধ ভেঙে যেত। এখন আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল চর। আমি ছোটবেলায় দেখেছি সারি সারি বান গাছ। তার মাথায় কাকের বাসা। আমরা তুতো ভাইবোনেরা শুকনো চরে বানগাছের মাথায় উঠে কাকের বাসা থেকে ডিম নিয়ে আনতাম। ঠাকুরদা দেখেছিল, তার ২০০ বিঘে জমির মধ্যে ১০০ বিঘে জমি জমিদারের নায়ব টাকা নিয়ে অন্যদের দিয়েছিল। হ্যামিল্টন সাহেব তখন এসে গেছে। সাতজেলের শংকর মোড়লের সংগে সাহেবের গন্ডোগোল। বাধ্য হয়ে সাতজেলে ছাড়তে হ'ল। তারপর আমাদের জমিতে আক্রমণ। ঠাকুরদা তার ছেলেদের শান্তিখালের পাশে বসিয়ে দিয়ে আমাদের পুরাতন বাড়ি পারঘুমটে —অদূরে কালিন্দী, যে ভিটে বাড়িতে একসময় বাবাকাকা থাকত—সেই ভিটেতে চলে এল।

আবাদকৃত জমি ছেড়ে আসার সময় বলে এসেছিল, 'একজায়গায় তো থাকতে পারবি না'। শান্তিখালের পাস দিয়ে সারি সারি বাড়ি করবে। ঠাকুর্দা বেশীদিন বাঁচে নি, সেই ভাদ্রেই ইহজগত ছেড়ে চলে যান।

ছোটবেলায় গল্প শুনেছি আমাদের পাশে যে সদানন্দ সে মোটেই সদাশয় নয়—তাদের সঙ্গে গন্ডোগোল হ'ত। একবার চাষের সময়—লেঠেল নিয়ে এসেছিল। লেঠেলদের ভয়ঙ্কর গল্প বইয়ে পড়েছিলাম। সেই কথা আমার মা উক্ষন কথার মতো করে আমাদের বলত। কিন্তু বাপ-কাকাদের সঙ্গে পারবে কেন—আমাদের দাদারা তখন নিতান্তই বালক। মা-জ্যেঠিমাদের কাছে শুনতাম—আবাদ করার সময়ের গল্প। আমার মা বলত, 'তোর বাপ-কাকারা-যখন বনের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত তখন দু-পাশের গাছ দুহাত দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যেত, তারপর আবার বন মিশে যেত।' তখনই বুকের মধ্যে সাৎ করে উঠত—যদি কিছু হয়ে যায়। শোনা যায় শান্তিখালের ওপারে কুমিররা নাকি শুয়ে থাকত। বাঘ যে একেবারে ছিল না তা তো নয়। ঠাকুমা বলত, 'আচাল বাদা—তোর ঠাকুরদা আগে আগে যেত, খুব সাহসী লোক ছিল। তেমনি কাজ করতে পারত। তোর মা খুব ভয় পেত— একহাত ঘোমটা দিয়ে তোর ঠাকুরদাকে ভাত দিচ্ছে। 'রাগী লোক,' রান্নাঘরে আমি ব'লে—তোর মাকে পাঠিয়েছি। তোর মা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কলাইকরা থালা পায়ের উপর তুলে দিচ্ছে। ম্যাজবউ কোথা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।" বেঁটে কালো লোকটা, বাইসেফ, ট্রাইসেফ নিয়ে কতো কতো জায়গা আবাদ করেছিল। আসলে বন প্রেমিক। এখনকার মতো জমি—হাঙর কি? সবে ভাঙন হচ্ছে। বাংলাদেশের পুরানো বাড়িতে আমার ছোট ঠাকুরদা একবার গিয়েছিল। আমাদের জায়গায় মুসলমানরা বসে আছে। ভাগ্যিস ঠাকুরদা এসব দেখে যেতে পারেনি।

আমি কোনওদিন বাংলাদেশে যাইনি। বাংলাদেশের পাশে মামার বাড়ি অদূরে ঠাকুর্দার বাড়ি। আমার বাবা কিংবা মা কোনও দিন আমাকে ঠাকুর্দার বাড়িতে নিয়ে যায়নি। কেন জানি না। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় আমার যুবক মা ও বাবা-তাদের ঘরকন্যার সংসার হয়তো দেখতে চায়নি। মামার বাড়ির অদূরে গোবিন্দকাটী স্কুল—ওখানে আমার দাদারা পড়ত। এক দাদা কুমীরমারিতে পড়তে গিয়ে রসগোল্লার প্রেমে পড়েছিল, সে সময় এগারো টাকার ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিক্সনারি বেচে রসগোল্লা খেয়েছিল, রসগোল্লা রহস্যর থেকেও বেশী লেগেছিল বাবার পুরনো ভিটের প্রতি অনাগ্রহ।

বাংলাদেশের পাড়ে চাড়ালখালি, সেখানকার স্কুলে লাইফসাইন্সের একটা পোস্ট খালি জেনে চলে গিয়েছিলাম বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে। হাসনাবাদে লঞ্চ বন্ধ মনে হয়, স্থলপথে গিয়েছিলাম—নদী পেরিয়ে সম্পন্ন গ্রাম। কায়েত বামুন নয়—সবই প্রায় দলিতবাসী, আমি অন্ত্যেবাসী চলেছি। ওষুধু খাব ব'লে এক টেপাকলের সামনে দাঁড়িয়ে। তিন চাকার ভ্যান রিক্সা দঁড়িয়ে—কয়েকজন যুবতী কল ছেড়ে দেয়। আমি তখনকার দিনে ব্যাথার ওষুধ ক্যালসিমপিরিন খেয়ে নিই। ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, তার মধ্য দিয়ে ২২/২৩ বছরের যুবক যাচ্ছে চাকরি খুঁজতে। ভান্ডারখালি পার হতেই নতুন দ্বীপ, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—গাঙভেড়ীতে পা দিয়েছি। কয়েক পা এগোতেই প্রশ্ন বাংলাদেশ যাবে? এরকম প্রশ্নবানে আমার অস্বস্তি, বাংলাদেশী বললে আবার বি এস এফ'র কাছে দিয়ে দেবে না তো। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত। জিগ্যেস করতে করতে মুখ ব্যথা। সবাই প্রায় সন্দেহের চোখে দেখে—এসময় দু-মুখো সময়। মানুষের খুব অভাব থাকত, আশি সালের পর আর সেভাবে অভাব ছিল না। জলে তখন টাকা মানে বাগদার মিন তুললেই টাকা। এসময় এতটাই টাকা পেত—যারা জমিজমার মালিক তারা জনমজুর পেত না। সেই যে ডাবুন অঞ্চলের লোকরা চাকরি বাকরি খুঁজতে লাগল, সেই খোঁজা এখনও চলছে। অনেক কষ্টে মাস্টারমশায়ের বাড়িতে পৌঁছালাম। তিনি হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে—পরিচয় দিলাম ওনার ভাই পাঠিয়েছে—টেলিফোনের প্রশ্ন নেই। চিঠিও নেই, তবু খুব আপ্যয়ন। আবার ভোর রাতের লঞ্চে হাসনাবাদ। পরে একবার গিয়েছিলাম, তখন ওখান থেকে হেঁটে পারঘুমটি (আমার মামার বাড়ি) তখন মনে হয় বর্ষাকাল। কাকার বড়পুকুর থেকে পা ধুতে নিয়ে গিয়েছিল আমার বড় এক দাদা, সেই বর্ষায় এক হরিতকী গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে আমাকে বলেছিল 'তোর বাবার হাতে পোতা গাছ। এখানে তোর বাবার ঘর ছিল।' আমি সেই বর্ষায় দেখেছিলাম - আমার কিশোরী মায়ের ঘরকন্নার তিজেলপাতি। কাকা আর মা এরা মনে হয় সমবয়সী। খেলার সাথী, আমার এই কাকাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, তার তখন গলায় ক্যান্সার। আধো অন্ধকারে কাকাকে আমি ভাল ক'রে দেখতে পারছি না। লম্বা ভাতখাগো বারান্দায় আমরা বসে খাচ্ছি। কাকিমা শেষ পাতে মনে হয় কিছু দিতে যাচ্ছিল, দেখলাম কাকা তার বরাদ্দ—দুধ, তা বৌদি ন'বৌর ছেলেকে দিতে বলল। আমি ভাবছিলাম যে কাকাকে আমি দেখিনি—কাকার গল্প শুনেছি মাত্র।

আমাদের ঠাকুমা মানে কাকার মা, তার কোলে বসে গল্প করেছি। মাকে বলেছে, 'তোর সেই ছোট ছেলেটা তোর শ্বশুরের মতো বড্ড রাগ।' সেই ঠাকুমা কাকা বাবাদের উপর রাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছিল—মা তার এই সৎশাশুড়ীকে খুব ভাল বাসতো। আমার দিদিমা তার দীর্ঘায়ত দেহ নিয়ে আমার সংগে যখন গল্প করতো, পানের বাটা থেকে চুন চাইত, তাঁর কর্কশ গলায় কী সব গল্প করত, তার অর্ধেকটা বুঝতাম না— কিন্তু তার ফর্সা বুকে মুখ রেখে আমার অনেক দুঃখ আমাদের বড় পুকুরে ভাসিয়ে দিতে পারতাম।

কাকার কথায় আসি—কাকা তখন মৃত্যুশয্যায়, কি কারণে—হ্যাঁ ওই স্কুলের জন্য আবার গিয়েছিলাম, কিন্তু সামনে একটা ইন্টারভিউ সে কারণে তাড়াতাড়ি নটবরের ঘাটে এসেছিলাম। তখন একটাই লঞ্চ ছেড়ে গেলে রায়মঙ্গলের খুদের খেয়া পার হয়ে কুমীরমারী হয়ে পালমারি খেয়া পেরিয়ে ছোটো মোল্লাখালী বাজার পেরিয়ে আবার মাঠ ঘাট পেরিয়ে পেতমের খেয়া পেরিয়ে—আমাদের উত্তরপাড়া থেকে দক্ষিণপাড়ায় গিয়ে আমাদের বাড়ি।

বাবার সংগে ছোটবেলায় যখন এই দ্বীপে এসেছিলাম—তখন নটবরের ঘাটে কোনও দোকান ছিল না। একটাই দোকান। পান বিড়ির। একটা কাঁচের বয়ামে তখন-কার দিনের ক্যাপস্টান সিগারেট। আমি বললাম, 'সেঁতিয়ে যায়নি তো'? দোকানীর উত্তর, ঐ জন্য কাঁচের মধ্যি রাখিছি। ইতিমধ্যে লঞ্চ এসে গেছে। এম ভি রাঙামাটি —আমাদের ক্যানিং লাইনের বাসন্তী বোটের মতো। আমার ভয় লাগছিল, এতবড় নদী, সামনের দিকে তাকালে কুল দেখতে পাওয়া যায় না। রায়মঙ্গল, ডানদিকে কলাগাছি। এখানে একবার বাবা-কাকাদের নৌকাডুবি হয়েছিল। তার পাশেই এক দাড়িওলার নৌকা। জলের মধ্যে দাড়ি

নিয়ে ভাসছে। ডুবন্ত সবাই সবাইকে মনে হয় বাঁচতে চায়। অবশ্য তখন দেশভাগ হয়নি। আর আমার জ্যাঠিমা আর মা গরু বাছুর সমেত রহমান গাজীর নৌকায় করে নতুন আবাদি গ্রামে চলে আসার পর আর থাকতে পারে নি। তখন গ্রামে প্রতিবেশী কম। ঠাকুর্দার বাড়ির এপারে ছিল রহমানগাজী। এখন সেই খাল সংস্কার হয়েছে। পাশ দিয়ে চলে গেছে কলকাতার মতো রাস্তা। কলকাতা থেকে দিদিমনিরা আসছে। কুড়েখালী বাবাদের কাছে। হেমনগরে এখন বাজার বসে গেছে। এখানকার ওষুধের দোকানে সবই পাওয়া যায়।

লঞ্চে উঠে গিয়ে বেশ নায়ক উত্তমকুমারের মতো সারেঙ-এর ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে, সারেঙের আর সেই তেজ নেই। ভটভটি চালু হয়ে গেছে। এই রায়মঙ্গলের ভয়ে ভটভটি একটু ভয় পায়। সারেঙ লোকটা শুঁটকে মতো। কয়েকবছর আগেও হয়তো খালাশির কাজ করত। নোনা হাওয়া চারপাশে। দেশলাই চেয়ে নিয়ে দেখছি, হাওয়ার তোড়ে সিগারেট আর ধরাতে পারছি না। লোকটা হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে আড় চোখে তাকায়। অবশেষে ধোঁয়া গিলে তাকে সিগারেট ফেরৎ দিই। রায়মঙ্গল পাড়ি দিচ্ছে, বাঁদিকে গেলে শুকদেবের ঘাট—ঐ দিকে ছোটমাসি থাকে। মা-মামাদের ছোট বোন। ক্লাস ফাইভে পড়তেই বিয়ে দেয়। দাদামশাই আনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তার পরে পরেই ছোট দাদামশাই মারা যান। স্বাভাবিক নয়। আমার দিদা—আমার ছোট দিদা বলত, 'তোর বড় দাদু মারা যেতে ছোট দাদু আর থাকতে পারল না। তোর মামারা সব ছোট। সবার পড়ালেখা বন্ধ। বিজয়, বসন্ত লোকের বাড়ি কাজকাম করত, এর মধ্যে তোর মেজ মামা আমিন শিখে এসে এখান ওখানে জমি মাপতে যেত।' মামার সেই আমিনের বই দেখতাম, আমাদের বাড়িতে একবার এসেছিল।

বাড়ি ফিরতেই আমার এক দাদা খুব গালাগালি করে। ছোট কাকা অসুস্থ তুই দেখা করে এলি না। আমি বুঝতে পারি না। আমাদের এবাড়ি থেকে মহেন্দ্রদাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহেন্দ্রদা ওগুলো ভাল করতে পারে। আমার বুদ্ধিজ্ঞান হয়ে দেখছি—মেজজ্যাঠারা পাশে নুতন বাড়ি করেছিল। কী সুন্দর নতুন বাড়ি। নতুন পুকুর, মার সঙ্গে গেলে বৌদি কী সুন্দর চালভাজা খেতে দিত। বৌদি তখন কথা বলত না। একদিন ভোরবেলা উঠে ছ'ড়া দিতে গিয়ে কী সব দেখে ভয় পেয়েছিল। মহেন্দ্রদা ভয়ংকর তোতলা। দাদার বড় ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। মহেন্দ্রদা তখন আমাদের কলুনপাড়ায় পড়ে থাকত। নন্দ নাপিতের নামসংকীর্তনের দলে প্রধান দোহারকি। মহেন্দ্রদা গান করার সময় তোতলায় না। গন্ডোগোলের সুত্রপাত ওখান থেকেই। বাপ-কাকাদের মান-সম্মান জলে যাচ্ছে। আমাদের পিতা-পিতামহ কেউই গানবাজনা করত না। নন্দদা লম্বা দীর্ঘদেহী। ওর মা আমাদের বাপ-কাকাদের ক্ষৌরকর্ম করে বেড়াত, তারপর বড় কিছু হয়ে গেলে নন্দদাই সামলাত। এরা সবাই ওপার থেকে এসেছিল। নতুনগ্রামে নাপিত নেই, সে কারণে আশ্রয় দিয়েছিল। দেখাদেখি নন্দদার অন্যান্য ভাই, দাদারাও চলে এসেছিল। নন্দদাকে দেখেই আমারা ছোটবেলায় একটা শ্লোক বলতাম—

নন্দ নাপিত দাড়ি কাটে দাড়িতে থাকে চুল
পচা ঠাকুর মন্ত্র পড়ে অর্ধেক বলে ভুল।

এই নতুন গ্রামে পুজো করার ঠাকুরও আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিল। আমার পাগলী জ্যাঠিমা বলত, 'হলো ঠাকুরের ছেলেদের ডাক। আমার জ্যাঠিমা পাগল নয়, বড্ড সধাসিধে। কোনোদিন ঝগড়া করতে দেখিনি, একবারে প্রতিমার মতো দেখতে। আমার জ্যাঠামশাই রীতিমতো পণ দিয়ে বিয়ে করেছিল। সেই জ্যাঠিমা শোকে-তাপে কীরকম হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এক দিদি বাচ্ছা প্রসব করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল, সম্ভতঃ ধনুস্টঙ্কার। মারাও গিয়েছিল দশমীর দিন। সে কারণে পুজোর সময় কখনও পুজো দেখতে যেত না। তার আর এক কন্যাকে বিয়ে দেয়েছিল—দোজ-বরের সঙ্গে। আর এক মেয়ে, বিয়ের পরে আর টিকতে পারেনি। সটান বাড়ী এসেছিল, কিন্তু কিছুদিন বোবা হয়েছিল। মেজজ্যাঠা কী সব ওষুধ দিয়ে আবার ঠিক করেছিল। হয়তোবা সে কারণে—আমাদের ছোটদের সামনে প্রায়ই জ্যাঠামশাই জেঠিমাকে বলত—'এ পাগলের জাত বলে কি?' এটাই আমাদের রিংটোন হয়ে গেল। হয়তো জ্যোঠিমা কোনও শরিকশারাকে যাচ্ছে, আমরা চারদিকে দেখে নিতাম, তারপর বলতাম 'এ পাগলের জাত বলে কি'? হাসত। আজও মনে পড়লে চোখে জল আসে। ছিল? এই জ্যাঠিমাকে দেখেছি—পুকুর তলায় বাসন মাজছে। বড় ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে বলে—(পাশেই থাকত ছাইয়ের গাদা), জ্যেঠিমা মনে হয় সে কারণে একটা কুড়ে থালার উপুড় করে বসেছিল, পরে দেখা গেল, সেই থালা মধ্যে একটা ঘরচিটো সাপ। ব্যস জ্যেঠিমা মনে করে তাকে সাপে কামড়েছে। আমরা ছুটতাম রামাদাকে ডাকতে, আমার সেজো জ্যাঠামশাই বড়ো গুনিন—তার কাছে

যাবে না। আমরা বলতাম, চলো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি', সে যাবে না। বাধ্য হয়ে রামাদা হাসত। কী মন্ত্র বলত কি জানি জ্যাঠামশাই যাতে না যায়, সে কারণে রান্নাঘরে না ঢেঁকি ঘরে বসে ঝাড়ান কাড়ান করতো। আমরা সেই সব মন্ত্র শুনতাম। পরে খেলার সময় এ মন্ত্রই আওড়াতাম। বিশেষ করে গোধুলিমদির সন্ধ্যায়।

সহদেব বড়দাকে আমাদের দারুণ লাগত। কারণ বড়দের মতো ভণিতা নেই। আপনজগতের লোক। লোকটা হয়তো কবি হতে পারত। না হলে এই গরমে, চোতবোশেখের গরমে সূর্যের নীচে কী করে থাকে। ওর ছোটছেলে দীন মেজ-জ্যাঠামশাই-এর বাড়ীতে পেটভাতায় থাকে। গায়ে প্রচন্ড জোর, আমি ওর সঙ্গে পারতাম না। যা হোক সহদেব বড়দা আমাদের ইটখোলা থেকে ইট বইত। দুপুরবেলা ভাত খাওয়া হয়ে গেলে মা'র কাজ করে দিত। এঁটো তোলা। বারান্দা পরিস্কার করে নিজেই এক পোঁচ মেরে দিত। ঠিক সেই সময় আমার মেজ-জ্যাঠিমা এসে বক বক করত। আমরা বলতাম, 'পাগলে পাগলে কথা হচ্ছে। বাপকাকারাও সহদেবদাকে পাগল বলতো। আসলে রোদ, বৃষ্টি, অভাব এসবে মানুষকে পাগল বানিয়ে দিত। একফসলী জমি—একবার ফসল না ফললে নেমে আসত অভাব। সেই অভাব কাটাতে দু'বছর লাগত।

সহদেব বড়দার ছোটছেলে দীন আমাদের পরে পরেই বড় হচ্ছিল। ওর দাদা রণজিৎ সঙে স্বভাবিক কাজকাম করত। কিন্তু দীনবন্ধু আধপাগলা মতো হয়ে গেল। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসত। ছোটমোল্লাখালী, সাতজেলে হাটে ভটভটি আসার আগে আমাদের বাড়ির সব্জি ও বয়ে বয়ে নিয়ে যেত। পয়সা কড়ি লাগত না। কিন্তু বিয়ে করার খুব সখ ছিল। একদিন কলুনপাড়ায় সীতাকে গিয়ে বলে, 'তোমার তো অনেক ক'টা মেয়ে, আমার একটা দাও না।' না দীন-র বিয়ে হয়নি। কিন্তু গতরপড়া নাম তার ঘোচেনি। মাঝে মাঝে সে আমার বাসাবাড়িতে আসত। গ্রামের বাড়ি থেকে আম-কাঁঠাল নিয়ে আসত। আমার মনে হয় সে দেশ দেখতে ভালবাসত। একবার রাতে এসে দেখি আমার খাটে সে বসে। হাঁটু অবদি প্যান্ট তোলা। সারা গায়ে চর্ম রোগ, শুনেছি সে অর্ধেক দিন চান করে না। গায়ে বোটকা গন্ধ। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'কাকা ভাল আছ'? ওর গলা ছিল মিহি, মেয়েদের মতো। হাতে আমার কন্যার দেওয়া—'হজমোলা' খুকি একটা কী ওষুধ দিল। তাই হাতে করে ধুরে রখেছি। সেই দীনবন্ধু আয়লা গায়লাতে মরেনি। রেশনে সে এতটাই চাল পায় যে জমে যায় বেশ বেশী। খায় কম। এখনও সে অর্ধেক দিন খায় না। কাজ করতে বললে বলে, 'আমি কাজ করব? আমার চাল তাই উইপোকায় খেয়ে যাচ্ছে'।

সত্যিই তাই আধাবাউন্ডুলে দীনবন্ধু চাল জমায়। ওর বাবা আকাশ দেখত—ও নদীর পাশে বসে থাকে। ওর বাপ ঠাকুরদার ভিটে নদীতে। ওর বাড়ির সামনে ওপারে বিশাল বন। মনে আছে সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে ঠাকুরদা দিগম্বর মোড়ল, বাবা আর আমি আমাদের পূর্বের ঘেরের চর থেকে এক নৌকা ভর্তি গাছের ডালপালা কেটে এনেছিলাম। আমি দাঁড়ে বসেছিলাম। ঠিক সেই সময় পিটেল পুলিসের নৌকা দেখে, আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

বাবা আর মামা নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করে। এই বন ছিল তাদের, তারাই আবাদ করেছিল এই আবাদ ভূমি, নদীর চর পড়লে সেখানে ছোট ছোট বান গাছের চারা হয়। প্রকৃতিই এর নির্মাতা। কিন্তু এত ঘন হয় যে মাঝখান থেকে কিছু তুলে না দিলে বন বাড়ে না। আর বাড়লে ডালপালা কেটেনা দিলে গাছ উঁচু হয় না।

পিটেল পুলিসের কাজ তখন অবদি ছিল—চুরি করে যারা বন করত তাদের ধরা। আটক করা। পরে পুলিস পয়সা দিলে ছেড়ে দিত। বন পুলিসদের লঞ্চও ছিল। ১৯৭৩— ১৯৭৪ নাগাদ দেখেছি।ছোটমোল্লাখালী হাটে বাবার সঙ্গে লঞ্চে করে মামার বাড়ি যাব, সে সময় লঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি,পাশ দেয়ে হালসে নৌকা যাচ্ছে। বাংলাদেশের এপার থেকে নৌকা করে লোক আসছে সাপ্তাহিক বাজার সারতে।

আমার সামনে দিয়ে একটা হালসে নৌকা যাচ্ছিল। একেবারে নিরীহভাবে দাঁড় বেয়ে যাচ্ছিল—লঞ্চের সারেঙ্ নীচে খাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে লঞ্চ স্টার্ট দিল। পাশ দিয়ে যাওয়া নৌকাটা ধরে ফেলল। নৌকার পেটে খালি টিন। তার নীচে মধুভান্ড।

আমাদের ভুবন গ্রামে কে পাগল নয় ? তখন গ্রামের অবস্থা ভাল না। অশ্বিন কার্তিক মাস ছিল দু-মুখো সময়। কলুনপাড়ায় এ সময় আটা ঘাঁটা খেত, মাঝে মাঝে মাইলো ভাজা এর মাঝে জয়বাংলা হতে শুরু করল। চোখের রোগ। আমাদের ক্লাসে প্রথম হয়ছিল কুমুদ। সার ভাটার সময় চরের শুকনো মাটি দিয়ে মেডেল বানাত। এই সময় যে জয়বাংলার

লোকরা আসতে শুরু করে। আমাদের স্কুলের ক্লাস ঘরে তাদের অধিষ্ঠান। তখনও দেশভাগ, আবার করে নতুন রাষ্ট্র, এসব বুঝিনি; বাবা কাকারা বলত, 'পাকিস্তানের দল'। কিন্তু চোখ লাল হওয়া ভীষণ চুলকানি কিছুই আর দেখতে না পাওয়া—সেই যন্ত্রণার কথা এখনও মনে আছে। তখন থার্ড জেনারেশন আন্টিবায়োটিক আসেনি। পোকা মারার ওষুধ বলতে গ্যামাক্সিন পাউডার, উচ্চফলনশীল ধান আসবে বছর দু'য়েক পরে। শীতকাললীন শাকসব্জি তখন বাগানে পড়ে আছে। যেগুলো আর গৃহস্থেরা খায় না। সেই সব্জি। তাই ছোটমোল্লাখালী হাটে নিয়ে গেলে বিক্রি হয়ে যেত।

আমাদের স্কুলের পাশে ছিল—ধানভাঙানো মেসিনের পরিত্যক্ত কঙ্কাল, মেসিনটা মনে হয় রইসঁখার। সম্পন্ন চাষী। জমিদারের নায়েবের সংগে মামলা করার মতো সাহস রাখত। দেশভাগ, হিন্দুমুসলমান আমাদের মধ্যে এমনকি আমার বাপ-কাকাদের মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য দেখিনি। রঈসখাঁর অনেক ক'টা ছেলে মেয়ে। ছেলেরা অনেকে চলে গিয়েছিল - কিন্তু রঈসখাঁ যায়নি। আমাদের বাড়িতে রঈসখাঁর খুব সমাদার ছিল। সে এলেই আমাদের দলিজ ঘরে বসত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জল আনতাম। বিড়ি আনতাম। তাকে কোনওদিন পানি বলতে দেখিনি। তার বিশাল নৌকা। তাতে ধান ভর্তি করে চালান দিত। এক পয়সা না দিয়ে সে ধান নিয়ে যেত। তারপর পক্ষকাল পরে টাকা দিতে আসত। সবচেয়ে ভাল লাগত উমাচরণ কর্মকারের কাঁটায় ধান ওজন করার সময়, একমুঠো ধান বিশমিল্লা বলে আকাশের দিকে উড়িয়ে দিত।

জয়বাংলা হওয়ার সময়ও আমার বন্ধু মোজাম, নুরুল এদের মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য দেখিনি। অবশ্য তখন বোঝার সময়ও নয়। তবে শচীন স্যারের ভাই যখন তাদের খুলনার বাড়ি থেকে যুদ্ধের ভয়ে এখানে চলে এসেছিল, তখন নতুন সহপাঠীর জন্য আনন্দই হয়েছিল। ওর নাম ছিল পঙ্কজ। রেডিওতে তখন পঙ্কজ মল্লিক রবীন্দ্রসংগীত শোনাতেন। আমরা বলতাম পঙ্কজ মল্লিক। পঙ্কজ খুব লাজুক হাসি হেসে গান করত। ও আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কোথায় যেন একটা বিষাদ ছিল, আমরা ধরতে পারিনি।

তা প স কো লে

পেঁজা মেঘ ভেসে যায়

গড়িয়াতে অর্পণের একটা বাড়ির পরের বাড়িটা হলো বাপিদার। উনি অর্পণের মাসতুতো দাদা। নিজের মাসতুতো দাদা নয়, কিন্তু সেই ছাত্রজীবন থেকে ওদের দাদা-ভায়ের সম্পর্কটা খুব গভীর। ওদের পরিচিত মহল বা ওদের বাড়ি ও আত্মীয় এটা সবাই জানে। বাপিদার পছন্দ করা জমি কিনে সেই জমিতে ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করেছে। অর্পণের বাপিদা এখন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওনার স্ত্রীও স্কুলের শিক্ষিকা। অর্পণের বাবা, কাকুও স্কুলের শিক্ষকতা করেন। অন্য তিন কাকু সরকারী কর্মী, একমাত্র পিসিমণিও শিক্ষিকা। অর্পণ সপ্তাহের শেষ, কখনও দুসপ্তাহের শেষে গ্রামের বাড়িতে যায়। গ্রামে ওদের একান্নবর্তি পরিবার। আঠারো জনের সদস্য। হুগলী জেলার কামারপুকুরের কাছে রঘুবাটী নামে গ্রামে বাড়ি।

অর্পণ যাদবপুর থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং করার পর নিউটাউনে এক বিদেশি নামি সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকরি করে। অর্পণ আজ অফিস থেকে বের হয়ে ভাবলো নির্মল্যর সাথে দেখা করবে। দুই বন্ধুতে মিলে অনেকক্ষণ আড্ডা দেবে। নির্মাল্যর বাড়ি ভবানীপুরে। ওদের আরো কলেজের বন্ধুরা মাঝে মাঝে কখনও যাদবপুর বা অন্য কোথাও আড্ডায় মিলিত হয়। সেই যে কলেজ ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়েছে। আজও চলছে আড্ডা।

অর্পণ অফিস ছুটির পরে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছে যাদবপুরগামী বাসের জন্য। বাস আসতেই প্রায় সবাই অফিস ফেরত যাত্রী—তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠতে লাগলো, শেষে অর্পণ উঠলো। বাস ছাড়তে যাবে এমন সময় একটি মেয়ে হুড়মুড় করে ভিড় বাস থেকে নামতে নামতে ধাক্কা দিয়ে নেমে গেলো। হালকা আওয়াজ এলো 'sorry'। যাদবপুর এইট বি বাস স্ট্যান্ডে নির্মাল্য অপেক্ষা করছে অর্পণের জন্য। অর্পণ পৌঁছে চা-এ চুমুক দিচ্ছে, ওদের দু'জনকে বললো—"আগামী রবিবার পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখার তিনটি টিকিট পেয়েছি। চল তিনজনই যাই"। অর্পণ জানালো, টিকিট তিনটি ওর মামা দিয়েছে। মামার অফিসের ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটি শো এর সব টিকিট নিয়েছে।

পরের দিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় অর্পণ দেখলো বাস স্ট্যান্ডে আবার সেই মেয়েটি যে গতকাল ধাক্কা তাকে মেরে বাস থেকে কোনো কারণে নেমে গিয়েছিল। ওর অফিস-যাত্রী মনে হলো, কোনো অফিসে জয়েন করেছে হয়তো। মেয়েটির সাথে অর্পণের চোখাচোখি হতেই মেয়েটি চোখ সরিয়ে নিলো। অর্পণ ভেবেছিল, গতকালের জন্য একটু হেসে sorry বলবে। কিন্তু না, সে রকম কোনো ভাবভঙ্গি দেখা গেলো না। অর্পণ তো কোনো অপরিচিত মেয়ের সাথে নিজে আগবাড়িয়ে কথা বলে না। অফিস থেকে ফেরার পথে অর্পণ পর পর কদিনই মেয়েটিকে বাস স্ট্যান্ডে দেখলো।

অর্পণরা তিন বন্ধু যথারীতি রবিবার মহাজাতি সদনে পি সি সরকারের ম্যাজিক শো দেখার জন্য পৌঁছে গেলো। ম্যাজিক শো শুরু হওয়ার আগে অর্পণ হলের মধ্যে মামা, মামিমা ও মামাতো ভাইবোনের সাথে দেখা করে কথা বলছে হলের কোথায় তিন বন্ধু বসেছে মামাদের দেখলো। ম্যাজিক শোর হাফ টাইম অর্পণরা হলের বাইরে চা খেতে গেলো। এমন সময় অর্পণ দেখলো নিউটাউনে বাস স্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষামান সেই মেয়েটি। সঙ্গে ওর চেয়ে বয়সে একটু বড়ো মেয়ে ও ওরই বয়সী এক ছেলে। অর্পণের মুখোমুখি হতেই বিস্ময় চোখে পরস্পরের হাসি। অর্পণ বলল "ম্যাজিক শো দেখতে?" স্বাভাবিকভাবেই উত্তর এলো—"হ্যাঁ। আপনিও কি শো দেখতে"? অর্পণ—"হ্যাঁ"। চা খেয়ে উভয়ই পরস্পরের দিকে ঘাড় নেড়ে হলে ঢুকে গেলো।

পরের দিন অর্পণ যথারীতি সোমবারের অফিস। বাড়ি ফেরার পথে বাস স্ট্যান্ডে ওই মেয়েটির সাথে দেখা হলো না। অর্পণ একটু হতাশ হলো, দেখা হলে অর্পণের একটু ভালো লাগতো। সেদিনই অর্পণ অফিস থেকে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে বাড়িতে কম্পিউটার খুলে সফটয়্যার নিয়ে চর্চাতে ব্যস্ত এমন সময় মামাতো বোনের ফোন। গতকালের ম্যাজিক শো নিয়ে কথা বলার ফাঁকে অর্পণকে বোনের জিজ্ঞাসা—"তুমি সৌমিতাকে চেনো"?

'কাকে'?

"তুমি ম্যাজিক শোর হাফ টাইম চা খেতে খেতে কথা বলছিলে যে মেয়েটির সাথে"।

"ওর নাম জানি না, তবে মুখ চেনা, অফিস থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে বাস স্ট্যান্ডে দেখা হয়"।

"ও-তো বাবার বন্ধুর মেয়ে"।

"ও তাই"।

এরপর একমাস হয়ে গেল অর্পণের সাথে সৌমিতার দেখা হচ্ছে না। অর্পণের মনে প্রশ্ন জাগে - "ও কি অফিস চেঞ্জ করেছে? না অন্য কোনো কারণে অফিস আসছে না"। অর্পণ ঠিক করলো আজ ওকে ফোন করবে। ফোনে জানলো ওর অফিসের টাইম চেঞ্জ হয়েছে, আধ ঘন্টা পরে অফিস থেকে বার হচ্ছে। অর্পণকে বললো সে যদি একটু বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ায় তাহলে দেখা হবে। অর্পণ তাই একটু দেরি করে অফিস থেকে বার হলো। বাস স্ট্যান্ডে দেখা হতেই সৌমিতার বাস চলে এলো। নিজেই বললো পরের বাসে যাবে। অর্পণও সে কথাই বলতে যাচ্ছিল। সৌমিতা জিজ্ঞাসা করলো সে এ সপ্তাহে গ্রামের বাড়ি যাবে কিনা। না, অর্পণ যাবে না। এমন সময় ফুচকাওয়ালাকে দেখে অর্পণ বললো, চলো ফুচকা খাওয়া যাক। দু'জনে ফুচকা খেতে খেতে নানা গল্প করল।

প্রায় এক সপ্তাহের পর আবার অর্পণের সাথে মেয়েটির দেখা। আমাকে দেখা মাত্র দ্রুত কাছে এসে আর্পনকে বললো, "এখন আপনার নাম পরিচয় সব জানি"।

—"সব জেনে গেছেন?"

—"আমাকে আপনি করে সম্বোধন করবেন না"।

—"তাহলে পরস্পর পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করতে হয়"।

—"হ্যাঁ তাই হোক"।

দুজনেই জেনে গেলো কার কোন অফিস। দেওয়া নেওয়া হলো। ঠিক তার পরের দিন অর্পণের কাছে অফিস টাইম সৌমিতার ফোন এলো। —"আজ অফিসের পরে তোমার মামাবাড়ি যাচ্ছি, তুমিও চলে এসে"।

—"আমি এখনই বলতে পারছি না, বাড়িতে একটু কাজ আছে, আমি গড়িয়ার বাড়িতে একাই থাকি"।

—"জানি, এও জানি তুমি মাসে দুবার গ্রামের বাড়ি যাও"।

অর্পণের মামাতো ভাইবোনের কাছে জেনেছে সৌমিতা। সেদিন থেকেই অর্পণ একটু আনমনা হয়ে যায়। তার মনের মধ্যে এক অজানা অনুভূতি ঘোরা ফেরা করছে।

সেদিন সৌমিতা অফিস থেকে টিভি দেখতে দেখতে অর্পণের কথা ভাবছে। ওই লম্বা ছিপছিপে ছেলেটি এখন কি কারও প্রেমে পড়েনি? ওর মনের মধ্যে অর্পণ কি জায়গা করে নিচ্ছে? হ্যাঁ সৌমিতার অর্পণের কথা ভাবছে, ওর ভালো লেগে গেছে অর্পণকে। কয়েকদিন পর আবার বাস স্ট্যান্ডে দেখা দুজনের। সেদিন সৌমিতার প্রস্তাবে দুজনে নিউমার্কেট এক নামি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলো। খাওয়া খরচ সৌমিতা দেবে, কারণ অফিসে তার প্রমোশন হয়েছে। খাওয়া শেষে সৌমিতা সারপ্রাইজ টা জানালো। বাড়ি ফিরে অর্পণ ম্যাসেজ করে বললো যে—তার যেন প্রতি মাসে প্রমোশন হয়, তাহলে একটা করে ফিস্ট পাওয়া যাবে। সেদিন সৌমিতা খুব আনন্দ পেয়েছিল।

কদিন হলো অর্পণের মন বড়ো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কথা বলার জন্য। অর্পণের খাওয়া দাওয়া তে মন নেই, খেতে চাইলেও খেতে পারছে না। রান্নার মাসি সকালে এসে দেখে ফ্রিজে যা সকালে রেখে গেছে, সবটাই আছে। মাসি ভাবলো শরীর খারাপ বোধ হয়। প্রতিদিনই রাতের খাবার পড়ে থাকে। একদিন রান্নার মাসি অর্পণকে জিজ্ঞাসা করলো, দিনে কম খাবার খাচ্ছ, রাতে খাচ্ছ না কেন? মাসি অর্পণের কাছ থেকে উত্তর পেলো—খেতে ভালো লাগছে না। —"না খেলে যে শরীর খারাপ করবে বাবু, খেয়ে নিও"। রান্নার মাসীর মা সুলভ উপদেশ ছিল।

অর্পণ সাহস করে মনের কষ্টকে দূরে রেখে সৌমিতাকে ফোনে তার ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিয়েই উল্টো দিক থেকে কথা বলার আগেই ফোন কেটে দিলো। প্রায় এক সপ্তাহ তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই, ফোনে কথাও নেই। অর্পণ জানতেও পারছে না ওর মতামত কি। কিন্তু অর্পণ কথাটা বলতে পেরে মন খালি করেছে কিছুটা। সৌমতা তো আগেই হাবভাবে, চলাফেরায় জানিয়ে দিয়েছে যে ওকে সে খুব পছন্দ করে। অর্পণের কাছে ভালোবাসার বার্তা পেয়ে তো তার ভালোবাসা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা।

অর্পণের এই ফোনের দশ বারো দিন পরে সৌমিতা অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে এসে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে

আছে। স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের দেখা। নতমুখে দাঁড়িয়ে সৌমিতা, মুখে মৃদু হাসি। আমার সঙ্গে একটু দক্ষিণাপণ যাবে? কিছু কেনাকাটা করবো। তোমার সময় হবে"? সৌমিতা বললো।

"হ্যাঁ চলো"।

দুজনে একঘণ্টার বেশি কেনাকাটা গল্প করে উভয়ে বাড়ি ফিরল। এভাবেই দেখা করে, কখনও ফোনে গল্প করে। দুজন দুজনার প্রেমে গভীরভাবে আচ্ছন্ন। অর্পণের অফিস যাতায়াতের পথে সহযাত্রীরা জেনে গেছে ওদের ঘনিষ্ঠতার কথা। কেউ অর্পণকে বললো, "কবে চার হাত এক হচ্ছে? নিমন্ত্রণ পাবো তো ভাই"?

—"নিশ্চয় পাবেন, এক বছর পরে"।

মাস দশেক পর অর্পণের জীবনে ছন্দপতন ঘটলো। সৌমিতার অন্য জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো। স্বজাতির পাত্র, চেন্নাই এ টাটা কোম্পানিতে চাকরি করে। এদিকে অর্পণ সদগোপ আর সৌমিতারা ব্রাহ্মণ। সৌমিতা তার বাবা মাকে অর্পণের কথা বলেছে, কিন্তু তাঁরা মানলো না। তার বাবা-মা পাত্র পক্ষকে পাত্রী দেখার আমন্ত্রণ করলো। দেখাশোনা উভয় পক্ষের হয়ে গেছে। আগামীমাসে বিয়ে সেটাও ঠিক হয়ে গেল। অর্পণ কোনো কিছুরই টের পেলো না। ইতিমধ্যে সৌমিতা অফিসে রিজাইন করেছে। একসপ্তাহের মধ্যে সব ঘটে গেলো। অর্পণ কোনো খবর না পেয়ে ওর মোবাইলে রিং করলো, ফোন রিসিভ করলো না। অর্পণের মন অস্থির হয়ে উঠলো। সে থাকতে না পেরে ওদের ল্যান্ড লাইনে ফোন করলো। ওর মা রিসিভ করলো, কিন্তু অর্পণ কথা বলতে পারলো না। কয়েকঘণ্টা পরে আবার ল্যান্ড লাইনে ফোন করলো, এবার সৌমিতা রিসিভ করেছে। অর্পণের উল্টোদিকে স্বাভাবিক 'হ্যালো' আওয়াজ, কিন্তু অর্পণ কিছুক্ষণ চুপ থেকে কথা বললো, "তোমাকে আজ অনেকবার মোবাইলে ফোন করেছি, না পেয়ে তোমাদের ল্যান্ড লাইনে ফোন করছি। তোমাকে অফিস থেকে ফেরার পথেও কিছুদিন দেখতে পাচ্ছিলাম না। তোমার শরীর ঠিক আছে তো"?

সৌমিতা মৃদু স্বরে, "আমি অফিসে আর যাচ্ছি না। মেলে রিজাইন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি। চাকরি আর করবো না। বাবা মা আমার বিয়ে বন্দোবস্ত করেছে। আগামী ২৭ এপ্রিল আমার বিয়ে"। ফোন কেটে গেলো।

অর্পণের দীর্ঘনিঃশ্বাস সৌমিতাদের বাড়ি শিবপুর পযন্ত পৌঁছালো না। অর্পণের বুকের ওপর পাথর পড়েছে, কিন্তু চোখ শুকনো। মনে হচ্ছে যেন অর্পণের চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে মেঘ হয়ে। অথচ বৃষ্টি পড়ছে ঘন কালো মেঘ আকাশ জুড়ে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আজ যখন অর্পণ অফিস থেকে বের হচ্ছে— তখনও আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। চাপা কষ্ট নিয়ে বাসে যাদবপুর, সেখান থেকে দশ মিনিট ট্রেনে গড়িয়া। গড়িয়া স্টেশনে নামামাত্র তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশ থেকে অবিরাম মুসূলধারে বৃষ্টি, তাতেও অর্পণের চোখ শুকনো। দাঁতে দাঁত চেপে দৃষ্টি স্থির রেখেছে এখনও অর্পণ। হঠাৎ এই বৃষ্টিতে মোবাইলে রুমালে মুড়ে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো। স্টেশন থেকে বাড়ি পাঁচ মিনিটের পথ। সেই মুহূর্তে মন ও দৃষ্টি একেবারে স্থির। ধীর গতিতে মাথা উঁচু করে বাড়ির দিকে হাঁটছে অর্পণ। স্টেশনে কেউ দেখে ভাবছে ছেলেটার সাহস আছে, যেন হিরোর মতো হাঁটছে। সেদিন থেকে অর্পণ নিজেকে আর কারোরই হিরো আর ভাবেনি।

পুস্তক পর্যালোচনা

‘শালের বনে সন্ধ্যা নেমে আসে’ / হাসি বসু
আলোচক : রবীন বসু

কবিতা আসলে কী? ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলেছেন। আমেরিকান মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসন আবার বলেছেন, ‘আমি যদি একটি বই পড়ি, এবং এটি আমার শরীরকে এত ঠান্ডা করে দেয় যে কোনো আগুন আমাকে কখনো গরম করতে পারে না, আমি জানি সেটাই কবিতা।’ অর্থাৎ কবি জীবনানন্দের ভাষায় যা ‘বিমূঢ় বিস্ময়’ তাহাই কবিতা। কবির উপলব্ধি বোধ আর সামাজিক বিকাশের এক গাঢ় ঘন পিনদ্ধ প্রকাশ। কবি তাঁর নিজস্ব মানসিকতা, শিক্ষা ও অনুভূত বিস্ময় নিয়েই কবিতা লেখেন। হয়তো সারা জীবন ধরে তিনি একটিই কবিতা লেখেন। বা বহুবিধ বলার বিষয় কয়েকটি ছত্রে অক্ষরে বর্ণের শরীরে প্রতিস্থাপন করেন। সেই অর্থে কবি নিজের আত্মজীবনীই লেখেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে এই সময়ের এক উল্লেখযোগ্য কবি হাসি বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘শালের বনে সন্ধ্যা নেমে আসে।’ সেটি পড়তে গিয়ে উপরের কথাগুলো বা অনুভব মনে এল।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পূর্ব থেকে পশ্চিম’ পাঠ করে আমরা বুঝেছিলাম কবি তার নিজস্ব উচ্চারণ নিয়ে সাহিত্যে এসেছেন এবং পাঠকপ্রিয় হয়েছেন। এখন এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠের পর আমরা নিশ্চিত, কবি হাসি বসু আমাদের ঠান্ডা শরীরকে উষ্ণ করে দিতে এসেছেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কবিতা লেখেন। আপন বোধ অনুভব আর উপলব্ধি দিয়েই লেখেন। ‘শালের বনে সন্ধ্যা নেমে আসে’ কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় কবি মগ্ন ও অনুচ্চ স্বরে কথা বলেছেন। তবে সে কথা বেশ স্মার্ট ও উপমা সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতায় আছে এক গভীর গাঢ় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। আন্তরিক উচ্চারণের বিমিশ্র কলতান।

‘কয়েকশো মাইলস্টোন পেরোনোর পর
একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে
একবার ফিরে তাকাই গাঢ় সবুজ
আউশের ক্ষেতে, সোঁদা মাটির গন্ধে
আমার ভেতরের বেপথু ইচ্ছেরা
সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে একে
এসে অভিবাদন জানায়।’ (যতদূর যেতে হবে যাব)

কবি প্রথম কবিতাতেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর যাত্রাপথ কোনদিকে। তিনি নাগরিক ক্লান্ত জীবনের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এক অপার স্নিগ্ধ সবুজ প্রকৃতির সন্ধানে যাবেন। তবে তা ঘুরে পথে। জটিল মানবিক জীবন, হিসেবে নিবদ্ধ সময়, আর আর্ত ঘর-গেরস্থালি পাশে রেখে তিনি মানচিত্রহীন পথে হেঁটে যাবেন অবাক বিস্ময় ও অন্তর্লীন এক দ্বন্দ্ব নিয়ে :

‘মানচিত্রহীন পথে হাঁটি দ্বিধার হাত ধ’রে
বহুযুগ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে খুঁজে বেড়াই,
তবে কি প্রাণহীন উপত্যকার আকর্ষণে
মাঝপথে স্থবির হয়ে অপেক্ষা করছি
অচেনা দরজার পাশে একান্তই একা,
অন্তর্লীন এক দ্বন্দ্ব ভেসে যায় মোহনার দিকে’ (অন্তর্লীন এক দ্বন্দ্ব)

হাসি বসুর কবিতায় ম্যাজিক উদ্ভাস আছে। ছোট ছোট চিত্রকল্প উপমা ও অনুষঙ্গ দিয়ে তিনি তাঁর কবিতার শরীর গড়েছেন। চড়া রং সেখানে নেই, আছে ভোরের নরম স্নিগ্ধতা ও বেলাশেষের লালিমা।

‘শ্যাওলা সবুজ বিলের ওপর যে সাঁকোটায়
সেদিন সকালেও সবাই এপার থেকে ওপারে গিয়েছিল
সেটার আর চিহ্নমাত্র নেই আজ
ভেঙে দিয়ে গেছে বিকেলের কালবৈশাখী।’ (সব গল্প আপেক্ষিক)

সাঁকো যেমন এক সময় ভেঙে যায়, জীবনও ভেঙে পড়ে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে, স্বপ্নভঙ্গে আর অসফলতা ও অচরিতার্থতায়। তখন মানুষের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে বোধ প্রবল হয়। কবিও এক দোলাচল অস্থিরতায় ভোগেন। নিজেকে কোথাও অভিনেতা/ অভিনেত্রী ভাবেন।

'মনকেমন এসে শনাক্ত করলো
এত উদযাপন এত কোলাহল
এত তূর্যরব সবই চোরাবালির নামান্তর।' (মনকেমন)

না, জীবন শুধু চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া নয়। 'যশোর রোডে শেডের নিচে কুপি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা অভুক্ত গণিকা' না, জীবন 'বিন্দু বিন্দু লোহিত কণিকার উষ্ণ প্রস্রবণ'। তবু এই ক্ষতমুখ থেকে কবিতা উঠে আসে। ডিলান থমাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'কবিত হল, যা আমাকে হাসায় বা কাঁদায়। হাই তোলে আবার আমার পায়ের নখে ঝলমল করে।' এই আটপৌরে জীবন, ছোট ছোট সুখবর, মনোভঙ্গের দুঃখের কাঁটাসব নিয়ে ব্যক্তির যে জীবন, সেই আত্মকেন্দ্রিক ছন্নছাড়া জীবন বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক কবিতার স্বর। এ স্বর হাসি বসুর কবিতায় উজ্জ্বল ভাবে আছে। আমরা তাই তাঁর কবিতার অলিন্দে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাই। নৈঃশব্দ্যের সেই ফড়িং ডানায় ভাসতে থাকি।

'সারাদিন সারারাত এঁকে চলি জলরঙে
সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা জাহাজের ছবি,
জলের অনুপঙ্খ বিস্তার,
ডেক পাটাতনের কারুকাজ সবকিছু' (মাস্টারপিসের মৃত্যু)

কবি হাসি বসুর কবিতায় ফুল আছে, গন্ধ আছে, প্রকৃতি তার মহিমা সৌন্দর্য ও রুক্ষতা নিয়ে আছে। আছে রূপকথা-রাত, পরাবাস্তব শিশির ও নিঃসঙ্গতা—

'রাতঘুমে একটা স্বপ্ন আসা-যাওয়া করে,
রক্তে ভেজা জমাট মাটি আর বারুদের গন্ধ পাই,
রক্ত ঝরার উৎস খোঁজার চেষ্টা করি
বারবার ভুল হয়, ঘুম ভাঙলে বুঝি
আসলে চোখের দৃষ্টিই ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে আসছে
পলেস্তারা খসা বারান্দায় আবার একা বসে থাকি।' (অস্বচ্ছতা)

৬৪ পাতার কাব্যগ্রন্থটির শোভন-সুন্দর প্রচ্ছদ কবির নিজের করা। সুতরাং প্রকাশনীর সঞ্জয় ঋষি যত্ন নিয়ে বইটি প্রকাশ করেছেন। উৎসর্গ করা হয়েছে যাটের অন্যতম কবি সদ্য প্রয়াত গণেশ বসুকে।

কাব্যগ্রন্থ : শালের বনে সন্ধ্যা নেমে আসে—হাসি বসু
প্রকাশক : সঞ্জয় ঋষি, সুতরাং প্রকাশনী

দরজা খুলে দাঁড়াও / দুর্গাদাস মিদ্যা
আলোচক : রামতনু দত্ত

আমাদের সামনে একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। কবি দুর্গাদাস মিদ্যার 'দরজা খুলে দাঁড়াও'। সারঙ্গ প্রকাশনী। হাওড়া, জানুয়ারী ২০২৩। কবিতার সংখ্যা চৌষট্টি। প্রথম কবিতাতেই, শুরু হচ্ছে স্মৃতির সরণি দিয়ে :

পরিমিত আলোর মতো
দরজা খুলে দাঁড়াও
চৌকাঠে রাখো পা
দেখো ফেলে আসা দিন
যা ভুলে ছিলে এতদিন...

মনে করার চেষ্টা করুন, তরঙ্গহীন স্রোতে তরী বাওয়ার কথা স্মরণ করুন, মনে করুন কোনো একদিনের কথা, ঘরে হাওয়া ঝড় এসে তছনচ করে দিয়েছিল—

'যত্নে সাজানো বৈভব
উড়ে গেল ঝড়ে, মনে পড়ে?'
ইতস্তত করছেন? কবি বলছেন,'
স্খলিত বর্ষা হয়ে
নেমে আসবে স্মৃতির স্রোত।'

কবি কিন্তু আমাদের পরিচিত, নামী, গুণী মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে খুব সুপরিচিত নাম। নিজেরই মুদ্রাদোষে এত নাম, পরিচিতি। সেই দোষগুণটি হল, তিনি একজন দরাজ মনের মানুষ। অসাধারণ মানুষ, অন্তত আমার তাই মনে হয়। কেবল অবদান নয় মুক্তমনে অবকাশ দান করেন। অর্থাৎ আড্ডাপ্রিয়। খোলামেলা, দূরপ্রসারিত, দানে মুক্ত। এমন অকৃপণ উদার মানুষই কবি মনের অধিকারী হন। শব্দকে ভালোবাসেন, মানুষকে, খুব কাছের মানুষকে, প্রকৃতি ও সমাজ, সামাজিক অবক্ষয়, অতি আধুনিকতা, পৃথিবীর বুকে হঠাৎ নেমে আসা অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করে, ভাবুক করে তোলে।

'অকাজ আর কুকাজ হাত ধরাধরি
হেঁটে গেল রাম্পে।'

"কবিরা নিঃসঙ্গ তো বটেই। অন্যকেও দেখছেন" "বেদনার বৈভব" বহন করতে।

'কেউ একা নেই..।
একা থাকা যায় না কিছুতেই
এই পৃথিবীতে
কেউ না কেউ বসে আছে তোমায় সঙ্গ দিতে।'

'বৃক্ষ ও আমরা' কবিতায় লিখছেন, 'কত নিঃশব্দ মুহূর্ত চলে যায় কালের যাত্রায়'।

'দরজা খুলে দাঁড়াও', সৃষ্টির প্রকাশে সহজ ও স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। তলস্তয়ের মতে, শিল্প সংযোগের সূত্র। নন্দনতাত্ত্বিক ক্রোচে বলেছেন, প্রকাশই শিল্প। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করেন, তবে নিজেকে অতিক্রমও করেন। কবিচিত্ত বাইরের পৃথিবীর বস্তু বা বিষয়কে গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কবিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে আর আগের বস্তু থাকে না। হয়ে যায় নতুন, অ-লৌকিক ও অপূর্ব। আমাদের আলংকারিকেরা মনে করতেন, কবি- প্রতিভা ছাড়া কাব্যসৃষ্টি হয় না। হয়তো কবির সৃষ্ট জগৎ 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত'। কবি শুধু দেখেন না; প্রকাশও করেন।

'বৈভব যা কিছু ছিল আমার
সব ধূলিকণা মনে হয়
না, না, এ কোনো বাহানা নয়

সীমার মাঝে অসীমের পরিচয়,
দেখে শুনে সন্তর্পণে
পার হই পারঘাটা।'
অথবা
'আমি যত ভালোবাসা লিখি
তত তুমি কুণ্ঠিত হও। বিষণ্ণতা
আড়ি পাতে জানালার ফাঁকে। ঝাঁকে
ঝাঁকে মাছি উড়ে যায় স্বপ্ন বিলাসিতায়।'
কবির মনে হয় ভালোবাসা ভালোবাসার মানুষের উঠোনে বসে আছে। কবি প্রেমিক, হয়তো ভালোবাসার কাঙালও।
'যত দুঃখে থাকি
সে আঁচল উড়িয়ে ভেসে যায়
বসন্ত বাতাসে
দুরত্বের খেলা খেলে যায়
লুকোচুরি খেলা
মগ্ন থেকেছি আমি
গভীর বিস্ময়ে দেখেছি তার অবহেলা।'
"এভাবেও" একটি অত্যন্ত ভালো কবিতা। 'মৌন ইশারায়'
কবিচিত্তে শিহরণ, দিশা পান করি—
'যেভাবে ধানের শীষে জমা হয় দুধ,
সেভাবে স্বপ্ন যদি বুনে দাও তুমি, নিখিল
বিশ্বজুড়ে পেয়ে যাব অলীক চারণভূমি।'
কিন্তু যদি থেমে যায় কোনো এক বাঁকে থেমে যায় জীবনের উৎসব, কলরব। কী হবে তখন? 'চমক চরণ ধীর পায়ে নেমে আসে...।' কী কী। জীবনকে ভালোবাসেন কবি, বিচিত্র বর্ণের ঢেউয়ের খেলা দেখেন।

এই কাব্যগ্রন্থে স্ত্রীবিয়োগের প্রচ্ছন্ন শোকগাথা আছে। পাঠকপাঠিকা প্রীত হবেন।

যেমন রয়েছে করোনার আঘাতের অভিঘাতও; কবির মনের কষ্ট কয়েকটি কবিতায়।

সমাজের কঠোর কঠিন বাস্তব ফুটে উঠেছে কবিতায়। 'মৃত নদীটির মতো পড়ে আছে আক্রান্ত সমাজ / যেন রসহীন বালুচর, ধু- ধু প্রান্তর।' সমাজ হারিয়ে যায় অমানবিকতায় ও অভিনয়ে। অতৃপ্ত মানুষ নীরবে পথ হাঁটে। আকাশের বিধুর চাঁদকে মনে হয় ঘরে মরে পড়ে থাকা গাছ।

'কে জানে কখন হাওয়া সরে যায় দূরে।
সুখী নয় জানি, কেউ সুখী নয়
সবাই সুখে থাকার করে অভিনয়।'
কবির গগনভেদী আর্তনাদ,
'যাবতীয় মানবিক আলো
নিভে যায় কোন কারণে, কে জানে?'

শ্বাসরুদ্ধকর পৃথিবীর বুকে যুদ্ধবাজদের রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন কবিসত্তার বেদনার কারণ হয়। কবি দুর্গাদাস কবিতারও প্রেমিক, শব্দের সন্ধান করেন পথ হারানো পথিক। আশ্রয় নেন অমানিশায়। মোহনীয় কবিতার কথা কতজন জানেন এ জগতে। অতীতের ছায়া মায়া হয়ে ঘোরে, তারপর একদিন কবিতা ফিরে আসে ঘরে। 'নীরবে নিজের কুলুঙ্গি সাজায়।'

কুলুঙ্গি আমরা বাঁকুড়ার মানুষরা দেখেছি। ছোট তাক, দেওয়ালের গায়ে গর্তের মতো। আকর্ষণীয় রহস্যময়। পুঁথিযুগের কবিরা কুলুঙ্গিতে কাব্যগ্রন্থ রাখতেন।

'শিরোনামে কিছু ভুল আছে' একটি অসাধারণ কবিতা। রাত্রি, অমাবস্যার রাত্রিকে রূপক করে 'অমাবস্যাই দোসর' ভালো কবিতা। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তের উত্তররাধিকার বাঙালি কবি আজও বহন করেন নিজের অজান্তেই। ঝড়ের শিকার একটি বৃক্ষ। তাও কবিকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে। সংবেদনশীল কবি লক্ষ করেন ঘুম চোখে লেগে থাকা স্বপ্ন। তবু 'মন ছুঁতে চায় প্রভাতী আলোর কিরণমালা '

এরকম অজস্র ভালোলাগা ছড়িয়ে আছে আমাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি দুর্গাদাস মিদ্যার কাব্যগ্রন্থ 'দরজা খুলে দাঁড়াও 'কাব্যগ্রন্থে।'

'অপমৃত্যু' কবিতায় শব্দ হারিয়ে যায়, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে তাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। আমি নিজে শব্দজিজ্ঞাসু বা কাব্যজিজ্ঞাসু বলে খুব ভালো লেগেছে এই কবিতাটি। কবি দুর্গাদাস মিদ্যা সবার প্রিয়, আমারও প্রিয় মানুষ। কিন্তু আমার কোনো গুণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু দেশের বাঁকুড়ার মানুষ বলে একটু যেন বেশি ভালোবাসেন। আজ সেই ঋণ যৎসামান্য শোধ করলাম। এটি শেষ কাব্যগ্রন্থ। আগের বইগুলোও পড়েছি। কিন্তু আলোচনা করা হয়ে ওঠেনি। এই বইতে আরও অনেক 'কল্পনা-প্রতিভা' না থাকলেও কিছু আবিষ্কারের সুযোগ রয়েছে। যেমন কবি হওয়া যায় না তেমনি পাঠককেও অচঞ্চলমস্তিষ্ক হতে হবে। পড়ুন সকলে, কিনে পড়লে আরও বেশি রসগ্রহণ করতে পারবেন। আমরাও পরের কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষায় থাকব। তিনি সহজিয়া কবি, ভাষা সহজ কিন্তু কাব্যগুণে অলঙ্কৃত ঝঙ্কৃত বলে পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে। স্ব-ভাবেই যা সুন্দর তা স্বস্পন্দ সুন্দরও বটে। কবিপ্রতিভার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কবিকর্ম, সহৃদয় পাঠকসাধারণকে তা আনন্দময় হাতছানি দিচ্ছে। এই মহানগরে 'আসর ভেঙে যায় সম্পর্কহীনতায়।' সামাজিক পরিচয়ের জন্য সব মনকে কাছাকাছি আসতে হয়।

'মুণ্ডহীন মানুষের মতো হেঁটে চলা শহরের পথে পথে রঙীন রুমাল বেঁধে দু'চোখে। 'শহরের ভিড়ে মানুষ এত অচেনা কেন, কবি একবুক কান্নায় ভেঙে পড়েন।' কত হা-ঘরে এখনও ফুটপাতে দিন গুজরান করে দেখে চোখে আসে জল।' ('দেওয়াল লিখন')

কাব্যগ্রন্থ : দরজা খুলে দাঁড়াও—দুর্গাদাস মিদ্যা
সারঙ্গ প্রকাশনী। হাওড়া। জানুয়ারী ২০২৩
মূল্য ঃ ১২০ টাকা।

নির্বাচিত প্রেমের কবিতা / সুশীল মন্ডল
প্রেমের কবিতায় শিকড়ের টান—কুনাল রায়

কবি সুশীল মন্ডলের কবিতার সঙ্গে বাংলা পাঠকমহলের একাংশ নিশ্চয়ই পরিচিত। তাঁর 'ঈশ্বরের ঢেউ ভাঙে' অথবা 'বসন্ত দিনের বৃষ্টি'ও অতীতে কবিতাপ্রেমী পাঠকজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে। গত বছরের জানুয়ারি মাসে 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা'। এই বইতে তাঁর পূর্বতন কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে প্রায় চল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। যে পাঠকগণ এখনো তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত নন, এই সংকলন তাঁদের সকলকেই সুষ্ঠুভাবে তাঁর লিখনশৈলীর সঙ্গে পরিচয় করাতে পারে। কেবল পরিচয়ই, কারণ কবিতার মতো ব্যক্তিগত, নিভৃত প্রকাশ আর কিছু নেই। কাউকে ছুঁয়ে যায়, কাউকে না। কোন দুটি ছত্র বিষাদে মেঘের মতো ঘনিয়ে আসবে, আহ্লাদে হাসিয়ে তুলবে, আমৃত্যু মনে রয়ে যাবে, তা কি আগেভাগে জানা যায়?

যেকোনো কবির কবিতাই দু-মলাটে ধরার চেষ্টা অসম্পূর্ণ। তবে 'নির্বাচিত' যেকোনো রসের সংকলনই ওই কবির সঙ্গে পাঠকজনের একটি সেতু তৈরি করে। মনের উচ্চারণে একটি পংক্তি যদি বেলা গড়িয়ে গেলেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তখন আমরা ওই কবির উচ্চারিত আরো গভীরতর স্তবকে যেতে চাই। হতে পারে তাঁর শব্দপ্রয়োগগুলি আমাদের টানল। অথবা তাঁর ছান্দিক চলা। পাঠক বুঝতে পারেন, কবি আদৌ মনের ভাবটা বর্ণনা করতেই বেশি ভালোবাসেন, নাকি পাঠককে চিত্রকল্প নির্মাণের সুযোগ দেন? আসল বলার কথাটি কীভাবে লুকিয়ে দেন? প্রাণ-প্রকৃতি কি আসে তাঁর কবিতায়? ক্ষোভ কীভাবে প্রকাশ করেন? তাঁর কবিতায় কেমন চরিত্রদের ছবি আঁকেন? আর এভাবেই চলতে থাকে কবি ও পাঠকের প্রাথমিক আলাপ। কবিতার টানে কখন যেন কবি-পাঠক এক সুতোয় বাঁধা পড়েন।

কবি সুশীল মন্ডল সুন্দরবনে প্রোথিত প্রাণ। সুন্দরবন তাঁর শিকড়। খুব কাছ থেকে দেখা সবুজ দেশের টুকরো ছবি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। যা নাগরিক পাঠকদের পায়ের পাতায় কোমল ঘাসের ছোঁয়া দিতে পারে। নদীর আরশিতে দেখাতে পারে প্রেম। দেখাতে পারে, সুন্দরীর বনের ফাঁকে নেমে আসা সান্ধ্য অন্ধকার। ঝিঁঝিঁর ডাক। এঁকেবেঁকে বয়ে চলা খাল, নদী-নালা। জোনাকির মেলা। কোনোদিন ঝি-বউ বোঝাই ক্যানিং লোকাল চলে যাওয়ার পর, শূন্যতার শব্দ। বহুদিন তিনি কলকাতায় শিক্ষকতাও করছেন। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় সুন্দরবন যেমন আছে, তেমনই সুললিত নাগরিক চাঞ্চল্যের প্রকাশও আছে। তবুও সে চঞ্চলতা তাঁর কবিতার সর্বাঙ্গ গ্রাস করতে পারেনি। জোনাকির রাত, তাঁর কবিতায় প্রগাঢ় রঙ নিয়েছে। মহুয়ার গন্ধই তাঁর কবিতার সৌরভ। বারংবার চলে এসেছে সুন্দরবনের জনবসতির কাঁচা ছবি। তিনি লিখেছেন, "টুসুকে ঘিরে ধামসা নাচ/হেঁড়ে মদের ফোয়ারা/মাগীমদ্দর ঢলাঢলিতে/লাজ লাগে টুসুর, মুচকি হাসে/জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।" আদম-ইভের রহস্য, রক্ত-মাংসের জাদুর টান তিনি প্রকৃতির চিত্রপটে সাজিয়েছেন। মানুষের চিরকালীন জৈবিক উৎকণ্ঠাগুলিকেও তিনি ছুঁয়ে গেছেন নতুন করে। অপেক্ষা আর পাওয়ার টানাপোড়েনে তাঁর মনে পড়েছে, মাঠ পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারির সারির কথা। কোপাইয়ের জলের ধারে দেখা সাঁওতাল রমণী তাঁর কবিতায় চরিত্র হয়ে এসেছে। অকপটে লিখেছেন, ".. ছেনি হাতুড়িতে সটান রামকিংকর/চুলে তার প্রাচীন ধুলো।/লোকজন নেই। একটি গল্প জন্ম/নেয় ছেনি হাতুড়ি ঘিরে।/চিরন্তন গল্প।" ব্যাস, তিনি এটুকু বলেই থেমে যান। ঠিক এইখান থেকেই হয়ত পাঠকের আরো গভীরে হেঁটে যাওয়া শুরু।

প্রেম সততই জীবনব্যাপী হরেক সুখানুভূতির কোলাজ। বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ধুসর ছবি, অথবা শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের মতো আলগা স্মৃতি। প্রেমের কথা বলতে গেলে হরেক স্মৃতিও তাই ভিড় করে। আর স্মৃতির সরণী ধরেই তো ধীর পায়ে শিকড়ের দিকে এগিয়ে চলা। কবিতাতেও তাই লুকিয়ে পড়ে স্মৃতিতে আসা মুহূর্তছবি। কবির উচ্চারণে তাই, "কলেজ হলে চিত্রাঙ্গদা চোখ দিয়ে সব কথা/দিনগুলো সব শুকনো কাঠ কিংবা নিছক ব্যথা।" নাগরিক কৃত্রিমতার মধ্যেও তিনি কবিতায়, স্মৃতিতে, শব্দে, ছবিতে অকৃত্রিম প্রেম-অপ্রেমের চিন্ময় রূপ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মানসপটে ঝাপসা অবয়বের প্রেয়সীরা কখনো 'তুমি', কখনো 'তুই'। তাঁদের কারো সঙ্গে একান্ত সংগোপনের কথাও কবি যেমন লুকিয়ে দিয়েছেন, তেমনই ভাষায় দিয়েছেন দেহাতীত যৌনতার আভাস। তাঁদের কাউকে তিনি বলেন, "সহাস্য কৃষ্ণচূড়া/হাত বাড়িয়ে তোমাকে

ছুঁতে চায়/তুমি অধরা থাকতে ভালোবাসো।" কখনো অধরা 'সবিতাদি'র ছবি আঁকেন তাঁর পাঠকদের সামনে। যাঁর "চুম্বন এগিয়ে এসেও আসে না"। আরো কত বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্র, টুকরো দিনের স্মৃতি, চিরায়তকেও নিজের করে দেখার কথা কবি সুশীল মণ্ডল তাঁর কবিতাগুচ্ছে রেখেছেন নিভৃতে। প্রায় গোটা উপন্যাসের সম্ভবনা কবিরা এক নিমেষে ভাবিয়ে চলে যান। আর এখানেই কবিরা চিরকাল জিতে গেছেন। জিতে গেছেন সুশীল মন্ডলও। যে শৈশবের সুন্দরবন তিনি বুকে নিয়ে ফেরেন, সেই সুন্দরবনের টুকরো ছবিই কবি যেন নানা রঙের মিশেলে দেখাতে চেয়েছেন। ঢেলে দিয়েছেন মুহূর্তকথায়, বিমূর্তকথায়।

চিরকাল কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার মহাফেজখানা থেকে টুকরো টুকরো উপলব্ধি সম্বল করেই পাঠকদের সঙ্গে আড্ডা দেন। সেই আড্ডায় গোটা ট্র্যাজেডি রূপান্তরিত হয় কিছু শাব্দিক খোঁচায়। আর এই খোঁচা ভাবুকদের যত ব্যথিত করে, কবিরা ততই অমরত্ব লাভ করেন। কিছু পংক্তি পাঠকেরা সযত্নে মনের অ্যালবামে জায়গা দেন এবং আজন্ম ফিরে ফিরে দেখেন। আশা করা যায় কবি সুশীল মণ্ডলও বহু পাঠকের মনে তাঁর কিছু উচ্চারণ অবিনশ্বর অক্ষরে লিখে দিতে পেরেছেন। ছুঁইয়ে দিতে পেরেছেন পাঠকের মনে তাঁর জিয়নকাঠি। বাংলার কবিতাপ্রেমী পাঠকদের মধ্যে ইতোমধ্যেই সুশীল মণ্ডল সমাদৃত। নিশ্চয়ই আগামীতে আরো তরুণ, নবীন কবিতাপ্রেমীদের কাছে সুশীল মন্ডলের কবিতা সাগ্রহে গৃহীত হবে।

কাব্যগ্রন্থ : নির্বাচিত প্রেমের কবিতা—সুশীল মন্ডল
প্রকাশক- দে'জ পাবলিশিং
মূল্য- ১৫০ টাকা

গান বাঁধো বাউলানি/সুচরিতা চক্রবর্তী
সমাজবাস্তবতার দর্পণে গান বাঁধে কবিতা—সৃজিতা ব্যানার্জী

নিত্যযাপনে সঞ্চিত নানা অভিজ্ঞতার সমন্বয় ও তার সার্থক সংশ্লেষের ফলে জন্ম হয় কবিতার। তবে বেশিরভাগ সময়ই কবিতায় নীরবতার প্রাধান্য দেখা যায়। চরম নীরবতার মাঝে কবিতা কিছু কথা বলে যায়। কয়েকটি মাত্র পঙ্কিতে বলে যাওয়া কিছু শব্দ সহজেই মনে-প্রাণে অনুরণন জাগায়। সৃষ্টি করে এক অদ্ভুত অনুভূতি যার অতলে তলিয়ে গেলেও বিমুগ্ধতার ঘাটতি থাকে না। 'গান বাঁধো বাউলানি' সেই নীরবতার মাঝে সমকালের সঙ্গে সর্বকালের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এঁকে যায় কিছু বাস্তবতার অবয়ব। চিত্র, কল্পনা ও ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গম মিলিত হয়ে বলে চলে হরেকরকম জীবনমুখী গল্প।

কবি সুচরিতা চক্রবর্তীর কবিতায় মানবিক বোধের সঞ্চার পাঠককে কবিতার গহিনে প্রবেশ করতে শেখায়। সেখানে ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত দানা বাঁধে সমাজবাস্তবতা। কাব্যগ্রন্থটি মোট ৫৬টি ছোটো ছোটো কবিতার সংকলনে রচিত। চেহারায় ছোটো হলেও তা যৌক্তিক ভাবনায় পরিপূর্ণ।

বইটির প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০২১। অর্থাৎ, অতিমারির সময়ে কাব্যগ্রন্থটি ভূমিষ্ঠ হয়। করোনার করাল কোপে বিশ্ব তখন বশীভূত। মানুষের নিঃশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশ হারাতে হারাতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সংক্রমণের সঙ্গে সমঝোতা করার মতো ভ্যাকসিনের সন্ধান তখনও মেলেনি। দিনরাত এক করে প্রতিষেধকের খোঁজ চলেছে প্রতিনিয়ত। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের অজান্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এই বিভীষিকাময় ভয়ার্ত পরিস্থিতিতে সমগ্র মনুষ্যজগত যখন মৃত্যুকে সঙ্গী করে একটা একটা করে দিন কাটাচ্ছে, তখন কবি সুচরিতা তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয় সকাল' শিরোনামে লেখা কবিতায় বলেন—

প্রতি সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি না
মাঝে মাঝে মৃত্যু থেকে উঠি।
ভরসা করে ঠোঁট রাখি কফির কাপে

কঠিন বাস্তবতা থেকে জন্ম নেয় নিস্তব্ধতা আর তা থেকেই কবিতার জন্ম। সুচরিতা সমকালের আরো একটি অসুস্থতার কথা কবিতায় তুলে ধরেছেন, যা নিস্তব্ধতাকে ভীষণভাবে প্রকটিত করে। বিচ্ছেদ। প্রতিদিন এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফলে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। তিলোত্তমার ঘরে ঘরে তাই আজ বিচ্ছেদের ঘ্রাণ মেলে। সামান্য কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র সমস্যা শুরু হলেও মীমাংসার রাস্তায় যেন সাইক্লোনের বিধ্বংসী ঘূর্ণাবর্ত আছড়ে পড়ে। শুধু দেখা যায়—

একটা হলুদ ট্যাক্সি এখনো তবু দাঁড়িয়ে আছে
যাপনকে ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাবার জন্য।

'সময়ের ক্ষত'-র প্রতিটা লাইনে যেন তাঁর আত্মিক উপলব্ধির চিত্র ধরা পড়ে। চড়াই—উৎরাই নানান পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে একের পর এক দিন এগিয়ে চলে। যাপনে তা নতুন অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ ঘটায়। প্রতিদিনই ভালো-মন্দ সমস্ত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় সবাইকেই। এভাবে দিন জুড়ে জুড়ে মাস, আবার মাস যুক্ত হয়ে কেটে যায় গোটা একটা বছর। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর ক্যালেন্ডারে নীলের মাঝে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল লাল ডেটগুলোয় ক্ষণিকের অবসর মেলে কারণ সময় ফুরিয়ে গেলে তা যে আর ফিরে পাওয়া যায় না—

জন্ম মৃত্যুর নিয়ামিক খেলায়
ধূলো জমে কালকের তারিখে।

এ দেশের বহু মানুষ প্রতিদিন অনাহারে দিন কাটায়। কেউ খোঁজ রাখেন না তাঁদের। খাদ্য সঙ্কট ভারতের একটি চিরকালীন রোগ। সমাজের একটা গোষ্ঠী বিলাসিতা করে বলেই হয়তো সাধারণ মানুষ অনাহারে দিন কাটায়। একদিকে

বেকারত্বের বাড়বাড়ন্ত। আর অন্যদিকে উচ্চবিত্তরা কোনো এক নগরের বিবাহ বাসরে মশগুল। ফলে স্বাধীনতার ৭৮ বছরে পরেও কবিকে বলে যেতে হয়—

অনাহারে কেউ আত্মীয় হয় না।

'বরফ গলে গেলে স্বাধীনতা' যেন যান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজের কাছে জেহাদ ঘোষণা করে। বর্তমান পৃথিবী যন্ত্র সভ্যতার অঙ্গুলি হেলনে কথা বলা, কাজ করা, খাওয়া সবই করে থাকে। সকলেই নিয়মের দাস। ছকে বাঁধা জীবনে বিশ্বায়ন বার বার মনে করিয়ে যায়

রেফ্রিজারেটরে চলছে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ।/রান পিস থেকে কাতলার মাথা
চাপা আছে কঠিন পরাধীনতায়।/রেড ওয়াইন আর বরফের কুচি
গলায় ঢালছে ইদানীং সমাজ/এক অদ্ভুত নীরব শান্তিজল।

বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন নারীরা। বিদেশেও তার আঁচ পৌঁছে গেছে। উদ্দেশ্য একটাই। বিচার চাই। যেভাবে পাশবিক অত্যাচারের সম্মুখীন মেয়েটি হয়েছে তা সমস্ত স্তরের মানুষকে আলোড়িত করেছে। করে তুলেছে আতঙ্কিত। মেয়েদের কি সুরক্ষা সত্যিই কোনোদিন ছিল? নাকি হবে! বিচার আছে কি না তাও জানা নেই। তবে দোষীদের যথাযোগ্য শাস্তি হোক, তা-ই কাম্য। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে, ২০২৪-এ দাঁড়িয়েও দিনের শেষে রাজপথে একা চলার স্বাধীনতা মেয়েদের নেই। এই নারকীয় ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার পর 'অলিখিত' কবিতাটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও গুমরে মরা প্রতিটি মেয়ের হয়ে কবি বলে চলেন,

মেয়েটি একটিমাত্র কবিতা লিখেছিলো/মেয়েটি একবার মাত্র মঞ্চে উঠেছিলো
অনেক পুরুষ ওর স্তনে মুখে রেখেছিলো/ওর খোঁপায় একটি গোলাপ রাখা ছিলো
যার প্রত্যেক পাপড়ি পৃথক করা হলো

'চালচিত্র' বলে যায় এক দাম্পত্য জীবনের গল্প। হাঁড়ির ফ্যানের সঙ্গে গড়িয়ে যাওয়া উনিশ কুড়ি বছর, তেলে মাখামাখি তোশক-বালিশ, চামচের ঠোকাঠুকি, সাজানো সংসার যেন নিয়মে বেঁধে ফেলার কথা বলে যায়। কবি শৈশবের স্মৃতিচারণ করে আক্ষেপ করেন। মনে সংশয় তৈরি হয়—

'ফ্রকের ভেতর ভেতর কবে এত বড় হয়ে গেলাম!'

মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতিও দ্রুত প্রচলিত, প্রসারিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও (মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী) তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। পরবর্তীকালে সাহিত্যে নবজাগরণের জোয়ার আসায় এই ধারায় ভাটা পড়লেও মানবমনে ঈশ্বরপ্রেম চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। বিশ্বাসের কাঁধে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঈশ্বরকে মানুষ খুঁজে ফেরে বারবার। প্রতি গৃহেই তিনি প্রতিষ্ঠা পান, নিত্য সেবাও তাঁকে দেওয়া হয়, আড়ম্বরের সঙ্গে আরাধনা চলে প্রতিদিন, হয়ে ওঠেন সমস্ত আশা-প্রত্যাশাকে স্থায়ী রূপদানের একমাত্র অবলম্বন। এর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ হয়তো নেই, তবুও প্রায় সকলেই এ পন্থায় বিশ্বাসী। কিন্তু পাপ-পুণ্যের সমীকরণে ঈশ্বর কি সত্যিই নিরপেক্ষ থেকে বিচার করেন! করেন না বলেই হয়তো তাঁর লীলার বাস্তবিক প্রতিচ্ছবি দেখে সুচরিতা 'প্রতিলিপি' কবিতায় দ্বিধান্বিত হয়ে বলে ওঠেন—

অসংখ্য বোধহীন মানুষের জটলায়/ছিটিয়ে দিচ্ছি শান্তির জল
অনন্ত হেঁটে যাওয়া কালের নিয়মে/কেউ পায়নি অমৃত ফল।
দশ আঙুলে আঁকড়ে বাঁচার স্বাদ/চৌকাঠে এসে হোঁচট খায়।
ইদানীং দেওয়ালের অজ্ঞ প্রতিলিপি/রোজ জল বাতাসা পায়।

সময় বয়ে চলে কালের নিয়মে। কবি সুচরিতা চক্রবর্তীও সামাজিক নানা দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে যান তাঁর কবিতার খাতায়। 'মরাল গ্রীবার মতো একাকিত্ব', 'পাখিরা ঘরে ফিরে আসে রোজ', 'চেনা অচেনা', 'একলা স্টেশন', 'যখন তুমি এলে',

‘প্রত্যাশিত জীবন’, ‘ইচ্ছের গোপনীয়তা’ প্রভৃতি কবিতা সমকালীন পরিস্থিতিকে চিনতে শেখায়। ভাবনার অবকাশ সেখানে বিস্তর। বলে চলে নিয়মের গণ্ডি পেরোনোর কথা। সংবেদনশীল কবি-মন কবিতাগুলিতে সযত্নে অঙ্কন করে চিত্রকল্প। ফলে অনায়াসেই কবিতার মূল ভাববস্তু পাঠকের সামনে প্রতিচ্ছবির মতো ভেসে ওঠে। কবি সুচরিতা কাব্যগ্রন্থটিতে মূলত বাস্তবিক জীবনকে তুলে ধরেছেন। নিত্যদিনের এই বাস্তবতা ব্যঞ্জনার ছোঁয়ায় ভিন্নমাত্রা পায়। ব্যঞ্জনা কবিতা ও তার অর্থের মধ্যে দ্যোতনার জন্ম দেয়। ‘বুলেট আর জ্বরের কপাল’, ‘মায়া’, ‘বুকের মাটি’, ‘অংক’-র মধ্যেকার অর্থও এখানে নিজস্ব সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে অপর কোনো এক অর্থে পর্যবসিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক ‘সুতরাং’ প্রকাশন। প্রচ্ছদ নির্মাণে সঞ্জয় ঋষি। তবে প্রচ্ছদের বিষয়ে আরো একটু বেশি যত্ন নেওয়া গেলে ভালো হয়। কবিতাগুলো সুসজ্জিতভাবে ছাপানো হলেও ‘কবি সম্মেলন’ শীর্ষক কবিতাটি দু’বার ছাপা হয়েছে। কবিতাগুলোয় একবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক চালচিত্রের হদিশ মেলে। যাপনকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক সমাজ উঠে আসে বারংবার। বাংলা কবিতায় উঠে আসা নতুন মুখকে দিশা দেখায়। সমাজের ক্ষতকে মেলে ধরে সভ্যতার আলোয়। কবিতায় এই প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে এক নতুন ঐতিহ্যের ইস্তেহার। সমাজবাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিতা যাপনে এক নির্ভেজাল সত্যির সন্ধান দেয়, যার অনুরণন চলতে থাকে নিরন্তর।

কাব্যগ্রন্থ : গান বাঁধো বাউলানি
কবি : সুচরিতা চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ : সঞ্জয় ঋষি
প্রকাশক : সুতরাং প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১

অথ হনু কথা / মোস্তাক আহমেদ
প্রতিবাদের ভাষা অথবা দরকারি হনু-সংবাদ / দীপশেখর চক্রবর্তী

কবির এবং কবিতার দায় নিয়ে মাঝে মাঝেই কিছু কথা ভাবি। অনেকেই মনে করেন কবির দায় এবং কবিতার দায় একই। একজনের কাছেই। তা মনে করি না। একজন কবি কখন কবিতা লেখেন এই প্রশ্নের কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। অনেক উত্তরের মধ্যে যে শব্দের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়াতে চাই তা হল—'বিপন্নতা'। এই বিপন্নতার বিভিন্ন স্তর থাকতে পারে। একথা বলাই যায় সেই কবিকেই আমি কবি হিসেবে উচ্চতর আসনে বসাতে পারি যিনি এই বিপন্নতার মধ্যে ডুবে যান না। বরং নিজেকে এবং নিজের বিপন্নতাকে আলাদা করে দেখতে পারেন। এই দেখা যে বিন্দুতে দাঁড়িয়ে হয়, সেখান থেকে কবিতা সৃষ্টি হতে পারে। বরং বলা ভালো সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কবিতা কবির নিজস্ব বিপন্নতা থেকে অনেকের হয়ে যায়। সফল কবিতা বলে কিছু হয় কিনা জানি না কিন্তু যখন কবি নিজের গণ্ডিটাকে অতিক্রম করে অনেকের ভাষা হয়ে উঠতে পারেন তখন তার কবিতা প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ, ভালো কবিতার মুখ্য ধর্ম। বিন্দু থেকে সিন্ধুর দিকে যাত্রা। মোস্তাক আহমেদ কলকাতা শহরের একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিপন্নতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল না হলেও এটুকু আন্দাজ করা যায়, তা খাদের কিনারা নয়। কিন্তু কবির যে জায়গাটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা হল, মানসিক বিপন্নতা। চলে যাই, প্রবন্ধের শুরুতে। কবির দায়। মোস্তাক আহমেদ একটি কবিতার বই লিখেছেন যার নাম —'অথ হনু কথা'। নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোস্তাকবাবু সেই কবিতার বইতে ভাবের জগতে বিচরণ করেননি। কল্পনার স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করেননি। ফুল-পাখি-পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি একটি দায় থেকে কবিতার বইটি লিখেছেন। এই দায়ের নাম হতে পারে—কবির সমাজের প্রতি দায়। কিন্তু কবিতার দায় কিন্তু শুধুমাত্র সমাজের প্রতি নয়। এই দায়কে মাথায় রেখেও কবিতাকে কবিতা হয়ে উঠতে হয়। নইলে গোটাটা হয়ে যেতে পারে কেবলই কিছু রাগের কথা অথবা শ্লোগান। দক্ষ কবিতা সবসময় এই মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে। এমনভাবে আড়াল করে যাতে বুদ্ধিমান পাঠকের তা বুঝতে অসুবিধা না হয়। এই যে আড়াল করার পথ, এর মধ্যে দিয়েই একটি কবিতার বইয়ের ভালো মন্দ বোঝা যায়। যাই হোক, এদিকে আর কথা না বাড়িয়ে ঢুকে পড়ি একেবারে কবিতার বইয়ের ভেতরে।

প্রথম থেকে শুরু না করে একেবারে বইটির 'ব্যাক-কভারে' চলে যাই। চারটে লাইন লেখা আছে। "সকালে উঠে দেখি পেছনে মস্ত লেজ/সাধ ছিল হনু হব মিটল যে অবশেষ/এরপর কী যে করি ভেবে পাওয়া দায়/লেজেতে আগুন জ্বালি আছি লঙ্কায়।" এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে গেল। শৈশবে দেখেছি, পাড়ায় যে সব তরুণেরা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতা দখল করত তাদের 'হনু' বলে নামকরণের রেওয়াজ ছিল। 'হনু' অর্থে মাটি ছেড়ে তারা এবার গাছে উঠেছে। তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। 'লেজ' ক্ষমতার একটি চিহ্ন। এই চিন্তা নিয়ে যদি এগোই দেখা যাচ্ছে- সকালে উঠে দেখি পেছনে মস্ত লেজ। অর্থাৎ এই পরিবর্তন আকস্মিক। অর্জিত নয়। এই যে সাধপূরণ তাই যতটা কল্পনার ততটা পরিশ্রমের নয় (যদিও এর পেছনে নানা কূটকৌশল থাকতেই পারে)। কিন্তু এই যে ক্ষমতা পরিবর্তন, এর কোনও শুভ প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না পেয়ে বরং আগুন জ্বালানোই শ্রেয়, এমন মনে করছেন কথক। সুতরাং 'হনু' চরিত্র নিয়ে প্রথমেই একটা ধারণা জন্মালো আমাদের। বইটির ভেতরে প্রবেশ করা যাক।

বইটির শুরুতেই দেখি চারটি লাইন, আবারও।

"এত কেন প্রশ্ন করো তুমি/ মনের মধ্যে এতরকম ক্ষয়/ আমার আছে নির্মাণে নির্মাণ/ অতলে তার বিশুদ্ধ সংশয়।"

কতগুলো শব্দ পেলাম। 'প্রশ্ন', 'ক্ষয়', 'সংশয়'। প্রশ্ন কে করেন? কবি নাকি জনগণ? কবি কি এই জনগণের প্রতিনিধি? কবির কি দায় আছে জনগণের হয়ে প্রশ্ন করার? কবি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন? মনের ক্ষয় বিষয়ে। এই মনের ক্ষয় তৈরি হল কীভাবে? তার উত্তর পরের দুই লাইনে। ওপরে এই নির্মাণের ভেতর সংশয় ভরে আছে। এই সংশয় থেকেই মনের ক্ষত। সেই মনের ক্ষতের নাম হতে পারে—'অবিশ্বাস'। যে অবিশ্বাস থেকে কবি তার সূচিতে লেখেন— 'হনুদের দখলে'। আমাদের মনে পড়ে যায় আগের একটি প্রসঙ্গ। সংখ্যা। এই সংখ্যার খেলাটা তবে কে দখল করে রেখেছে। হনুরা। এই হনুদের পরিচয় কী, এবার জানার চেষ্টা করব।

"হনুরা ছিল লুকিয়ে কোনো গর্তে/ হনুরা জানে আসল খেলা কবে/ কিসের গন্ধে মাতাল হল বাতাস/ হাতের পাশা ছড়িয়ে দিতে হবে।"

"আরেকটি কবিতার দিকে তাকানো যাক—হনুর দলে নাম লেখাতে চাও/ লেজে লেজে আইন আছে আঁটা/ মুখপোড়া সব হনুর বদল চাই/ পোড়াবে মুখ তাদের দখল দাও।"

সুতরাং হনুদের পরিচয় সম্পর্কে একটা ধারণা নিশ্চয়ই পাঠক করতে পারছেন। কবি জানাচ্ছেন দশ নম্বর কবিতায়— "পথে পথে হনুর নজরদারি/ শোবার ঘরও বাদ যাচ্ছে নি।" এই নজরদারি কারা চালাচ্ছেন? রাষ্ট্র? সরকার? নাকি তাদের প্রতিনিধিরা। যে প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হয়ত রাষ্ট্র অথবা সরকারের থেকেও বড়। তারাই দেখে রাখছেন এই দেশের 'সংখ্যাদের'। এই সংখ্যাদের সবথেকে নিরাপদ জায়গাতেও তাদের অবাধ বিচরণ। আরও স্পষ্ট করা যাক হনুদের পরিচিতি। 'পানি-জলের উৎস একই জানি/ বনে বনে তবুও আলপথ/ হনুর দল বড্ড সাবধানি/ আভরণে চিনছে পরিচয়।' আরও স্পষ্ট করি? ২৬ নম্বর কবিতায় কবি লেখেন "গাছে গাছে হনু-দলের সে কী নাচানাচি/ এতদিনে 'আচ্ছে দিন', বেঁচেবর্তে আছি।"—এতক্ষণে হয়ত হনুদের পরিচয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। পরিচয় তো স্পষ্ট হল। কিন্তু হনুদের কাজ কী? ৫৪ সংখ্যক কবিতায় কবি লেখেন— "উস্কানি কাঠিগুলি যারা নাড়েচাড়ে/ নিঃশ্বাস ফেলে হনু 'তাহাদের'ই ঘাড়ে।" এবার তবে আসি হনুদের বিশ্বাস বিষয়ে। ৪৯ সংখ্যক কবিতায় কবি লেখেন— "জলে চালিয়েছি বিমান কত/ মূত্রে পেয়েছি সোনা/ বিজ্ঞানে ছাপ রাখবেই দেশ/ হনুদের আছে জানা।" হনুদের বিশ্বাস সম্পর্কে তো জানা গেল। এবার আসি হনুদের ভয় সম্পর্কে। ৪২ নম্বর কবিতায় কবি লিখেছেন— "ইতিহাসে দিয়ে ডুব/ কেটে কেটে আনি খাল/ হনু রাজা বলে চুপ/ আরবান নকশাল।"

তাহলে হনুদের পরিচয়, কাজ, বিশ্বাস, ভয় সম্পর্কে আমরা জানলাম। কিন্তু হনুরা কি সত্যিই হনু? কবি লেখেন— "হনুও জানে অবচেতনে/ আদপে সে হনু নয়/ প্রাত্যহিকের অভ্যাসেতে/ শিখে গেছে অভিনয়।" সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কবি হনুদের যে পরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছেন তার এক রাজনীতি আছে। কিন্তু তারা কি শুধুই একটি রাজনৈতিক দলের অংশ? নাকি রাজনৈতিক পরিচয়কে অতিক্রম করে হনুরা নিজেদের আরও বড় করে তুলতে পেরেছে। হয়ত বা তারা আরও বড় কোনও রাজার নির্দেশ পালনকারী দাস মাত্র। হয়ত নিজস্ব দাসত্ব সম্পর্কে তারা নিজেরাই জানে না। হয়ত হনুরা, হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের চিন্তার স্বাধীনতা। কবি লেখেন ৫৫ নম্বর কবিতায়—"নটে গাছটি মুড়োয় যখন/ পাখি তখন চুপটি বসে/ সে যে কখন হনু হল/ অবাক হয়ে আঙুল চোষে।"

মোস্তাক আহমেদের বইটি কেবল রাজনীতি সচেতন নয় তার সঙ্গে নিজস্ব মানসিক বিপন্নতার স্বর তুলে ধরতে সমর্থ। পার্থ দাশগুপ্তের ছবিও তার সঙ্গে চমৎকার গেছে। বইটির নির্মাণ প্রশংসনীয় এবং চিন্তার ছাপ সর্বত্র। সবথেকে বড় কথা, রাজনৈতিক কবিতা লিখতে গিয়ে কীভাবে প্রতিপক্ষের পরিচয়কে আড়াল করা যায় সেটি কবি দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা। শুধু প্রতিবাদ করেন না। প্রতিবাদের স্বরকে তিনি 'উইট' ও 'হিউমারের' দ্বারাও জারিত করতে পারেন। শেষ দুটো কথা জরুরি। রঙের বিষয়ে। কবিতার অক্ষরগুলোর রঙ মেরুন ঘেঁষা লাল। যে রঙ শুকিয়ে যাওয়া রক্তের হতে পারে। বইটির জ্যাকেট খুলে নিলে দেখা যায়, ভেতরের কালো রঙ। এই অন্ধকার এই সময়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত। এই দেশে, একজন মানুষের প্রতিবাদের কবিতার রঙ, এর থেকে গাঢ় আর কী-ই বা হতে পারে? এই পথেই হয়ত জোরালো অথবা গাঢ় হওয়া যায়। ঠিক, এই পথেই।

অথ হনু কথা
মোস্তাক আহমেদ
খসড়া খাতা
মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

মুখোমুখি কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায় ও সঞ্জয় ঋষি

কথাসাহিত্যিক : তাপস রায় আমাকে বড়লোক না করে ছাড়বে না। তাই আমাকে খুঁচিয়ে এইসব কথাবার্তা বের করল। তবে ওর গোঁফের আকর্ষণই এখানে প্রধান।

সঞ্জয় ঃ অনেক কবিকে দেখা যায় নিজের লেখালিখি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, এটা কি মৃত্যু চেতনা! কবির ভেতরে ভেতরে যাকে আমরা বলতে পারি কবির জীবিত মৃত্যু! কবি কি নতুন করে জন্ম নিতে চায় আবার, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য?

তাপস রায় ঃ সমর সেন আর্বান কবিতার চুড়ান্ত সিদ্ধির জায়গায় পৌঁছে একদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন। তো তাঁর ভক্ত-টক্ত গত শতাব্দীতে বেশ ছিল। তারা ঘিরে ধরে কবিতা লেখার আবদার জানালে সমর সেন বলেছিলেন, 'আমার সিফিলিস সেরে গেছে।' অভিমানের জায়গাটা বোঝো। কবিতার রাজ্যে বেনোজল ঢুকে পড়েছে সেই তখন থেকে— নাহলে অতটা রি-অ্যাক্ট! কবিতা ছেড়ে ছুড়ে তিনি নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন 'ফ্রন্টিয়ার' আর 'নাউ'-এর পাতায়। তুখোড় সব সম্পাদকীয় আর আর্টিকল। কোনো কোনো নাক উঁচু যদি একে সিনিসিস্ট বলেন, কিচ্ছুটি এসে যায় না তাঁর। এটা একটা দাপটের প্রকাশ।

একজন কবি পন্টিয়াক গাড়ি, সুন্দরী নারী যতই চান না কেন, তাঁর প্রধানতম চাওয়া থাকে আত্মার মুক্তি। তো মুক্তির ভেতর বন্ধনটা আসছে কোত্থেকে! যদি ওই মুক্তির জায়গাটা সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে, মানে রোজ রোজ যদি হাত কচলাতে হয়, দাঁত কলকলাতে হয়, কবিতা না লিখে জমির দালালি করতে তো তাঁর আপত্তি থাকবার কথা নয়। আমরা জানি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এই অভিমানই তাঁকে এমন এক নিজস্ব আড়াল তৈরি করতে বাধ্য করেছিল, যে তিনি বাংলা কবিতায় সুচিত্রা সেনের মতো অন্তরালবাসিনী হয়ে গেলেন।

আবার অন্যভাবেও ভাবনাটা গড়িয়ে দেয়া যায়। কবিতা তো একটা সুকুমার মনের চিন্তাবৃত্তি! কিন্তু অন্যান্য এসে যখন সেই মনটাকে ঘিরে ধরে, মানে অন্যান্যের অপ্রতিহত প্রতাপ, তখন ওই টাচি কবিতামনস্কতা আর টিকে থাকার কথা নয়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ক্রমে কবির কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে হয়ত বাইরের নানাবিধ প্ররোচনায়। তাকে আত্মহত্যা না বলে নিজেকে হত্যা হতে দেয়া বলা যেতে পারে। আমাদের মনে থাকবে র‍্যাঁবোর কথা। অমিত প্রতিভা, কিন্তু নিয়োজিত হচ্ছেন মাদক চালানে। আরো অনেক কিছু কেউ হয়ত পুরষ্কার তুলতে দৌঁড়ে বেড়ালেন, প্যাঁচ-পয়জারে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠলেন। তো তাতে কবিতা পালিয়ে যেতে পারে। পাঠক হয়ত ভাবছেন, তিনি অবসর নিলেন। না না, অবসর না, অবসৃত হওয়া। ওই যে বাউন্সার সামলাতে না পেরে যেমন হেলমেট বা চেষ্ট প্যাডে খেয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন অনেকেই।

যেকথাটা হচ্ছিল, মৃত্যু চেতনা। দেখো মৃত্যু একটা ফিক্সড বিষয়। ওটা থাকবেই। জীবজগতে অ্যাবসল্যুট ট্রুথ বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেটা মৃত্যু। তো সেটাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কবি তো চেতন নিরপেক্ষ নন, আর মৃত্যু ব্যাপারটাও এলিয়েন নয়। এসে যায়। এখন কে কীভাবে রি- অ্যাক্ট করে সেটা দেখার বিষয়। তুতেন খামেন-কে মৃত্যুর আগেই ভাবতে হয় কতজন জ্যান্ত দাস-দাসী, কত ধনরত্ন নিয়ে তিনি পিরামিডের ভেতরে আস্তানা গাড়বেন মৃত্যুর পরে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে বলবেন 'শ্যাম-সমান'। বিষয় সেটা নয়, মৃত্যুচেতনা, বিরহচেতনা, ভালোবাসাচেতনা, শ্রমিকচেতনা, মণিবচেতনা—এসব কথা আলাদা করে কিছু নয়। মনের নানা প্রকোষ্ঠে এরা বসবাস করে। মোদ্দা কথা হল কোনো একটা অনুভূতি কোনো সিমিলার অনুভূতির সামনে পড়ে মনোজগতে কী বিক্রিয়া করে তা-ই। উপরিতলে আসে পুকুরের জলে বুদবুদের মতো কতটুকু, বোঝা দায়।

হ্যাঁ কাজের কথাটা হল, আমরা প্রতিমুহূর্তে নতুনকে সঙ্গ করতে চাই। মানুষ এ জন্যই অমরতার প্রত্যাশী। এই চাহিদা

থেকেই রুশ গবেষণা দেখাচ্ছে ধেঁড়ে ইঁদুরের মস্তিষ্কে বাচ্চা ইঁদুরের মস্তিষ্ক লাগিয়ে দিলে ধেঁড়ে ইঁদুরের আয়ু বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ পদ্মায় বোটে ভাসতে ভাসতে তরুণ গলার গান শুনে ভেবেছিলেন, আবার যদি জীবনটাকে নতুন করে শুরু করা যেত। তাহলে পৃথিবীকে গান করে বশ করে ফেলতেন।—এই ভাবনা ছিন্নপত্রে আছে।

সঞ্জয়ঃ এত যে লেখালিখি, এত কবি এই পৃথিবীতে অথচ সেই অর্থে কবিতার পাঠক নেই। অথচ গল্প, উপন্যাসে কবিতার তুলনায় পাঠক বেশি। এর রহস্য কি? আর কবি কবিতাটাই লিখতে চায় কেন?

তাপসঃ হ্যাঁ, এটা বেশ সন্দেহজনক। ভিসুয়ালি হয়ত দেখা যাচ্ছে কবিতার পাঠক নেই। কিন্তু সত্যি কি নেই! কবিতা তো সেই অর্থে বাইরের গমক-ঠমক নয়। ও ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলে, ধস নামায়। একেবারে ভাঙচুর করে দেয়। অনুভবের আর্তি দিয়েই হাজার হাজার মানুষকে ছুটিয়ে নেয়, দরকারে। ফরাসি বিপ্লবে ভলতেয়ার, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুকুন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এর প্রভাব— হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্রেতারা দেখায় যে কবিতার বাজার নেই। কিন্তু কেন যে তারা কবিতা না ছেপে পারে না! তারা প্রধানমন্ত্রীর কবিতা ছাপে, মূখ্যমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা বানায়, রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফরের আগে লু শুন দিয়ে আসে তাঁর লাইব্রেরীতে। নির্বাচনের সময় কবিকে খোলা জিপে নিয়ে নেতারা ঘোরেন। দেয়ালে, পোস্টারে, মাইক্রোফোনে কবিতার সুড়সুড়ি। ভাইটি রে ফেসবুক খুললেই কই গদ্যে তো লাইক পড়ছে না, শত শত ফেসবুক কবিতে ভরে উঠছে ইনবক্স—এটা না পড়ার জন্য! কবিতা আমাদের বাঙালিদের ক্যারেক্টার। কবিতা টাচফোনের মতো টাচঅ্যান্ড গ্লো। কবিতা প্রেমিক/প্রেমিকা ধরার হাতিয়ার। রিটায়ারমেন্টের পর সময় পাস করার পাসওয়ার্ড। থিয়োরিগত ভাবে আমাদের ঘরের কোণের অনিবার্য ওই হারমোনিয়াম—কবিতা।

আমি আবার বলছি, পাঠক একটা ইলিউশন। এই আছে এই নেই। মানে পাঠকের রেট্রোস্পেক্ট করা হলে তা নজরে পড়বে। যখন সবে স্ত্রীলোকেরা পড়তে শিখেছে। তো তারা শরতচন্দ্র না পড়ে রবীন্দ্রনাথ পড়বে! ঘোড়ায় হাসবে— যদি বলি, নোবেল তুলেছেন তো তিনিই, পড়বে না! দেখুন এখন সেই শরতচন্দ্রের সুলভ সংস্করণ আর পড়াতে পারছে না কলেজস্ট্রিট। এখন দুপুরে টিআরপি হাঁকিয়ে অনেকগুলি মেগাসিরিয়াল যে কান্না ঝরাচ্ছে। তাহলে মোদ্দা কথাটা হল, পাঠক আর লেখকের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। আর সম্পর্ক বানিয়ে লেখা-জোকার ঐসব 'রাউলিংবাজি, মানে কমসে কম ৫লক্ষ কপি অর্ডার হবার পর লিখতে বসার ক্যারিশমা বাংলা ভাষার নেই —তা গদ্য কি পদ্য।

সঞ্জয়ঃ দৃশ্য আর অদৃশ্যের মিশ্রণ যদি ধরে নিই কবিতা, যা কল্পনায় আসে তাহলে কি আমরা বলতে পারি সব কবিতাই কোনো না কোনো ভাবে কাল্পনিক, বা দৃশ্য আমাদের উসকে দিয়ে কল্পনায় ঠেলে দেয় —কবিতাকে এমন ভাবা যেতে পারে কি?

তাপসঃ পৃথিবীতে কল্পবিজ্ঞান কথাটি যথেষ্ঠ অর্বাচীন। তার অনেক আগেই রামায়ণ এসে গেছে। মানে আমি বলতে চাইছি রামায়ণ তো রাম বাবাজীর জন্মের আগেই, আর এটা কাব্যরূপে। তাহলে তো কবিতাকে চোখ পাকিয়ে দেখতে হয়েছিল ওই জন্ম নেয়াটা। তা ক্রেডিট গোস টু কল্পনা না কবিতা—এই প্যারালাল আলাপচারিতা চালানো যেতেই পারে। কিন্তু আমরা কথা বলব প্যাটার্ণ নিয়ে। শীতের গাছপালার ফুল ফোটানোর একরকম ধরণ আবার গ্রীষ্মে অন্যরকম। মানে নিজে নিজে ঠিক করে নিয়েছে গাছ যে কী রঙের ফুল ফোটাতে হবে নির্দিষ্ট কালখন্ডে। কবিতাও ঠিক করে নেয় তাদের এক্সপ্রেশন কী হবে —সুনীল গাঙ্গুলির " আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি, তুই দেখে যা নিখিলেশ" হবে না কি হবে উৎপলকুমারের " তখন আমারই যাতায়াতের পথে পড়ে হাঁস ও রৌদ্রের দারুণ মেলামেশা / মধ্যাহ্নভোজন ক্রমেই জটিল হয়ে দেখা দেয়"।

ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইলিউশন অ্যান্ড রিয়েলিটিতে' এরকম বলেছেন, কাব্য যে টিকে আছে সেটা একটা আপতিক ঘটনা। মানুষ গল্প বলে, জ্ঞানগর্ভ বচন আওড়ায় —সব লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু কবিতা টিকে থাকে। কারণ হল মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন বাসনাগুলিকে পরিবর্তন না করেও কবিতা মানুষের মনকে নতুন এক উদ্দ্যেশ্যের সাথে যুক্ত করে

দিতে পারে। এই কাজ সে করে মানুষকে এক অলীক কল্পনার জগতের মধ্যে টেনে এনে। যে কল্প-জগত তার চেনা বাস্তবের থেকে শ্রেষ্ঠতর। যে জগৎকে এখনও বাস্তবে রূপ দেয়া যায়নি, যা দিতে হলে অলীক কল্পনার কবিতা দিয়েই তার পূর্বাভাষ দিতে হবে। যেখানে সমস্ত মিথ্যের সম্ভাবনা। ওই মিথ্যে ব্যবহার করার যুক্তিই হল এই যে আমরা তখনও সে জগৎ স্পর্শ করতে পারি না, তার ঘ্রাণ, স্বাদ নিতে পারি না। কেবলমাত্র বিভ্রমের সাহায্যেই সেই বাস্তবকে রূপ দেয়া যায় যে বাস্তবের অন্য কোনও ভাবে অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

'মাথার উপর ডাকল পেঁচা/ চমকে উঠে, আরে!/ আধখানা চাঁদ জড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফের তারে।' কবি অশোকবিজয় রাহা চাঁদকে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনতে যে কাজটি করলেন তা নীল আর্মস্ট্রংও করতে পারেননি বলেই আমাদের ভালোলাগায় এই পংক্তি ক'টি অমর হয়ে আছে। নতুন পৃথিবী তৈরি করেন কবি, যা সত্যি নয়। 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে / শাদা থাবা বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে/ তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,/ সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।' 'বেড়াল' কবিতায় জীবনানন্দর সৃজন এই বেড়াল। তার কোনো জাগতিক অস্তিত্ব নেই। মানে দৃশ্যের বিড়াল এখানে উধাও।

সঞ্জয়ঃ কবিরা নিজের মতন করে নিজের কবিতার মন্ত্র শিখে নেয় বলেই কি কবিতার এত রহস্য?

তাপসঃ মসলিন বস্ত্র বানাতে বুড়ো আঙুল লাগত। বাংলার মসলিনের জগৎ জোড়া খ্যাতি। তো ম্যাঞ্চেষ্টার, ইয়র্কশায়ারের ভেড়ার লোমের পোশাক পৃথিবী ব্যাপী ছুটোছুটি করতে করতে বাংলায় এসে হোঁচট খেলে ব্যবসায়ীরা ছেড়ে দেবে! অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নিতে হয়েছিল। বাংলার তাঁতিদেরও সেই দশা। বাংলার মনের জগতে ঘোরাফেরা করে লিরিক গহনতা, তাতে আঁকাবাঁকা স্রোত—

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে।

বলতে চাই যে এক মেটাফিজিকাল আর্তি বাংলা ভাষার চরিত্রের মধ্যেই ঢুকে আছে, তাকে বিদেশি আবহ দিলে, স্ট্রাকচারের অসাবলীলতা দিলে সে টিকবে না। বা নিজত্বহীন হয়ে পড়বে। বারবার সে চেষ্টাই করা হয়েছে। নানা তাত্ত্বিকতার মোড়ক সামনে রেখে বাংলার সে আশ্চর্যকে নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা হলেও তা করা যায়নি। গীন্সবার্গ, পোস্টমর্ডানিজম, ফুকো-দেরিদা দিকন্সট্রাকশন—আঘাতের পর আঘাত। কিন্তু একটা ভাষার নিজত্বের জোরে, দেখা-না-দেখার অতলান্ত কূটাভাসের জোরে মাথা উঁচু থাকা। যেভাবে শাড়ির আশ্চর্যে সমস্ত দুঃসাহস বহমান রেখে একটু ফাঁক-ফোকরই কাফি, বাংলা কবিতাও ছেলেখেলা করে দেবে সেই সব রহস্য বপনে। পাঠক শুধু অনুভবে নেবে, 'তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পাবো না।'

আমাদের রক্তের ভেতরেই আসলে সেই ছায়া ও রৌদ্রের খেলা। এই কূট কথন বাংলার ক্রাফ। চর্যাপদ থেকেই রহস্য বাংলা কবিতার অবয়ব। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' কোনো কনটেন্ট নয়, এটা একটা ভাব। এই ভাব তো এক একজনের মনের জগতের ইদ-ইগো-সুপারইগোর মিলিত প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়। ফলে দৃশ্য এক হলেও ঐ মনের রচনার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিন্নতায় উচ্চারণও ভিন্ন হতে বাধ্য। নাহলে সবাই তো বৃষ্টি হলেই সাদা পাতায় ভরিয়ে তুলবে, 'খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিকে ছায় মেঘে,/ ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।' তো এই ভাবের প্রকাশ নিজের ভেতর থেকে উঠে এসে যে রহস্য বয়ন করে, তা ভেদ করতে যেয়েই তো শ্রীচৈতন্য জ্যোৎস্নালাগা সমুদ্রকে আলিঙ্গন করেন, আর ফেরেন না।

সঞ্জয় ঃ একটা লাইনকে কত রকম ভাবে যে ব্যাখ্যা করা যায় ! এইসব কবিতাকে, যে কবিতাকে নানারকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই কবিতার রহস্য উন্মোচনের জন্য কখনও কি মনে হয় আবার দ্বিতীয় জন্ম নিই। বা এক জন্মের ভেতর দিয়ে অনেক জন্ম দেখি কবিতার রূপ?

তাপসঃ হ্যাঁ যায়। আমরাও তো কতরকম ভাবে একই কথা বলি। ইনিয়েবিনিয়ে বলি। রোখাচোখা ভাবে বলি। চোখের ইশারায় বলি। অন্যকে দিয়ে বলিয়ে নিই। একটা সফল কবিতা নিজে বলে না, অন্যকে দিয়ে বলিয়ে নেয়। কবিতা তো মন্দিরের সেই ঘন্টাধ্বনির মতো, দূর থেকে টেনে আনে, বিগ্রহের সামনে বসায়, শিহরণ তোলে শরীরে যদি সেই ধ্বনির সাথে একাত্ম হওয়া যায়। একটা কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করায় গীনস্বার্গ প্যান্ট খুলে পশ্চাতদেশ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কবি আলোক সরকার আলফা কাফের আড্ডার কথা বলছিলেন। সেখানে কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করায় কাকে নাকি গলায় ঘুঁটের মালা পরানো হয়েছিল। কবিতা তো সোর্স বলার জন্য তৈরি হয়নি। মানে ওই যে ক্লাস রুমে শিক্ষক গলায় এক ধরণের কম্বুকতা এনে বলেন, 'কবি বলতে চেয়েছেন এখানে ...। ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর। বলা যেতে পারে কবিতা হল একটা সাবকনসাস মনের অক্ষররূপ। তো তাকে আলো অ্যাফেয়ার দিতে একবার পুরুষের বেশ ধরতে হতে পারে, একবার নারীবেশ। কখনো রাজার চোখে দেখা, কখনও প্রজার চোখে। মানে প্রতিটি চোখেই মানে পাল্টে পাল্টে যাবে। মোদ্দা কথাটা হল, যেহেতু একটা কবিতায় (a+b)2 এর ফর্মুলা ভাঙা থাকে না, ইন্ডিভিডুয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ থাকবেই। শুয়োরের বাচ্চাকে শুয়োরের বাচ্চা বলার ইতরতা কেউ নিজত্বে নিতেই পারে, তাতে মাথা ব্যথা করার কোনো মানে হয় না।

সঞ্জয়ঃ তোমার ওই কবিতাটা আমার খুব প্রিয়। ওই যে 'ডিকশন হাতে আসবে, তখন স্বীকারোক্তির মিথ হয়ে ওঠা'। ওই কবিতাটার শেষ লাইন এরকম ছিল, 'দেশ বিক্রি হলে সত্যি সত্যি কারো কিচ্ছুটি ছেঁড়া যাবে না।'—তো দেশ সম্পর্কে একটু অনুভব জানাবে?

তাপসঃ এক্সপ্লানেশন হয় না। উচ্চারণ উচ্চারণই। যেহেতু মার্কেটিং করতে যাচ্ছি না আমার এইসব চিজ, ধরতে হবে ব্যঙ্গার্থে। আমার অ্যাসোসিয়েশন ও আত্মপ্রবঞ্চনা গুঁড়ি মেরে নিশ্চিহ্ন করার দিকে এগোতে থাকে। বড়োসড়ো একটা ক্যাওস দরকার। যাতে সুবিধে আর অসুবিধে দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। যেন প্রতারণা করতে না পারে, এই আর কি! ওই যে দেখা যায় না ব্রিলিয়ান্ট ইন্টেলেকচুয়ালস সব কন্ট্রোল করতে করতে কন্টোল্ড হয়ে যাচ্ছেন। মানে ওই যে রঘুপতি রাজাকে টাইট দিতে গিয়ে মাতৃমুখ পেছনের দিকে করে দিচ্ছেন, মানে জনগণকে পেছন দেখানো রাজনীতি। ওটা খুব দুঃখের এবং ভয়ের। আমাদের দৈনন্দিনের দীনতায়েরকম রেফারেন্সের অভাব পড়বে না। তো আমার ইচ্ছে ছিল সিম্পলকে সিম্পলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে খচ্চরকে আইডেন্টিফাই করা। এটা খুব সহজ প্রসেস। খচ্চর উঁকি মারবেই।

দেশ শব্দটা একটা মিথ। হিটলার সুইডেনের লোক, কিন্তু জার্মান জাতটাকে ক্ষেপিয়ে তুললেন কীভাবে! না দেশ দিয়ে। ওই লোকটা যে উটকো লোক, তখন খেয়াল করার অবকাশ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিগ অব নেশনশ এমন শর্ত আরোপ করেছে জার্মানীর উপর, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখানে বাংলায় বর্ণহিন্দুর শ্রেণীভিত্তিক স্বার্থবোধ প্রথমে টের পাননি রবীন্দ্রনাথ। ফলে তাঁকে ১৯০৫-এ লিখতে হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা', ' আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' ইত্যাদি গান। কিন্তু তারপর দেখলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চালিকা শক্তিটি বর্ণহিন্দুর অর্থনৈতিক স্বার্থ, দেশাত্মবোধ নয়। পূর্ববাংলার বড়বড় জমিদার ও গোমস্তারা সব বর্ণ হিন্দু। তাদের উপর নির্ভর করে এ বাংলার আইনজীবীরা। ঢাকায় হাইকোর্ট স্থাপিত হলে কলকাতার বিপদ। তাছাড়া সমগ্র বাংলার প্রশাসনে বর্ণ হিন্দুদের যে প্রাধান্য তাতে অশনি সংকেত এই বঙ্গভঙ্গ। বাংলার কৃষিঋণের উৎসও এদের হাতে। ফলে নতুন প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য ঘটলে সবরকমের বিপদ।নতুন প্রদেশের রাজধানি ঢাকা হলে চট্টগ্রাম আবার আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রাধান্য পাবে আর কলকাতা তার গুরুত্ব হারাবে। তাতে কলকাতার ব্যবসায়ীদের সৌভাগ্যও অস্তমিত হবে। সুতরাং উত্তাল হল বাঙালি অন্তর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে, যারা, মানে সে বাঙালি ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে কোনো হেলদোল দেখায়নি।

রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ ভেদনীতি আর তার ব্যাপারটা বুঝতে মাস তিনেক সময় নিয়েছিলেন। আর তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। বললেনও শনি তো ছিদ্র না পেলে ঢুকতে পারে না। সুতরাং শনিকে খোঁজো। শত্রুকে দোষ না দিয়ে পাপকে ধিক্কার দাও। তখনকার স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে সাহেবও প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন, সরকারি চাকরিতে এতদিনকার একাধিপত্য চলে

যাবার ভয়ে আতঙ্কিত ছিল বিক্রমপুরের বাবুরা। আর ভাগ্যকুলের রায়দের কাঁচাপাট আর চালের ব্যবসা মার খাবার ভয় ছিল। বৃটিশ বাংলা ভাগ করতে না পেরে জাতটাকেই ভাগ করে দিল এরপর। ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করে দিল।

সঞ্জয়ঃ যা হারিয়ে গেছে যাক। যা রয়ে গেছে তা কী?

তাপসঃ ওটা একটা বিষাদের চিহ্ন। এই যে এত ট্যাটু শরীরে শরীরে, তার মানে কি! মানেটা এরকম যে সে মনে মনে পরাজয় মেনেছে বলেই কোনো এক অনলব্ধ জয়ের কথা শরীরে লিখে দিতে চায়। গল্পটা করছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তখন ১৯৫১ হবে। রাজশাহী থেকে কলকাতায় এসেছেন। তিনি 'ইন্ডিয়ান ওয়ে' বলে একটা কাগজে লিখলেন 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা'। পর পর একত্রিশটা সুইসাইড দেখে জার্নালিস্ট হিসেবে ওই লেখা। কিন্তু কেন এই তথ্যচিত্রের মতো অনর্গল আত্মহত্যা ঘটে গেল বাংলায়! মনে আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন এরকম, আমি সেই কবির মনখারাপ মুখ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। গোধূলিই তো মনখারাপের সময়, কিন্তু মনখারাপের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সকালে-দুপুরে-রাত্তিরে এমনকি ঘুমের মধ্যেও মনখারাপ হয়, কিন্তু কবিতায় যখন প্রতিচ্ছবি দেখি কোনো একটি আসন্ন সন্ধ্যায় একজন বিষণ্ণ কবির সুন্দর মুখ, তখন পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ বুকে টের পাই, এক ঝলক দেখতে পাই জানলা দিয়ে চেয়ে থাকা সন্ধ্যেবেলায় কীটসের করুণ চোখ, সেই এক-গোধূলির মনখারাপ টেনে আনে, তখন সেই মুহূর্তের সত্যই একমাত্র হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা পায়। সুনীল এই কথাই কবিতা করে বলবেনঃ

" মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই"

বিষাদের সত্যি কোনো মাথা-মুন্ডু নেই। চারপাশের যাপনের মধ্যে ভাইরাশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মহাভারতের ভেতর, ইলিয়াড-ওডিসির ভেতর বর্মহীনতায় তখন আমিও অবিরল বকি—দমকল দমকল, শোনো আমি ভীত হয়ে আছি, দেখো দুর্ঘটনা ছুটে আসছে, গ্রীষ্ম প্রখর, জল দাও। আমি তো বাঙালি, মেরুদণ্ড স্বভাব নরম। শূন্যতা থেকে খুঁটে খেয়ে যতটুকু এই আমি সর্ষের মানদন্ড থেকে যতটুকু নিস্পৃহতা-উত্তর থেকে যাওয়া, তাকে রাখো, পুড়িয়ো না। দিনমণির প্রকাশিত ভঙ্গির ভেতর আজ কেন যে এতখানি ছমছমে বোধ, কেন যে নদীহীনতার ইশারা! ঐ দিকে ধোঁয়া উঠছে।

সঞ্জয়ঃ সত্যি সত্যি কি আমাদের কিছু রয়ে যায়? 'কতটুকু না-বলা রং টের পেতে একটা জীবন বাজী ধরা যায়?' তাপসদা, আমাদের জীবন কি বাজী রাখার মতন! কার কাছে শেষমেশ জীবন বাজী রাখতে ইচ্ছে করে! সে কি ঈশ্বরী?

তাপসঃ উরিব্বাস! এত কঠিন কঠিন প্রশ্ন করলে যাই কোথায়! কবির ঈশ্বরী তার কবিতা। আমার মনে হয়। কৃষকের ঈশ্বরী তার ধান। পটুয়ার ঈশ্বরী তার পট। শকুনীর ঈশ্বরী তার পাশা। রাজনীতিকদের ঈশ্বরী তার অনৃত ভাষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আর্জি, সেটা তার ঈশ্বরী। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'সারপ্লাস অব ম্যান'। আর তাঁকে বলতে হয়, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।/ সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।" —ওটা একটা ভঙ্গি। দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল দেখছেন—রাস্তার মোড়ে মোড়ে শনিপূজোর আয়োজন করা যেমন একটা পেসার, যেমন রাজনৈতিক নেতা অবলীলায় টেকস—এ মর‍্যাল পেসার ... নিজেকে লাভজনক জায়গায় নিয়ে যায় তা দিয়ে। ফলে রাজনীতিবিদ আর শনিপূজোর পুজারীর ভেতর কোনো ভেদ নেই। এদেরকে জুড়ে রাখে অভিসন্ধি আর জনগণের শূন্যতাবোধ। আর খুব ভয়ে ভয়ে বলি, একজন কবি তাঁর গোটা জীবন দিয়ে খুঁজে পেতে চান অক্ষরমালার পাশাপাশি সাদা সাদা স্পেসগুলো কী বলতে চায়। সেখানে কি শেক্সপীয়রের ডাইনীরা অপেক্ষা করে আছে!

সঞ্জয়ঃ লিটল ম্যাগাজিন, বাণিজ্যিক ম্যাগাজিন—এই দ্বন্দ্ব থেকেই যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব কেন?

তাপসঃ রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' সম্পর্কে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি লিখে এরকম জানিয়েছিলেন যে, লেখা সৃষ্টির চেয়ে লেখক সৃষ্টি বেশি দরকার। আমিও তা মনে করি। একটা লিটলম্যাগাজিনের কাজই এটা। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা'

পত্রিকা বুকে আগলে এক ঝাঁক কবিদের তৈরি ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ — এঁরা। সাহিত্যের বাজার সৃষ্টি নয়, সাহিত্য সৃষ্টিকে তুলে ধরে অবহেলিত শক্তিমান লেখককে মর্যাদা দেয় লিটল ম্যাগাজিন। মনে রাখতে হবে, অমিয়ভূষণ মজুমদার বা মহাশ্বেতাদেবীরা লিটলম্যাগাজিনের সন্তান। ১৯৫৩-তে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচি আর দীপক মজুমদারের সম্পাদনায় বের হল 'কৃত্তিবাস'। প্রথম সংখ্যাতেই যে সমস্ত কবিদের ভিড় তাঁরাই সমগ্র সাহিত্য জগতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কিছুদিনের মধ্যেই। এই পত্রিকা তরুণতমদের লেখালিখির হাতিয়ার তখন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র প্রবল প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে, মানে তাঁর তৈরি কথাসাহিত্যের ছকটিকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিল ইউরোপে আলোড়ন তুলে ফেলা ছোটগল্পের আঁচ 'হিতবাদী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ এখানেই পরপর 'দেনাপাওনা', পোস্টমাস্টার' এর মতো ছ'টি ছোটগল্প লিখেছিলেন। নতুন লেখক, অভিনব শিল্পরূপ বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থিত করে লিটল ম্যাগাজিনই। তার যে পাঠকপ্রিয় হবার দায় নেই। মানে বাণিজ্য করার। তার কাজ সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠ স্বাগত জানান। অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা। মুরুব্বিয়ানাকে আসতে না দিয়ে প্রহরজাগা সেনাপতির ভূমিকা পালন করা।

ইউরোপীয় রেঁনেশা চুঁয়ে আসা ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি তখন চেটে-পুটে নিচ্ছে 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা। ব্রাহ্মসমাজের টক টাইমেও এদের দাপট। এরকম গা-জোয়ারি সময়ে প্রমথ চৌধুরী আস্তিন খুলে দেখিয়ে রাখলেন প্যারালাল সংস্কৃতির কবজি। 'সবুজপত্র'। রবীন্দ্রনাথ সম্ভাবনা টের পেয়েছিলেন। লিখলেন, 'ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা/ আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' মানে দ্রোহ দ্রোহ। এরপর আর থেমে থাকার কথা নয়। এরপরেও আমরা জানি নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ যা পারেননি, বুদ্ধদেব বসু তাই করে দেখালেন। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। গদ্যের পায়ের নীচে পড়ে থাকা ম্রিয়মান কবিতাকে স্বরাট করে দিলেন। অ-বাণিজ্যিক ওই সবুজপত্রের উত্থানে বাংলা সংস্কৃতির মেধা-মজ্জা তৈরি হয়ে গেল।

সঞ্জয়ঃ সুইনহোস্ট্রিট পত্রিকা এই সময়ের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। পত্রিকার ইতিহাস জানাবে একটু?

তাপসঃ এটা একটা ক্যানভাস। একটা মূল্যবোধ থেকে আর একটা মূল্যবোধে শিফ্ট করার পর্ব। আমি হাবরা, বাণীপুরে থাকার সময়ে কিছুটা সংকর জাতির একটা কাগজের সাথে যুক্ত ছিলাম। নানা বিষয়ে গদ্য-পদ্য নিয়ে সে কাগজ বের হত। জীবিকা সূত্রে আমার স্থানান্তর হলো শিলং-এ। সেখানে গিয়েও ওই কাগজের শেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করা গেছিল। সেটা ছিল বাংলা গানের ২০০ বছর নিয়ে একটা সংখ্যা। কিছুটা হইহই হলো। কিন্তু শিলং থেকে ফেরার পর ২০০০ সালে ভাবনা হলো যে অনেকটা পালটে গেছে সংস্কৃতি পরিমণ্ডল। নতুন শতক এসেছে। আর পুরনো ক্লাসিক রীতির বিষয় খাঁড়া করে তাকে নিয়ে জ্ঞান উপচানোর সময় সেটা নয়। বরংচ সময়টা খানিকটা সংক্ষিপ্ত হয়ে কবিতার নানা ভঙ্গির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তো ভাবনাটা এরকম ভাবা গেল যে প্রতিমাসে জনা কুড়ি সমমনস্ক কবি একটা কাগজের ছাতায় তাদের অনুভব একসাথে পাশাপাশি ফেলতে থাকবে। এই ফেলাটায় কার কী ক্রাফ, দেখাবে। মানে সেই প্রথম কবিতায় কর্পোরেট মনোভঙ্গির প্রবেশ। যাচ্ছিলও তা। আমারা কুড়িজনই শেষ কথা। লোকজন নিচ্ছিলও। কিন্তু যেমন নদীর পারের জমিতে কোনো না কোনো একদিন ধস নামবেই, নামলো সুইনহো-তেও। বড়দের কবিতা, কবিতার গদ্য, ভারতীয় অন্যভাষার কবিতার অনুবাদ ঢুকে পড়ে গায়ে-গতরে চর্বি লাগিয়ে মুখ মেলতে লাগল। তো হলো কিছুটা এইরকম। সেই থেকে এতদিনে আমরা ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষার কবিতাকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা পাঠককে জানাতে পেরেছি। এই একটা আমাদের ভালোলাগার দিক ... এই পর্যন্ত। এমন আর কি...!

সঞ্জয়ঃ অলঙ্কারহীন কবিতা কি আস্তে আস্তে আমাদের মনে জায়গা করে নিচ্ছে! অলংকার ও অলংকারহীন কবিতা নিয়ে তোমার অনুভব যদি বলো।

তাপসঃ একসময় সে আমাদের ছিল। আমাদের গায়ে সাঁটা থাকত ইনি দক্ষিণপন্থী, ইনি বামপন্থী। আদর্শগতভাবে এসব

থাকার ফলে কোথাও মেসেজ দেবার জোরাজুরি ঢুকে পড়ত কবিতায়। কোথাও তাকে প্রতিহত করার জন্য স্ত্রী-অঙ্গ, পুরুষ অঙ্গ, আর খিস্তি-খেউরে ভর্তি করে দেয়া হত কবিতার পাতা। কিন্তু সে ঝোঁকটা আমাদের হিপোক্রিসি হই হই করে বেড়ে উঠবার ফলে। মানে আমাদের এই দৌড়াদৌড়ির যুগে ততটা জানান দিয়ে থাকার অবকাশ নেই আর। মানে আমি বলতে চাইছি, আমাদের ওই সতীত্ব সংক্রান্ত গল্প-গাথাগুলো যখন ডি-ভ্যালুজ হয়ে সিঁথি থেকে সিঁদুর উঠে যেতে যেতে আমাদের চলনে থেকেছে --- মানে 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না'-র নিক্তিমাপা ডিসিপ্লিন। মানে বলতে চাইছি ওই ইনোসেন্ট রাইটিং আমাদের সাহিত্য থেকে হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি মারা গেলেন অরুণকুমার বসু। তাঁর তৈরি বিখ্যাত গানটির লিরিক হলো 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার'। তো তিনি একটু আগের প্রজন্মের কথা বলেছেন। এখন সোনার হাতগুলো সব আইটি সেক্টরে কম্পিউটর হাঁকড়াচ্ছে। কাঁকন রাখার জায়গা নেই। বলছিলাম কী আমাদের শিল্পরুচি তো আমাদের সমাজ জীবনের সাথে সাথে থাকে। সমাজের চলনের সুবিধাটা নেয়। রবীন্দ্রনাথও শেষের দিকে, মানে 'গীতাঞ্জলি' উত্তর পর্বে যখন দেখলেন ইংরেজিতে অনুবাদ করে আনা 'সং অফারিংস' নতুন একটা ভাষা কাঠামোয় ঝরঝর করে উঠেছে, বর্জন করে ফেলতে চেয়েছিলেন শব্দের শরীর থেকে অতিরিক্ত ভাব। তাতে রবীন্দ্রইজম-এ ধাক্কা লেগেছিল বইকি! কিন্তু ওই স্টিরিওটাইপটা ভাঙা শুরু হলো। অত ইমেজারি কি ভালো! প্রশ্নটা ঢুকে এলো। আর আমার ব্যক্তিগত ঝোঁকে থাকে কবিতার শরীর থেকে শুধু আবেগের বেগকেই হটানো নয়, ধীরে ধীরে লুপ্ত করে দিতে হবে গল্প, নাটক, ছবি, গান—

মানে কবিতার কাছ থেকে সব ক্রাচগুলো কেড়ে নিয়ে ওকে হাঁটাতে হবে। টলমল শিশুটির হাঁটার নান্দনিকতা বড়ো কম কিছু নয়!

জীবনপঞ্জি :

নাম —	তাপস রায়
শিক্ষা —	এম এ, পিএইচ ডি
জীবিকা —	সরকারি আধিকারিক
প্রকাশিত কবিতার বই :	মে মাস নরম হয়ে আসে (সিগনেট) ২০১৭
	বিকেল পাঁচটা এসে বসে আছে চায়ের দোকানে (প্রথম আলো) ২০১৪
	বাউন্ডুলে রোদ্দুর (একুশ শতক) ২০১৫
	গঙ্গাকে বাইপাসে নিয়ে গেলে (এবং মুশায়েরা)২০০৮
	ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞান তত্ত্ব (কৃত্তিবাস) ২০০৬
	মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ (অনুষ্টুপ) ২০০৪
	কলের গান (কবিতা পাক্ষিক) ২০০০
	৩১নং জাতীয় সড়ক (প্রো রে নাটা) ২০১০
	বনবিবির বসতি (কবিতা ক্যাম্পাস) ১৯৯৪
	হে পুরাণ প্রথা ও প্রাচীর (কবিতা ক্যাম্পাস ১৯৯৬)
	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতা ঃ অনুবাদ ও ভূমিকা (বইওয়ালা) ২০০২
প্রবন্ধের বই:	মিথ্যে মিথ্যে কবিতা (সুতরাং) ২০১৭
গল্পের বই:	দশে দশ (একুশ শতক) ২০১৬
	সুলভ শৌচালয় (একুশ শতক) ২০১৯
	যদিদং টু তদস্তু (বরাহনগর দর্পণ) ২০২৩

উপন্যাস: পোড়ামাটির দেউল (আনন্দ পাবলিশার্স) ২০১৬
মানদাসুন্দরীর কাঁথা (আনন্দ পাবলিশার্স) ২০১৮
নিহত গোলাপ (একুশ শতক) ২০১৮
হেভেন হোকাস-পোকাস (একুশ শতক)২০২০
রায়গুণাকর (পত্রপাঠ) ২০২৩
মালতী মাধবী কুঞ্জ (ভিরাসত) ২০২৩

ধারাবাহিক উপন্যাস: শ্রীমতী (সানন্দা, জুন ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩)
পুটিমাসির মিশির শিশি (ভারতবিচিত্রা, ঢাকা, এপ্রিল,২০২২)
কালাচাঁদ শেঠ অ্যান্ড কোম্পানি (যুগশঙ্খ, এপ্রিল ২০২৩)
গরাণহাটির কীর্তনীয়া, (নন্দন, ২০১৯-২০)
শুধু পটে লেখা (গৃহশোভা, ২০১৯-২০)
ব্যাটলশিপ (যুগশঙ্খ সংবাদপত্র, ২০১৯-২০)
বন্দেমাতরম (যুগশঙ্খ সংবাদপত্র, ২০২১-)

পুরস্কার : বীরেন্দ্র পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মারক, সামসুল হক স্মৃতি পুরস্কার, বেদব্যাস পুরস্কার, বিনয় মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার, উত্তরণ সাহিত্য পুরস্কার, কবি নিত্যানন্দ পুরস্কার, সুতরাং, প্রথম আলো, সোহারাব হোসেন স্মারক সম্মান, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি সম্মান।

পার্বতী ভট্টাচার্যের কবিতা-গ্রন্থ সমূহ—

একান্ত আপন (কবিতা)

রং-বেরং (কবিতা ও গল্প)

সংবিত (কবিতা)

প্রতিভাষ (গল্প)।